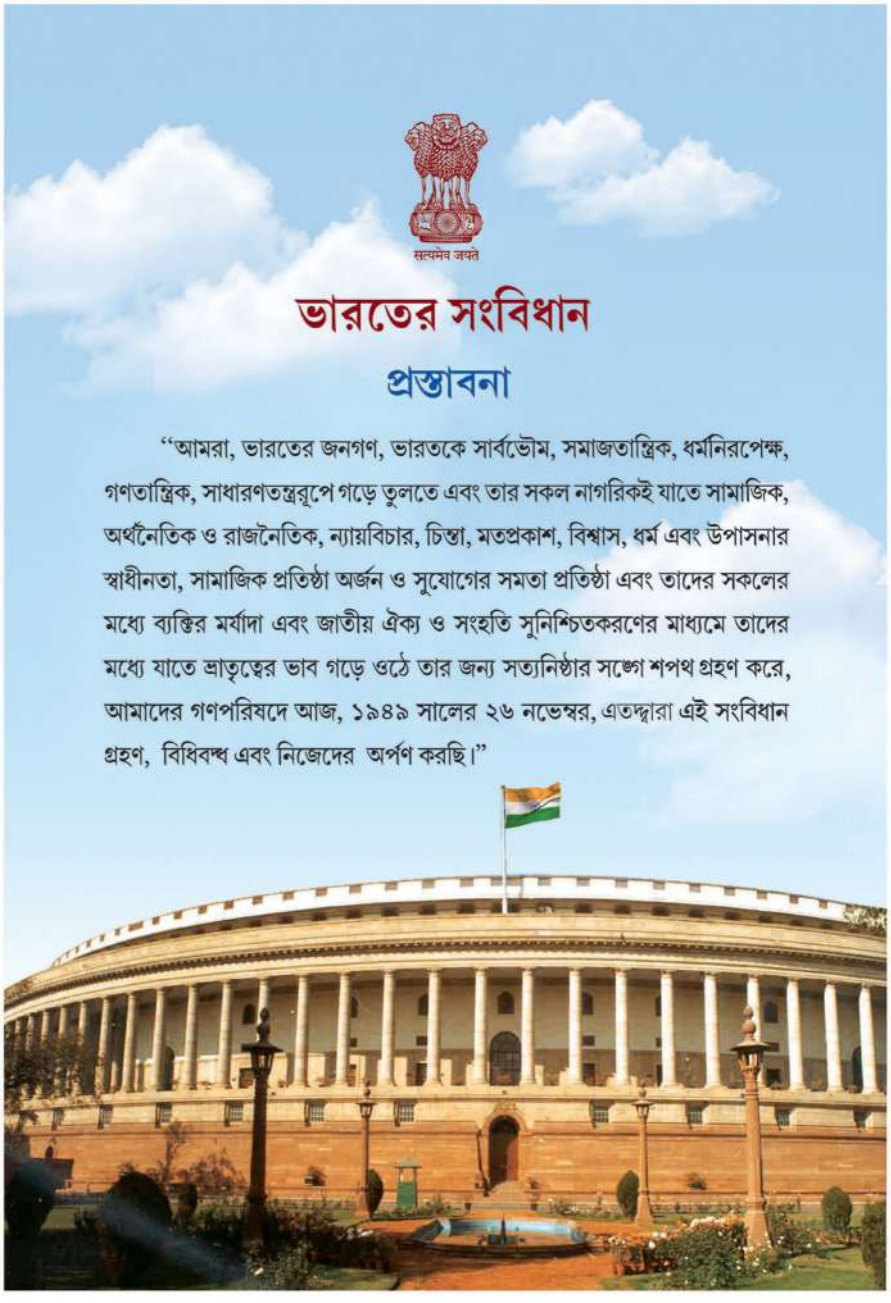

सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

“আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।”

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

*(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

*(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).

ভারতের অর্থনীতি : বিকাশের রূপরেখা

একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ

ত্রিপুরা সরকার

এন সি ই আর টি
অনুমোদিত
প্রথম বাংলা সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০১৯
পুনমুদ্রণ : মার্চ, ২০২০

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস :
মনতোষ সাহা

প্রকাশক :
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা সরকার ।

মূল্য : ৮৫ টাকা মাত্র

মুদ্রণ : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড,
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ভারতের অর্থনীতি : বিকাশের রূপরেখা
একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই

(এন সি ই আর টি-র Indian Economic Development
পাঠ্য পুস্তকের ২০১৭ সালের অনুদিত সংস্করণ)

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা।

আগরতলা
মার্চ, ২০১৯

উপদেষ্টা

১. ড. অর্ণব সেন, সহ অধ্যাপক, এন ই আর আই ই, এন সি ই আর টি, শিলং
২. ড. অরূপ কুমার সাহা, সহ অধ্যাপক, আর আই ই, এন সি ই আর টি, ভুবনেশ্বর

অনুবাদকমণ্ডলী :

১. গৌতম রায় বর্মণ, শিক্ষক
২. রাকেশ ঘোষ, শিক্ষক
৩. গঠন চন্দ্র দত্ত, শিক্ষক
৪. সুমন দাস, শিক্ষক
৫. শান্তনু প্রসাদ দাশ, শিক্ষক
৬. বিশ্বজিৎ দেবনাথ, শিক্ষক
৭. সুকান্ত সাহা, শিক্ষক
৮. রাজেশ দত্ত, শিক্ষক
৯. শংকর পাল, শিক্ষক
১০. পার্থ দাশ, শিক্ষক
১১. অদিতি ভট্টাচার্য, শিক্ষিকা

পরিমার্জনা

১. বিশ্বনাথ রায়
২. ইন্দুমাধব চক্রবর্তী
৩. সোনালী ভট্টাচার্যী
৪. সৌমিত্র কিশোর সরকার
৫. সুধীর কান্তি ভূষণ
৬. প্রভুদ্ধ সুন্দর কর

প্রা ক্-ক থ ন

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা (২০০৫)-এর নির্দেশ অনুযায়ী, শিশুদের স্কুলজীবন ও স্কুলের বাইরের জীবনের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক থাকা খুব প্রয়োজন। তার কারণ, শিশুদের শিক্ষা যদি শুধুমাত্র স্কুল এবং পাঠ্যবইয়ের গণ্ডির মধ্যে সীমিত থাকে, তাহলে সেইসব শিশুদের স্কুল, বাড়ি এবং সম্প্রদায়— এই তিন জায়গার শিক্ষায় একটি বড়ো ফাঁক থাকার সম্ভাবনা রয়ে যায়। মূলত এই শূন্যস্থানটাকে পূরণ করার লক্ষ্যেই জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখার উপর ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যক্রম ও নতুন ধরনের পাঠ্যবই তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে. এর ফলে শিশুদের মুখস্থ করা এবং চারদেয়ালের মধ্যে তীব্রভাবে আবদ্ধ করে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার প্রবণতা আবদ্ধ করে বিভিন্ন শিক্ষার করার বন্ধ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি এটাও আশা করা হচ্ছে যে, এই পরিবর্তন জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তবে এই ধরনের প্রচেষ্টার সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষক/শিক্ষিকাদের উপরে, যাঁরা শিশুদের শিখন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এবং বিভিন্ন কাজে শিশুদের কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করবেন। আমাদের এটা মনে রাখা খুব জরুরি, শিশুরা যদি সময়, স্থান এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়, তাহলে বড়োদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নিয়ে তারা নতুন অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারবে। একমাত্র পাঠ্যবই পড়েই পরীক্ষায় পাস করা যায় - মূলত এই ধারণার ফলেই শিক্ষার অন্যান্য দিকগুলো সর্বদা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতার বিকাশ তখনই সম্ভব, যখন আমরা ওদের এই গোটা শিখন প্রক্রিয়ার কেবলমাত্র গ্রহীতা না ভেবে একটা পূর্ণ অংশীদার মনে করব।

তবে এই লক্ষ্যপূরণ করতে গেলে স্কুলের দৈনন্দিন কার্যসূচি ও ব্যবস্থাপনায় অনেক ধরনের পরিবর্তন আশা অনিবার্য। স্কুলের দৈনন্দিন সময় সূচি যেমন নমনীয় হওয়া উচিত, ঠিক তেমনই বার্ষিক কার্যসূচি এমনভাবে তৈরি হওয়া প্রয়োজন যাতে শিক্ষাদানের দিনগুলোর সংখ্যায় কোনো পরিবর্তন না আসে। তবে বাস্তবে এই নতুন পাঠ্যবই শিশুদের কতটুকু কাজে লাগবে, ওদের স্কুলজীবন কতটা সমৃদ্ধ করবে কিংবা ওদের স্কুলজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে কিনা, সবটাই নির্ভর করছে শিক্ষক/শিক্ষিকারা কী পদ্ধতি অবলম্বন করে এই বইটি স্কুলে পড়াবেন এবং

কীভাবে সেই পড়ার মূল্যায়ন করবেন। বিগত দিনগুলোর ন্যায় শিশুদের যাতে পাঠ্যবইয়ের বোঝা বইতে না হয়, এই নতুন পাঠ্যক্রম তৈরি করার সময় এই ব্যাপারে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তার জন্য শিক্ষাদানের প্রদত্ত সময় এবং শিশুদের মানসিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি স্তরের পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলো এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুনর্গঠন করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে শিশুদের নানারকম প্রশ্ন করা, নতুন বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা, তর্ক-বিতর্ক, ছোটো ছোটো গ্রুপ বানিয়ে আলোচনা করা এবং হাতে-কলমে শিক্ষা এইসব কিছুর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পাঠ্যবই উন্নয়ন কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিবর্গ যাঁরা কঠোর পরিশ্রম করে এই বইটি রূপায়ন করেছেন তাঁদেরকে এন সি ই আর টি প্রশংসা জানাচ্ছে। এই কমিটির কার্যকলাপকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন অধ্যাপক হরি বাসুদেবন এবং এই পাঠ্য বইয়ের মুখ্য উপদেষ্টা অধ্যাপক যোগেন্দ্র সিংহ মহোদয়গণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই পাঠ্যবই পুনর্গঠনের পিছনে বহু শিক্ষক/শিক্ষিকার অবদান অনস্বীকার্য।

আমরা সেইসব স্কুলের প্রধান শিক্ষকদেরও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই পাঠ্যবই তৈরির ক্ষেত্রে যেসব প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন তাঁদের বহুমূল্য সম্পদ, উপাদান এবং লোকবল নিয়ে কাজ করার অনুমতি দিয়ে উদার মনের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের (এম এইচ আর ডি) চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মৃণাল মিরি এবং অধ্যাপক জি পি দেশপান্ডের তত্ত্বধানে মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা বিভাগ দ্বারা নিযুক্ত জাতীয় পর্যবেক্ষণ সমিতির সদস্যদের বহুমূল্য সময় ও অবদানের জন্য পর্ষদের পক্ষ থেকে তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। নিজেদের প্রকাশনা এবং ব্যবস্থাপনার গুণগত মান সংস্কারের কাজে নিরন্তর নিয়োজিত থাকা এন সি ই আর টি কর্তৃপক্ষ সর্বদা পাঠকদের মতামত এবং পরামর্শকে স্বাগত জানায়, যাতে ভবিষ্যতে পাঠ্যবই সংশোধনী প্রক্রিয়াগুলো সফলভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

নিউ দিল্লি
২০ ডিসেম্বর, ২০০৫

অধিকর্তা
রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ
(এন সি ই আর টি)

Textbook Development Committee

Chairperson, Advisory Committee for Textbooks in Social Sciences at Higher Secondary Level

Hari Vasudevan, *Professor,* Department of History, University of Calcutta, Kolkata

Chief Advisor

Tapas Majumdar, *Emeritus Professor,* Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Members

Bharat C. Thakur, *PGT,* Government Pratibha Vikas Vidyalaya, Surajmal Vihar, Delhi

Gopinath Perumula, *Lecturer,* Tata Institute of Social Sciences, Mumbai

Jaya Singh, *Lecturer,* DESS, NCERT, New Delhi

Nishit Ranjan Das, *PGT,* New Alipore Multipurpose School, Behala, Kolkata

Naushad Ali Azad, *Professor,* Department of Economics, Jamia Millia Islamia, New Delhi

Neeraja Rashmi, *Reader,* DESS, NCERT, New Delhi

Rama Gopal, *Professor,* Department of Economics, Annamalai University, Annamalai Nagar, Tamil Nadu

Pratima Kumari, *Lecturer,* DERPP, NCERT, New Delhi

Poonam Bakshi, *Senior Lecturer,* Department of Economics, Punjab University, Chandigarh

R. Srinivasan, *S.G. Lecturer,* Department of Economics, Arignar Anna Government Arts College, Villupuram, Tamil Nadu

Sabitha Patnaik, *PGT,* Demonstration School, Regional Institute of Education, Sachivalaya Marg, Bhubaneswar

Sharmista Banerjee, *Headmistress,* Bidya Bharti Girls High School, Kolkata

Member–Coordinator

M.V. Srinivasan, *Lecturer*, DESS, NCERT, New Delhi

ACKNOWLEDGEMENTS

Many friends and colleagues have helped in preparing this textbook. The National Council of Educational Research and Training acknowledges M. Karpagam, *Lecturer*, Department of Economics, Meenakshi College, Chennai; J. John, *Director*, Centre for Education and Communication, New Delhi; Pratyusa K. Mandal, *Reader*, DESS, NCERT, New Delhi; Nandana Reddy, *Director* (Development), Concern for Working Children, Bangalore; V. Selvam, *Research Scholar*, Centre for Study of Regional Development and Satish Jain, *Professor*, Centre for Economic Studies and Planning, Jawaharlal Nehru University, New Delhi; Pooja Kapoor, Modern School, Barakhamba Road, New Delhi; Priya Vaidya, Sardar Patel Vidyalaya, Lodhi Estate, New Delhi; and Nalini Padmanabhan, DTEA Senior Secondary School, Janakpuri, New Delhi for providing their feedback and inputs.

The Council expresses its gratitude to Jan Breman and Parthiv Shah for using photographs from their book, *Working in the mill no more*, published by Oxford University Press, Delhi. Some stories were taken from the book, *Everybody Loves a Good Drought*, authored by P. Sainath and published by Penguin Books, New Delhi. A photo relating to farmers committing suicides has been used from *The Hindu*. A few photographs and text materials on environmental issues have been used from the *State of India's Environment 1 and 2* published by the Centre for Science and Environment, New Delhi. The Council thanks the authors, copyright holders and publishers of these reference materials. The Council also acknowledges the Press Information Bureau, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi; National Rail Museum, New Delhi for allowing to use photographs available in their photo library. Some photographs were given by S. Thirumal Murugan, Principal, Adhiyaman Matriculation School, Uthangarai, Tamil Nadu; John Suresh Kumar, Synodical Board of Social Service; Sindhu Menon of *Labour File*, New Delhi; R. C. Das of CIET, New Delhi; Renuka of National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi. The Council acknowledges their contribution as well.

Special thanks are due to Savita Sinha, *Professor* and *Head*, Department of Education in Social Sciences and Humanities for her support.

The Council also gratefully acknowledges the contributions of Mamta and Arvind Sharma, *DTP Operators*; Neena Chandra, *Copy Editor*; Dillip Kumar Agasti, *Proof Reader;* and Dinesh Kumar, *Incharge Computer Station* in shaping this book. The efforts of the Publication Department, NCERT are also duly acknowledged.

এই বইটি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে

"ভারতীয় আর্থিক উন্নয়ন" শির্ষক এই বইটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের কাছে ভারতীয় অর্থনীতির চাবিকাঠি হিসেবে পরিচিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উন্মোচিত করা। এই প্রক্রিয়ায় তরুণ প্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে, এদের কাছে এটাই প্রত্যাশিত যে এরা এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে সংবেদনশীল হবে, অর্থনীতির বিভিন্ন অঙ্গনে সরকারের ভূমিকাকে প্রশংসা এবং সমালোচনার মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে শিখবে। এই বইটি আরও জানার সুযোগ করে দেবে অর্থনৈতিক সম্পদ কী এবং কীভাবে সেই সমস্ত সম্পদ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা ভারতীয় অর্থব্যবস্থা এবং ভারতের আর্থিক নীতিসমূহের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিবিধ তথ্যের সাথে পরিচিত হবে। তাদের কাছে এটাই প্রত্যাশিত যে, তাদের বিশ্লেষণী ক্ষমতার বিকাশ ঘটবে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলোকে ব্যাখ্যা এবং ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতকে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করবে। এতদ্‌সত্ত্বেও সচেতন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা মতবাদ, তত্ত্ব এবং তথ্যেরভারে ভারাক্রান্ত না হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন আর্থিক বিষয় এবং প্রবণতাগুলোকে যাচাই করতে এই বইটি প্রচেষ্টা নিয়েছে প্রতিটি বিষয়ের উপরই বিকল্প ভাবনাকে জায়গা করে দেওয়ার, যাতে করে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে সুচিন্তিত বিতর্কে নিয়োজিত হতে পারে। বিষয়ক্রম শেষ হবার পরে 'ভারতীয় আর্থিক উন্নয়ন' শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিতভাবেই সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঘটনাসমূহ, যা তাদের চারপাশে ঘটে চলেছে, সেগুলোকে বোঝার দক্ষতা অর্জনের ক্ষমতা প্রদান করবে এবং গণমাধ্যমে পরিবেশিত প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলিকে সমালোচনাত্মক মূল্যায়ন এবং ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করবে।

এই বিষয়ক্রমের প্রতিটি অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে হরেক কার্যক্রম। ছাত্রছাত্রীরা এই সমস্ত কার্যাবলি তাদের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নির্দেশনায় সম্পন্ন করবে। বাস্তবতা হল এই যে, ভারতীয় অর্থনীতিকে

বোঝার ক্ষমতা সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই বিষয়ক্রমে, শিক্ষক / শিক্ষিকাদের ভূমিকা অপরিসীম, কার্যাবলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা, সরকারি নথীপত্র যেমন অর্থনৈতিক সমীক্ষা, সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত বিভিন্ন সামগ্রী, সংবাদপত্র, দূরদর্শন এবং অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ।

এই সমস্ত ঘটনাগুলোর সাপেক্ষে শিক্ষক / শিক্ষিকাদের, বিষয়ক্রম শুরুর আগেই, কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে রাখতে হবে। শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই ছাত্রছাত্রীদের বলা যেতে পারে সংবাদপত্রে এবং সাময়ীকিতে প্রকাশিত বিষয়ক্রমের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রসঙ্গ যেমন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহ, কৃষি, শিল্প, সেবাক্ষেত্র এবং আরও কিছু নির্দিষ্ট খাত যেমন দারিদ্রতা এবং কর্মসংস্থান ইত্যাদিতে ব্যয় বরাদ্দ, গ্রামোন্নয়ন, পরিবেশ, বিভিন্ন পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং শক্তি এবং চিন, পাকিস্তানের অর্থনৈতিক

কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত প্রসঙ্গগুলোকে কেঁটে সংগ্রহে রাখতে হবে। তাদের সেই সমস্ত কেঁটে রাখা অংশগুলোকে সযত্নে সংরক্ষণ করতে হবে এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যখন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর পাঠদান করতে শুরু করবেন তখন তারা সেই সমস্ত বিষয়ক্রম শুরুর আগে সদ্য সংগৃহীত সংবাদের কেঁটে রাখা অংশগুলো থেকে নির্বাচন করে প্রদর্শন এবং ব্যবহার করবে। বিষয়ক্রম শুরুর সময় থেকেই শিক্ষার্থীদের এই প্রয়োজনীয় সংগ্রহগুলো তৈরি করে ফেলতে হবে যাতে করে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি, যখন দরকার পরবে হাতের কাছে মজুত থাকবে। এই অভ্যাসটি শিক্ষার পরবর্তী পর্যায়ে কাজে আসবে।

বিদ্যালয়গুলোকে চলতি বছরের অর্থনৈতিক সমীক্ষার একটি স্থায়ী প্রতিলিপি (Hard copy) ক্রয় করতে হবে। তোমরা লক্ষ্য করবে যে ভারতীয় অর্থনীতি সংক্রান্ত তথ্যাবলি 'অর্থনৈতিক সমীক্ষায়' নিয়মিত সংযোজিত এবং পরিমার্জিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের জন্যে এটা প্রয়োজনীয় যে তারা ঐ সমস্ত সংবাদ, সমীক্ষা ইত্যাদির সাথে সুপরিচিত হবে এবং প্রাসঙ্গিক কার্যাবলির উপরে কর্মসম্পাদন করবে। যে সমস্ত পরিসংখ্যানগত তালিকা অর্থনৈতিক সমীক্ষায় পরিশিষ্ট হিসাবে পাওয়া যায় তা বিভিন্ন বিচার্য বিষয়কে বুঝতে খুবই সহায়তা করে।

কোনো একটি সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে চর্চার সময় সেই বিষয়ের সংখ্যাভিত্তিক তথ্যের আলোচনা অবশ্যম্ভাবী। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে কথা বলি সার্বিক বৃদ্ধির হার এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশ — এটা শিক্ষার্থীদের জন্যে বাঞ্ছনীয় হয়ে দাঁড়ায় যে তাদের প্রবৃদ্ধির হারের ধরন সম্পর্কে একটা মোটামুটি কাজ চালানোর মতো প্রাক্ ধারণা থাকবে, শুধুমাত্র প্রবৃদ্ধির সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যের উপস্থাপন না ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা যেতে পারে এটা শেখার জন্যে কোন্ প্রক্রিয়াটি জড়িয়ে আছে। একটি নির্দিষ্ট মাত্রার প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্যে এবং সেই ধারাতে কোন্ কোন্ বিষয়গুলো ভূমিকা রেখেছে। তোমরা লক্ষ্য করবে প্রতিটি অধ্যায়েই রয়েছে নাম্বার দেওয়া বাক্স, এই বাক্সগুলো বইয়ে পরিবেশিত তথ্যের পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে। এই বাক্সগুলোর মাধ্যমে আলোচনার বিভিন্ন বিষয়গুলোকে একটা মানবিক স্পর্শ দেবার এবং তাদেরকে বাস্তব জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসার একটা প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। যাই হোক, এই বাক্সগুলো এবং এর সাথে সাথে 'কাজগুলো করো' শির্ষক কার্যাবলিগুলো কিন্তু পরীক্ষা সংক্রান্ত বা মূল্যায়ন সংক্রান্ত কাজে ব্যবহারের জন্যে নয়।

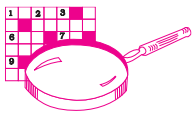

প্রতিটি অধ্যায়ের শেষেই প্রথাগত অনুশীলনীর 'কাজগুলো করো' উল্লিখিত কাছে যা পাঠ্যবইটির অংশ, এদের মধ্যে অধিক বিস্তৃত বিষয়গুলোকে প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। শিক্ষক / শিক্ষিকাদের ভূমিকা থাকবে এই সমস্ত কার্যাবলিগুলোতে লিপ্ত হবার সময় শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা; যাতে তারা পাঠ্যবইয়ের বাইরেও অনুসন্ধান করতে পারে।

এটা বোধগম্য যে তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন সুবিধাগুলো সমস্ত স্কুলে পাওয়া নাও যেতে পারে, তা সত্ত্বেও ভারতীয় অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত বিবিধ তথ্যাবলি, যা ইন্টারনেটে সহজলভ্য, সেগুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের ইন্টারনেটের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য

আহরণে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ওয়েব সাইটগুলোতে প্রবেশ এবং সেগুলোর থেকে সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ দরিদ্রতার সাথে সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ পরিকল্পনা কমিশন

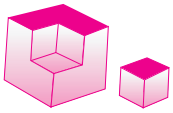

প্রকাশ করে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের এটা জানা থাকতে হবে যে, ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের একটি ওয়েবসাইট রয়েছে যাতে ভারতের বিভিন্ন বিষয়সমূহ, এরমধ্যে দরিদ্রতাও রয়েছে, বিবরণ আকারে সহজলভ্য। যেহেতু সেই সমস্ত বিবরণের স্থায়ী প্রতিলিপি সংগ্রহ করাটা সব সময় সম্ভবপর হবে না সেইহেতু শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক / শিক্ষিকাদের চেষ্টা করতে হবে সেই সমস্ত বিবরণগুলো সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা।

বিগত 10 বছরের অর্থনৈতিক সমীক্ষার বিবরণসমূহ http://www.budgetindia.nic.in নামক ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা পরিবর্তন করে। যদি এমন দেখা যায় যে এই বইয়ে দেওয়া ওয়েবসাইটের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না তবে দয়া করে ওই সমস্ত ওয়েবসাইটগুলোকে গুগুল-এর (www.google.co.in) মতো অনুসন্ধানী মাধ্যমের সাহায্যে খুঁজে নিতে হবে।

শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়াকে সহজ করতে প্রথমবারের মতো, প্রতিটি অধ্যায়কে সংক্ষিপ্ত আকারে 'সংক্ষিপ্তসার' শির্ষক অংশে উদ্ধৃত করা হয়েছে। দয়া করে এঠাও লক্ষ্য করতে হবে যে সমস্ত সারণির সাথে তাদের সূত্র / উৎসগুলোকে দেওয়া হয়নি কারণ এই সমস্ত সূত্র/উৎগুলো বিভিন্ন গবেষণামূলক উপাদান থেকে সংগৃহিত হয়েছে যা প্রতিটি অধ্যায়ের তথ্য নির্দেশ সংক্রান্ত অংশে উল্লিখিত হয়েছে।

আমরা এই সত্যটির পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে ভারতীয় অর্থনীতি সংক্রান্ত এই বিষয়ক্রমটির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্র সমাজের কাছে ভারতীয় অর্থব্যবস্থার মৌলিক সামষ্টিক বিষয়গুলোকে প্রবর্তনের মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতির উপরে সুচিন্তিত, তথ্যসমৃদ্ধ বিতর্ক শুরু করা। আমরা জোরের সাথে এটাও বলতে চাই যে সহযোগিতাপূর্ণ শিখন এই বিষয়ক্রমের এক অতিগুরুত্বপূর্ণ দিক। সুতরাং অন্যান্য উৎস থেকে ভারতীয় অর্থনীতির উপরে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক / শিক্ষিকাদের নিজেদেরকে নিয়োজিত করাটা খুবই প্রয়োজন এবং সেই সমস্ত সংগৃহীত তথ্যাবলি ভারতীয় অর্থনীতির সম্বন্ধে শিখন এবং শিক্ষণ, উভয় কাজেই গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহকৃত যোগানরূপে ব্যবহৃত হবে।

এই বইয়ের যে-কোনো অংশের সাথে সম্পর্কিত তোমাদের প্রশ্ন বা মতামত নীচের ঠিকানায় পাঠাতে পারো :

প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর (অর্থনীতি)
ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন ইন সোশ্যাল সায়েন্স
ন্যাশনাল কাউন্সি অফ এডুকেশনাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং
শ্রী অরোবিন্দ মার্গ
নিউদিল্লি - 110016

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার

(ভারতীয় সংবিধান, ধারা ১৪-৩০ ৩২ও ২২৬)

১) সাম্যের অধিকার:

* আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে।
* জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।
* সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার।
* অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ এবং আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ।

২) স্বাধীনতার অধিকার :

* বাক্ স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার।
* শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার।
* সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার।
* ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার।
* ভারতের যে-কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার।
* যে-কোনো জীবিকা, পেশা বা ব্যবসা বাণিজ্য করার অধিকার।
* জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার।

৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার:

* কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়, বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না।
* চৌদ্দ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্যকোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার :

* সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও সমান নিরাপত্তা, কারোর প্রতি ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করা হবে না এবং প্রত্যেক ধর্মাচরণের পূর্ণ অধিকার এবং সমানাধিকার পাবে।
* যে-কোনো ধর্মের প্রসারে অর্থ দান করার স্বাধীনতা।
* রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্মের ভিত্তিতে বঞ্চিত করা যাবে না।
* সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে-কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন ও তাতে যোগদানের স্বাধীনতা।
* ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো নিজেদের পছন্দমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার :

* ভারতের যে-কোনো নাগরিকের নিজ নিজ ভাষা-লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার অধিকার রয়েছে।
* ধর্ম জাতি বা ভাষার দরুন কাউকে সরকারি অথবা সরকারি যাহায্য প্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৬) সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার :

* মৌলিক অধিকারগুলো বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রিমকোর্টে ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে— প্রয়োজনে বিশেষ লেখ জারি করতে পারবে।
  হেবিয়াস কর্পাস, ম্যাণ্ডামাস, সারশিয়োরেরাই, প্রহিবিশন ও কুয়ো ওয়ারান্টো।

সূচিপত্র

একক I :	উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা এবং অভিজ্ঞতা (1947-1990)	1-35
অধ্যায় 1 :	স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতের অর্থব্যবস্থা	3
	— ঔপনিবেশিক শাসনকালের স্বল্প অর্থনৈতিক উন্নয়ন	4
	— কৃষিক্ষেত্র	5
	— শিল্পক্ষেত্র	7
	— বৈদেশিক বাণিজ্য	8
	—জনসংখ্যার পরিস্থিতি	9
	— জীবিকার কাঠামো	10
	— পরিকাঠামো	11
অধ্যায় 2 :	ভারতীয় অর্থনীতি (1950-1990)	16
	— পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ	19
	— কৃষি	22
	— শিল্প এবং বাণিজ্য	27
	— বাণিজ্য নীতি : আমদানি বিকল্প	30
একক II :	অর্থনৈতিক সংস্কার — 1991 থেকে	36-56
অধ্যায় 3 :	উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বিশ্বায়ন : একটি মূল্যায়ন	38
	— পটভূমি	39
	— উদারীকরণ	41
	— বেসরকারিকরণ	44
	— বিশ্বায়ন	45
	— সংস্কারকালীন সময়ে ভারতের অর্থনীতি : একটি পর্যালোচনা	48

একক III : ভারতীয় অর্থব্যবস্থার বর্তমান চ্যালেঞ্জ 57-178
অধ্যায় 4 : দারিদ্র্য 59
— দরিদ্র কারা? 60
— দরিদ্রদের কীভাবে চিহ্নিত করা হয়? 63
— ভারতে দরিদ্রদের সংখ্যা 65
— দারিদ্র্য কেন হয়? / দরিদ্রতার কারণসমূহ 68
— দারিদ্র্য দূরীকরণের নীতি এবং কার্যক্রমসমূহ 72
— দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মসূচি — একটি সমালোচনামূলক মূল্যায়ন 75
অধ্যায় 5 : ভারতে মানব মূলধন গঠন 82
— মানব মূলধন কী? 84
— মানব মূলধনের উৎস 84
— মানব মূলধন ও মানব উন্নয়ন 90
— ভারতে মানব মূলধন গঠনের অবস্থা 91
— ভারতে শিক্ষাক্ষেত্র 92
— ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা 94
অধ্যায় 6 : গ্রামোন্নয়ন 99
— গ্রামোন্নয়ন কী? 100
— গ্রামীণ ক্ষেত্রে ঋণ ও বিপণন 101
— কৃষি বিপণন ব্যবস্থা 104
— উৎপাদনশীল ক্রিয়াকর্মের বৈচিত্র্যকরণ 106
— স্থিতিশীল উন্নয়ন এবং জৈব কৃষি 110
অধ্যায় 7 : কর্মসংস্থান : প্রবৃদ্ধি, বিধিবহির্ভূতকরণ এবং অন্যান্য বিষয়সমূহ 116
— কর্মী এবং কর্মসংস্থান 118
— কর্মসংস্থানে জনগণের অংশগ্রহণ 119
— স্বনিযুক্তি এবং ভাড়া করা শ্রমিক 120
— ফার্ম, কারখানা এবং অফিসে কর্মসংস্থান 123
— বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের পরিবর্তনশীল কাঠামো 124
— ভারতের শ্রমশক্তির অসংগঠিতকরণ বা বিধিবহির্ভূতকরণ 127
— বেকারত্ব 130

— সরকার এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি 132
অধ্যায় 8 : পরিকাঠামো **139**
— পরিকাঠামো কী? 140
— পরিকাঠামোর প্রাসঙ্গিকতা 141
— ভারতে পরিকাঠামোর অবস্থা 141
— শক্তি 144
— স্বাস্থ্য 149
অধ্যায় 9 : পরিবেশ এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন **162**
— পরিবেশ সংজ্ঞা এবং কাজসমূহ 163
— ভারতের পরিবেশগত অবস্থা 167
— স্থিতিশীল উন্নয়ন 171
— স্থিতিশীল উন্নয়নের কৌশলসমূহ 172

একক IV : ভারতের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা : প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে একটি তুলনামূলক আলোচনা **179-197**
অধ্যায় 10 : ভারত এবং তার প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনামূলক উন্নয়নের অভিজ্ঞতা **181**
— উন্নয়নমুখী দিশা : একটি ক্ষণচিত্র 182
— জনসংখ্যা বিষয়ক সূচক 185
— মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং ক্ষেত্রসমূহ 186
— মানব উন্নয়নের সূচকসমূহ 189
— উন্নয়নের বিভিন্ন কৌশলের মূল্যায়ন 190

শব্দকোশ **198-206**

একক
১

উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা এবং অভিজ্ঞতা (1947-90)

এই এককের দুটি অধ্যায়ে আমাদের ভারতীয় অর্থব্যবস্থার একটি সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে যেখানে প্রাক্-স্বাধীনতার সময় থেকে পরবর্তী চার দশক পর্যন্ত পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য ভারতে গৃহীত পন্থাগুলোর বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ হল ভারত সরকারকে পরিকল্পনা কমিশন গঠন এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঘোষণা করার মত এক গুচ্ছ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছিল। এই এককে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলোর সার্বিক সমীক্ষা এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের গুণাবলি এবং তার সীমাবদ্ধতার একটি সমালোচনামূলক মূল্যায়ণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

1

স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতের অর্থব্যবস্থা

এই অধ্যায় অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থীরা

- ভারতের স্বাধীনতার সময়কালে, 1947 সালে ভারতীয় অর্থব্যবস্থার অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে।
- ভারতীয় অর্থনীতির অনুন্নয়ন এবং স্থবিরতার কারণসমূহ সম্পর্কে বুঝতে পারবে।

ভারত হল আমাদের সাম্রাজ্যের কেন্দ্র। যদি আমাদের সাম্রাজ্যের অন্য কোন অংশকে হারিয়ে ফেলি তবে আমরা বাঁচতে পারবো কিন্তু যদি আমরা ভারতকে হারাই তবে আমাদের সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত যাবে।

ভিক্টর আলেকজান্ডার ব্রুস, দ্যা ভিক্টরি অফ্ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ইন 1984

1.1 ভূমিকা

"ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন" বিষয়ক এই বইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের ভারতীয় অর্থব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে পরিচিত করানো এবং স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত করানো। যদিও দেশের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলো আলোচনার সময় দেশের অর্থনীতির অতীত অবস্থা সম্পর্কে জানাও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং প্রথমে আমরা স্বাধীনতার পূর্বে ভারতের অর্থনীতির অবস্থান সম্পর্কে জানবো এবং স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণের জন্য গৃহীত এবং আলোচিত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করব।

ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনীতির পরিকাঠামো কেবলমাত্র বর্তমান সময়ের ওপরই ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে তা কিন্তু নয়, এর শেকড় ইতিহাসের অনেক ভেতরে নিহিত রয়েছে। বিশেষ করে, সেই দুইশত বছর যখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিলো এবং অবশেষে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে 1947 সালের 15ই আগস্ট। ভারতের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল গ্রেট ব্রিটেনে দ্রুত বিকশিত হওয়া আধুনিক শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ হিসেবে ভারতকে পরিগণিত করা। গত সাড়ে ছয় দশকে ভারতীয় অর্থব্যবস্থার উন্নয়নের যে কোন ধরনের মূল্যায়নের জন্য পূর্ববর্তী সময়ের শোষণের চরিত্রটি বোঝা খুবই দরকার।

1.2 ঔপনিবেশিক শাসনকালের স্বল্প অর্থনৈতিক উন্নয়ন

ব্রিটিশ শাসনের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতে একটি স্বাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। যদিও কৃষিই ছিল দেশের বেশিরভাগ জনগণের জীবিকার প্রধান উৎস। তবুও দেশের অর্থনীতি যে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, তারই নিদর্শন আমরা দেখতে পাই।

ভারত তার হস্তকারু শিল্পের জন্য যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল, বিশেষ করে সূতি-রেশম বস্ত্র, শিল্প, ধাতু ও মূল্যবান পাথরের কারুশিল্প ইত্যাদি। এই সমস্ত শিল্পে যে কাঁচামাল ব্যবহৃত হত, তা ছিল যথেষ্ট উন্নতমানের। তার ফলে বিশ্ব বাজারে এই শিল্পগুলোর চাহিদাও ছিলো অপরিসীম।

বাক্স 1.1: বাংলার বস্ত্রশিল্প

মসলিন্ হল একধরনের সূতি বস্ত্র যার মূল উৎসস্থল ছিল বাংলা, বিশেষত ঢাকা এবং তার আশেপাশের অঞ্চলগুলো। (স্বাধীনতার পূর্বে যার উচ্চারণ ছিল ঢাক্কা)। ঢাকা বর্তমানে বাংলাদেশের রাজধানী। 'ঢাক্কাই মসলিন্' খুব সূক্ষ্ম ধরনের সূতিবস্ত্র হিসেবে সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিল। মসলিনের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ধরনটিকে বলে 'মলমল'। কোন কোন সময় বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই এই ধরনের পোশাক মলমল শাহী বা মলমল খাস রাজপরিবারের সদস্যরাই ব্যবহার করত অর্থাৎ শুধুমাত্র তাদের জন্যই ঐ ধরনের পোশাক (মলমল শাহী / মলমল খাস) পরিধানযোগ্য।

ভারতে প্রতিষ্ঠিত ঔপনিবেশিক সরকারের গৃহীত আর্থিক নীতির বিষয়বস্তু ভারতীয় অর্থব্যবস্থার বিকাশের জন্য ছিল না। অধিকন্তু তারা তাদের দেশীয় অর্থব্যবস্থার সংরক্ষণ এবং মান উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়েই অধিক সচেতন ছিলেন। এই ধরনের অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণের ফলে ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছিলো। এর ফলস্বরূপ, ভারত শুধুমাত্র ব্রিটেনকে কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ এবং সেই কাঁচামাল দিয়ে নির্মিত চূড়ান্ত দ্রব্যের আমদানিকারক দেশেই রূপান্তরিত হয়েছিলো।

স্পষ্টতই, ঔপনিবেশিক সরকার কখনোই ভারতের জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় পরিমাপ করার জন্য আন্তরিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এক্ষেত্রে কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগে আয় পরিমাপ করার চেষ্টা হয়েছিল যেগুলোর ফলাফল ছিল পরস্পর বিরোধী এবং অসঙ্গত। বিশিষ্ট পরিমাপকারী দাদাভাই নৌরজী, উইলিয়াম ডিগবি, ফিল্ডলে সিরাস, ভি.কে.আর.ভি. রাও এবং আর. সি. দেশাই এরমধ্যে রাও ছিলেন অন্যতম। উনার পরিমাপগুলোকে ঔপনিবেশিক শাসনকালে যথেষ্ট সঙ্গত বলে মনে করা হত। তবে, বেশিরভাগ গবেষণায় দেখা গেছে যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সময়ে দেশের প্রকৃত গড় উৎপাদন বৃদ্ধির হার দুই শতাংশের কম। আবার এর পাশাপাশি প্রতি বছর মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল মাত্র অর্ধেক শতাংশ।

1.3 কৃষিক্ষেত্র

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অন্তর্গত ভারতীয় অর্থব্যবস্থা ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক। সেই সময় দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় 85% গ্রামে বসবাস করতো এবং কৃষি থেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহ করতো। কৃষিকাজ বিশাল সংখ্যক জনগণের পেশা হওয়া সত্ত্বেও, ভারতের কৃষিক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে স্থবিরতা

বাক্স 1.2 : ব্রিটিশ শাসনের পূর্বের কৃষিব্যবস্থা

ফরাসী ভ্রমণকারী, বার্ণিয়ার সতেরো দশকের বাংলার চিত্রকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করেছিলেন — 'বাংলায় আমার দুইবারের ভ্রমণকালে সংগৃহিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে আমি বুঝতে পেরেছি যে এই অঞ্চলটি মিশর থেকেও বেশি সমৃদ্ধ। এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে সুতি বস্ত্র রেশম, চাল, চিনি এবং মাখন রপ্তানি হয়। এখানে তাদের অভ্যন্তরিণ ভোগের জন্যও পর্যাপ্তভাবে গম, শাকসবজি, শস্য, পাখি (fowls), হাঁস এবং রাজহাঁস জাতীয় প্রাণী উৎপাদিত হয়। এখানে প্রচুর পরিমাণে শুকর এবং ছাগল ও ভেড়ার বহর রয়েছে। এখানে প্রত্যেকরকমের মাছের প্রাচুর্য রয়েছে। অতীতে প্রচুর শ্রমের মাধ্যমে পরিবহণ এবং সেচের জন্য গঙ্গা নদীর পার কেটে রাজমহল থেকে সমুদ্র পর্যন্ত অসংখ্য খাল নির্মাণ করা হয়েছিল।

চিত্র 1.1 *: ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে কৃষি ক্ষেত্রে স্থবিরতা*

➢ লক্ষ্যণীয়, সতেরো দশকে আমরা যদি আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকটি পর্যালোচনা করি তবে ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাবার পর কৃষিক্ষেত্রে যে স্থবিরতার সৃষ্টি হয়েছিলো তার সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা করতে হবে।

এবং কখনো বা অস্বাভাবিক অবনতির অভিজ্ঞতাও লক্ষ্য করা যেত। কৃষিক্ষেত্রের সার্বিক উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেয়েছিল। যদিও কৃষির আওতাধীন জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পরমমানের ভিত্তিতে এই ক্ষেত্রের কিছু প্রবৃদ্ধি লক্ষ করা গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক সরকার দ্বারা প্রবর্তিত বিভিন্ন ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থাই ছিল মূলত কৃষিক্ষেত্রের স্থবিরতার প্রধান কারণ। বর্তমানের পূর্ব ভারতের অঞ্চলসমূহ যা পূর্বের বেঙ্গাল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে বিশেষত জমিদারী প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথার কৃষিক্ষেত্রের মুনাফা কৃষকদের পরিবর্তে জমিদাররাই ভোগ করত। তবুও, ঔপনিবেশিক সরকার এবং অধিকাংশ জমিদারই কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কিছুই করেননি। কৃষকদের আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা না করে, কেবলমাত্র খাজনা আদায় করাই ছিল জমিদারদের মূল আগ্রহের বিষয়। এর কারণে কৃষকরা চরম দুর্দশা এবং সামাজিক চাপের সম্মুখিন হয়েছিল। জমিদারদের এই ধরনের আচরণের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজস্ব বন্দোবস্ত সংক্রান্ত শর্তগুলোই দায়ী ছিল। নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব জমা দেওয়ার জন্য তারিখগুলো স্থির করা থাকতো; তা সঠিকভাবে জমা দিতে ব্যর্থ হলে জমিদারদের সমস্ত অধিকার হারাতে হতো। তাছাড়া, অনুন্নত প্রযুক্তি, অপ্রতুল সেচ ব্যবস্থা এবং খুব স্বল্প পরিমাণে সারের ব্যবহার, সম্মিলিতভাবে কৃষকদের দুর্দশাকে চরমভাবে বাড়িয়ে তুলেছিল এবং কৃষির উৎপাদনশীলতাকে অতলে নিমজ্জিত করেছিল। তবে কৃষির বাণিজ্যকরণের ফলে দেশের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে অর্থকরি ফসলের ক্ষেত্রে উচ্চফলনশীলতার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু, এধরনের অর্থকরী ফসলের উচ্চ উৎপাদনশীলতা কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে অসমর্থ ছিল। কেননা, কৃষকরা খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিবর্তে অর্থকরী ফসল উৎপাদন করেছিল, যেগুলো মূলত ব্রিটেনের

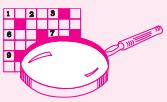

কাজগুলো করো

➢ ব্রিটিশ শাসনকালের ভারতের মানচিত্রের সাথে স্বাধীন ভারতের মানচিত্রের তুলনা করো এবং সেই অঞ্চলগুলোকে চিহ্নিত করো যেগুলো পাকিস্তানের অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ অঞ্চলগুলো ভারতের কাছে কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল?
তোমাদের সুবিধার্থে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ এর পুস্তক 'India Divided'.

➢ ব্রিটিশরা ভারতে কী কী রাজস্ব বন্দোবস্তের নীতি গ্রহণ করেছিলেন? নীতিগুলো কোথায় কীভাবে কার্যকরী করা হয় এবং সমাজ ব্যবস্থায় এর কী প্রভাব পড়েছিলো? ব্রিটিশ সরকার প্রণীত এই রাজস্ব বন্দোবস্ত নীতিগুলো বর্তমান ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থায় কোনভাবে প্রভাব ফেলেছে কি? তোমাদের কী মতামত?

কারখানাগুলোতে ব্যবহৃত হত। সেচ ব্যবস্থার কিছু উন্নতিসাধন করা হলেও ভারতীয় কৃষি জমির উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং মাটির লবণমুক্ত করণের মতো সমস্যায় জর্জরিত ছিল। অন্যদিকে, কৃষকদের একটি ক্ষুদ্র অংশ, তাদের চাষের ধরন পরিবর্তন করে খাদ্যশস্য উৎপাদন থেকে অর্থকরী ফসল উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তবে কৃষকদের একটি বৃহৎ অংশ, ক্ষুদ্র চাষি এবং ভাগ চাষিদের কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য সম্পদ, প্রযুক্তি কিংবা উদ্দীপনার কোনটাই ছিল না।

1.4 শিল্প ক্ষেত্র

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অধীনে কৃষিক্ষেত্রের ন্যায় শিল্প ক্ষেত্রেও ভারত সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করতে পারেনি। এমনকি দেশের বিশ্ববিখ্যাত হস্তশিল্পগুলোও ক্রমশ অবলুপ্ত হতে থাকে কিন্তু এই সুদীর্ঘ স্বনাম ধন্য অতীতের স্থান নেওয়ার জন্য তেমন কোন আধুনিক শিল্পক্ষেত্র বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হল না। ভারতে ঔপনিবেশিক সরকারের ধারাবাহিক অবশিল্পায়ণ নীতির প্রধানত দ্বৈত উদ্দেশ্য ছিল।

প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, ব্রিটেনে সদ্য বিকশিত আধুনিক শিল্প সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের নিছক রপ্তানীকারক দেশ হিসেবে ভারতকে সীমাবদ্ধ রাখা এবং দ্বিতীয়টি হল, ঐ সমস্ত শিল্পক্ষেত্রগুলিতে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্যগুলোর জন্য ভারতকে বিস্তৃত বাজার হিসেবে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিল। এভাবে ব্রিটেনে তাদের স্বদেশীয় শিল্পগুলোর উন্নতির জন্য সুবিধা প্রদান করাই ছিল অন্য একটি উদ্দেশ্য।

এইরকম আর্থিক পরিস্থিতিতে, দেশীয় হস্তশিল্পের অবলুপ্তির কারণে একদিকে ভারতে প্রবল বেকারত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। আবার স্থানীয় উৎপাদিত দ্রব্যের অভাবের ফলে ভারতীয় ভোক্তার বাজারে নতুনভাবে চাহিদার সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রিটেনে তৈরি সস্তা দ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধির দ্বারা এই চাহিদা লাভজনকভাবে পূরণ করা হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে, ভারতে আধুনিক শিল্প কারখানাগুলো তাদের শেকড় ছড়াতে শুরু করেছিল। যদিও এদের অগ্রগতি খুব ধীর ছিল। প্রথমদিকে, শিল্পের অগ্রগতি কেবলমাত্র সূতিবস্ত্র এবং পাটকল কারখানা নির্মাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সূতি বস্ত্রের কারখানাগুলো মূলত ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত হতো যেগুলো ভারতের পশ্চিমাঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। যেমন, মহারাষ্ট্র, গুজরাট। আবার, পাটকল শিল্পগুলো মূলত বিদেশীদের দ্বারাই পরিচালিত হতো যেগুলো বিশেষত বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে বিংশশতাব্দীর শুরুর দিকে লৌহ এবং ইস্পাত শিল্পে প্রগতির ধারা শুরু হয়েছিল। 1907 সালে টাটা লৌহ এবং ইস্পাত কোম্পানি (TISCO) স্থাপন করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে চিনি, সিমেন্ট, কাগজ শিল্পের জন্য কিছু শিল্প কারখানার অবির্ভাব ঘটেছিল।

কিন্তু, ভারতে শিল্পায়নের পরবর্তী পর্যায়ে আরও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনী দ্রব্য শিল্পের অভাব ছিল। মূলধনী দ্রব্যের শিল্প বলতে মূলত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী শিল্পকে বোঝায়। যে যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্য তৈরি করা যায়।

তবে, ভারতের ঐতিহ্যবাহি হস্তশিল্পের সামগ্রিক অবলুপ্তির বিকল্প হিসেবে যত্রতত্র স্থাপিত হওয়া কিছু

কাজগুলো করো

➢ ভারতে কোথায় এবং কখন অন্যান্য আধুনিক শিল্পগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার একটি তালিকা তৈরি করো। তুমি কি বলতে পারো কোন আধুনিক শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলো কী? ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্গত জামসেদপুরে টাটার লৌহ এবং ইস্পাত কোম্পানি স্থাপনের কারণগুলো কী কী? উদাহরণসহ বলো।

➢ বর্তমান ভারতে কয়টি লৌহ ইস্পাত কারখানা রয়েছে? উৎকর্ষতার মাপকাঠিতে এই কারখানাগুলো কি পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম? তুমি কী মনে করো? নাকি এই সমস্ত কারখানাগুলোর পুনর্নির্মাণ বা সংস্করণে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তোমার মতামত যদি সংস্করণের পক্ষে হয় তবে তা কীভাবে করা যায়? এক্ষেত্রে একটি মতভেদ প্রচলিত আছে, যে সমস্ত শিল্পগুলো অর্থব্যবস্থায় কোশলগত দিক থেকে প্রয়োজনীয় নয়, তাদের সরকারি ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত রাখার দরকারনেই। এসম্পর্কে তোমার মতামত কী?

➢ স্বাধীনতার সময়ে ভারতে অবস্থিত সূতি বস্ত্রশিল্প, পাটকল এবং বস্ত্রশিল্পের অঞ্চলগুলোকে ভারতের মানচিত্রে চিহ্নিত করো।

উৎপাদন একক যথেষ্ট ছিল না। অধিকন্তু, নতুন শিল্পক্ষেত্রের প্রবৃদ্ধির হার এবং স্থূল দেশীয় উৎপাদন -এ অবদান ছিল খুবই নগন্য। নতুন শিল্পক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা ছিল সরকারি ক্ষেত্রের খুব সীমিত পরিসরের কর্মকাণ্ড। বাস্তবে সরকারিক্ষেত্র কেবলমাত্র রেল ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বন্দর পরিচালনক্ষেত্র এবং কিছু বিভাগীয় কাজকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

1.5 বৈদেশিক বাণিজ্য

প্রাচীনকাল থেকেই ভারত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ভারতে ঔপনিবেশিক সরকার এদেশে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি, বাণিজ্য শুল্ক এবং আমদানি- রপ্তানি শুল্ক প্রবর্তন করেছিল। তারফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল কাঠামো, সংমিশ্রণ এবং বাণিজ্যের পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তার ফলস্বরূপ ভারত কাঁচা রেশম, তুলা, উল, চিনি, নীল, পাট ইত্যাদি প্রাথমিক দ্রব্যের রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছিল। আবার ভারত ব্রিটেনে তৈরি চূড়ান্ত ভোগ দ্রব্য (যেমন রেশম, তুলা এবং উলের বস্ত্র এবং বিভিন্ন মূলধনি দ্রব্য যেমন, হাল্কা যন্ত্রপাতি) আমদানি করতে শুরু করেছিল।

বাস্তবিক অর্থে ব্রিটেন ভারতের রপ্তানি এবং আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া অবস্থা বজায় রেখেছিল। এর ফলস্বরূপ, ভারতের অর্ধেকের বেশি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্রিটেনের সাথেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবং চিন, সিলন (শ্রীলঙ্কা) এবং পারস্যের (ইরান) সাথে বাকি কিছু বাণিজ্য করার অনুমতি পাওয়া যেত। সুয়েজ খাল খোলার ফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণ আরও মজবুত হয়েছিল (1.3 বাক্সটি দেখো)

ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রচুর পরিমাণে সৃষ্ট রপ্তানি উদ্বৃত্ত। কিন্তু এই উদ্বৃত্তের জন্য দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে

কাজগুলো করো

➢ ব্রিটিশ শাসনকালে ভারত থেকে রপ্তানিকৃত এবং ভারতে আমদানিকৃত দ্রব্য সামগ্রীর তালিকা তৈরি করো।

➢ ভারত সরকারের অর্থদপ্তর দ্বারা বিভিন্ন বছরে প্রকাশিত বই 'ইকোনমিক সার্ভে' অবলম্বনে ভারত থেকে রপ্তানিকৃত এবং ভারতে আমদানিকৃত দ্রব্য সমূহে তথ্য সংগ্রহ করো। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ের রপ্তানি এবং আমদানি তথ্যের সাথে এর তুলনা করো। বর্তমানে ভারতের বিশাল পরিমাণ বৈদেশিক বাণিজ্য সামলানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলোর নাম বের করো।

খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, কেরোসিন ইত্যাদির মতো প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রি খুব কম পরিমাণেই পাওয়া যেত। তবে, এই রপ্তানি উদ্বৃত্ত ভারতে স্বর্ণ বা রূপার কোনও প্রকার প্রবাহের সৃষ্টি করেনি। বরং, এই উদ্বৃত্ত প্রয়োগ করে ব্রিটেনে ঔপনিবেশিক সরকারের অফিস পরিচালনা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক খরচ মেটানো হত। ব্রিটিশ সরকারে যুদ্ধের খরচ এবং অনেক অদৃশ্য পণ্য সামগ্রীর আমদানি বাবদ খরচগুলো ভারতের সম্পদ ব্যবহার করে মেটানো হতো।

1.6 জনসংখ্যার পরিস্থিতি

1881 সালে জনগণনার মাধ্যমে সর্বপ্রথম ইংরেজ শাসনাধীন ভারতের জনসংখ্যা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। যদিও এর কিছু নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল,

চিত্র 1.2 : *সুয়েজ খাল : ভারত ও ব্রিটেনে মধ্যে প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম।*

বাক্স 9.3 : সুয়েজখালের মাধ্যমে বাণিজ্য

সুয়েজ খাল হল একটি কৃত্রিম জলপ্রবাহ যা পারস্যের উত্তর-পূর্ব থেকে শুরু হয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। ইহা ভূমধ্যসাগরের উপর অবস্থিত। পোর্ট সৈয়দ এর সাথে লোহিত সাগরের একটি অংশ সুয়েজ উপসাগরকে যুক্ত করে। এই খালটি ইউরোপ ও আমেরিকা এবং দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা এবং ওসেনিয়ার মধ্যে চলাচল করা জাহাজগুলোর জন্য সরাসরি একটি বাণিজ্য পথ খোলে দিয়েছে। এখন তাদের আর আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে আসতে হতো না। কৌশলগত এবং আর্থিকদিক থেকে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জলপথ। 1869 সালে এই জলপথটি খোলার পর পরিবহণ খরচ অনেক কমে গেছে এবং ভারতীয় বাজার আরও সহজলভ্য হয়েছে।

তবু ভারতে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির অসমতা এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে, প্রত্যেক দশ বছর পরপর জনগণনার কাজ করা হয়েছিল। 1921 সালে পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত ভারত জনসংখ্যা রূপান্তরের প্রথম পর্যায়ে ছিল। 1921 সালের পর জনসংখ্যার রূপান্তরের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। এই পর্যায়ে ভারতের মোট জনসংখ্যা বা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কোনটাই খুব বেশি ছিল না।

সামাজিক অগ্রগতির বিভিন্ন সূচকগুলোও তেমনভাবে উৎসাহপ্রদ ছিল না। সামগ্রিকভাবে স্বাক্ষরতার স্তর 16 শতাংশের কম ছিল। এরমধ্যে মহিলাদের স্বাক্ষরতার হার ছিল খুবই নগণ্য, প্রায় 7 শতাংশের কম। বেশিরভাগ জনগণের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিসেবার সুযোগ ছিল না। যেখানে যতটুকু ছিল তা খুবই অপর্যাপ্ত ছিল। এর ফলস্বরূপ, জল এবং বায়ুবাহিত রোগ প্রচণ্ডভাবে ছড়িয়ে পরেছিল এবং অসংখ্য মানুষ মারা গিয়েছিল। তাই ঐ সময়ে মৃত্যুহার খুব বেশি ছিল, এতে আশ্চর্য হওয়ার কোন ব্যাপার নেই। বিশেষত, শিশু মৃত্যুর হার ছিল খুবই বিপদজনক — ঐ সময় হাজারে প্রায় 214 জন শিশু মারা যেত যা বর্তমানে হাজারে প্রায় 40 জন। মানুষের আয়ুষ্কাল ছিল খুবই কম — ঐ সময়ে তা ছিল মাত্র 44 বছর যা বর্তমানে 68 বছর। নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে, ঐ সময় দারিদ্র্যের প্রকোপ কিরূপ ছিল তা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা কঠিন। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতে চরম দারিদ্র্যতা ছিল। এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যার ফলস্বরূপ জনগণের জীবন দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল।

1.7 জীবিকার কাঠামো

ঔপনিবেশিক শাসনকালে, ভারতের জনগণের জীবিকার কাঠামো অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং শিল্পে জনগণের কর্মবিন্যাসে সামান্য পরিবর্তন এসেছিল।

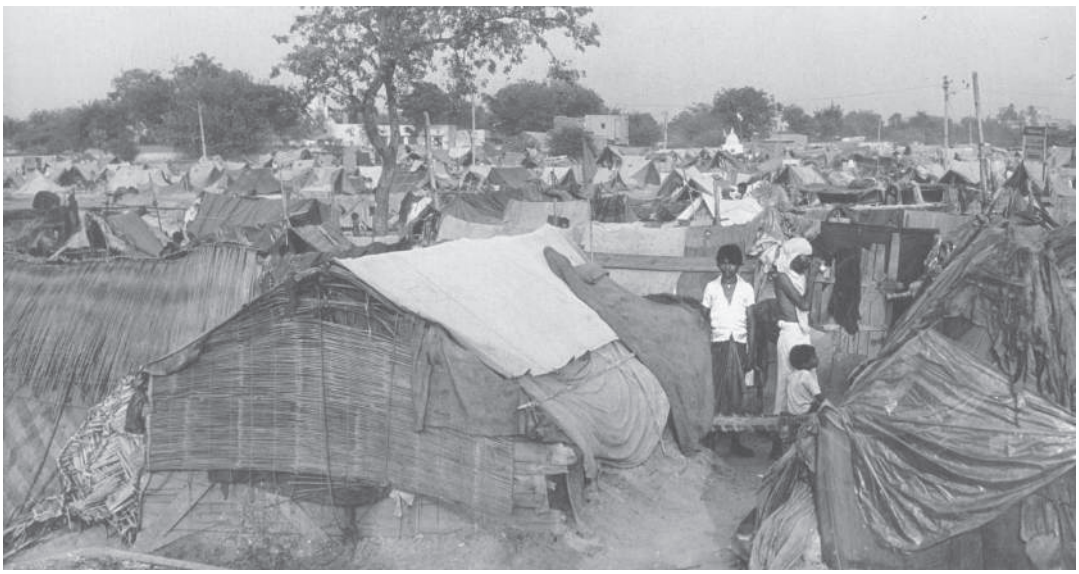

চিত্র 1.3 *: ভারতের জনসংখ্যার অধিকাংশের বাসস্থানের মতো মৌলিক সুবিধাগুলো নেই।*

কাজগুলো করো

➢ স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে প্রায়শই যে দুর্ভিক্ষ হতো এর কারণ বের করতে পারবে কি? এসম্পর্কে জানতে তুমি নোবেল পুরস্কার জয়ী লেখক অমর্ত্য সেনের বই "Poverty and Famines" পড়তে পারো।

➢ স্বাধীনতার সময়ের জীবিকার কাঠামো প্রদর্শনের জন্য একটি পাই চিত্র গঠন করো।

কৃষিক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি পরিমাণ শ্রম নিয়োজিত ছিল প্রায় 70-75 শতাংশের বেশি জনগণ এখানে কাজ করত। আবার, শিল্প এবং সেবাক্ষেত্রে যথাক্রমে 10 শতাংশ এবং (15-20) শতাংশ শ্রমিক নিয়োজিত ছিল। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক বৈষম্য ছিল একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়। তখনকার সময়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি (বর্তমানের তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা এবং কর্ণাটক রাজ্যের সম্মিলিত এলাকা), বোম্বে এবং বাংলায় লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল যে, কৃষি ক্ষেত্রে নির্ভরশীল শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছিল এবং শিল্প — সেবাক্ষেত্রের উপর শ্রমিকদের নির্ভরশীলতা বেড়েছিলো। তবে, একই সময়ে ওড়িশা, রাজস্থান এবং পাঞ্জাবের মতো রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকের পরিমান বেড়ে গিয়েছিল।

1.8 পরিকাঠামো

ঔপনিবেশিক শাসনকালে রেল, বন্দর, জল পরিবহণ, ডাক ব্যবস্থা এবং টেলিগ্রাম ব্যবস্থার মতো মৌলিক পরিকাঠামোগুলো উন্নত হয়েছিল। যদিও, এই ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের স্বার্থরক্ষা করা; তবে জনগণের স্বার্থরক্ষা করা নয়।

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ভারতে রাস্তাঘাটের কাঠামো এবং অবস্থা মূলত আধুনিক পরিবহণের জন্য উপযোগী ছিল না। ঐ সময়ে নির্মিত রাস্তাঘাটগুলোর উদ্দেশ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরে প্রয়োজনের সময় সৈন্য পরিবহণে সহায়তা প্রদান এবং গ্রামীণ ক্ষেত্রে উৎপাদিত কাঁচামালগুলোকে সংগ্রহ করে পার্শ্ববর্তী রেল স্টেশন এবং বন্দরে পৌঁছানো। সেখান থেকে এগুলো সুদূর ইংল্যান্ডে বা লাভজনক বিদেশি গন্তব্যস্থলে সহজে পৌঁছে যেত। গ্রামীণ এলাকা পর্যন্ত সব ঋতুতে এমনকি বর্ষাকালেও ব্যবহারযোগ্য রাস্তার অভাব চিরকালই ছিল। স্বাভাবিকভাবেই, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং দুর্ভিক্ষের সময়ে গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাসরত মানুষেরা প্রায়শই দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করত।

1850 সালে ব্রিটিশরা ভারতে রেলব্যবস্থা স্থাপন করেছিলেন এবং ভারতে রেল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকে তাদের সর্বোত্তম অবদান বলা হয়ে থাকে। রেল ব্যবস্থার প্রবর্তন ভারতের অর্থ ব্যবস্থাকে মূলত দুইভাবে প্রভাবিত করেছিল। একদিকে, সাধারণ মানুষকে অনেক দূরবর্তী স্থানে ভ্রমণের সুযোগ করে দিয়েছিল যার কারণে ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যবধানগুলো দূর করতে সহায়তা করেছিল। অন্যদিকে এটা কৃষির বাণিজ্যকরণের প্রক্রিয়াকে পরিচালন করেছিল। যার ফলে ভারতের গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থার স্বয়ংভরতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তবে নিঃসন্দেহে, ভারতের রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছিল কিন্তু এর সুফল ভারতীয়রা খুব বেশি পায়নি। এভাবে, ভারতে রেল ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণে প্রাপ্ত সামাজিক সুফলগুলো দেশের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

সড়ক এবং রেল ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে

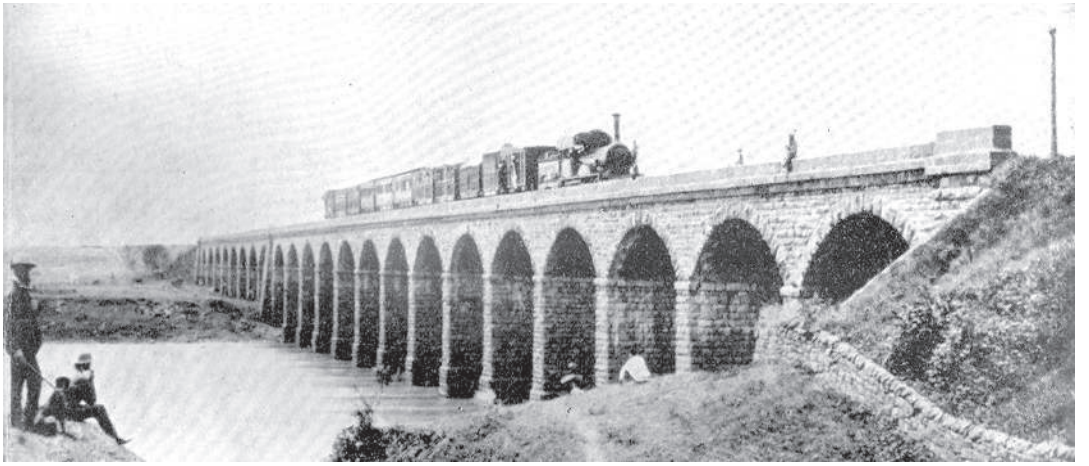

চিত্র 1.4 *: বোম্বে ও থানের সাথে সংযোগকারী প্রথম রেলওয়ে সেতু, 1854*

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় সামুদ্রিক পরিবহণ এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য প্রসারের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। যদিও সেই সমস্ত প্রচেষ্টাগুলো সন্তোষজনক ছিল না। ঐ সময়ে ভারতের অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ ব্যবস্থা অলাভজনক ছিল, যার প্রমাণ ওড়িশা উপকূলের নিকটবর্তী খালটি থেকে পাওয়া যায়। সরকারি কোষাগারের প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এই খালটি খনন করা হলেও, তা রেল ব্যবস্থার সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। খালের পাশাপাশি রেললাইন চালু হওয়ার পরই খালটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। একইভাবে মূলত আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্যই ভারতে দামি বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। অন্যদিকে, যদিও ডাক ব্যবস্থা জনগণের খুব উপকারে এসেছিল কিন্তু তা সার্বিকভাবে অপর্যাপ্ত ছিল। 8 নং অধ্যায়ে তোমরা ভারতের বর্তমান পরিকাঠামো সম্পর্কে আরও জানতে পারবে।

চিত্র 1.5 *: 1932 সালে ভারতে টাটা এন্ড সনস্ এর একটি বিভাগ টাটা এয়ারলাইন্স-এর বিমান পরিসেবার গোড়াপত্তন হয়।*

কাজগুলো করো

➢ এমন একটা ধারণা এখানে রয়েছে যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা বহুক্ষেত্রে যথেষ্ট উপকারী ছিল। এই ধারণাটা নিয়ে যথেষ্ট তথ্যভিত্তিক বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। এই ধারণাটি সম্পর্কে তোমার দৃষ্টিভঙ্গী কি? তোমার শ্রেণিকক্ষে বিষয়টি নিয়ে একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করো — 'ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ভারতবর্ষের জন্য উপকারী বা ভালো ছিল'?

1.9 উপসংহার

যতদিনে ভারত তার স্বাধীনতা অর্জন করেছে, ততদিনে অর্থনীতির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ব্রিটিশের দুই শতকের ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হতে শুরু হয়েছিল। ইতিমধ্যেই, কৃষিক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শ্রমিক এবং স্বল্প উৎপাদনশীলতার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। শিল্প ক্ষেত্রেও আধুনিকীকরণ, (বৈচিত্র্যকরণ), সক্ষমতা সৃষ্টিকরণ এবং সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির তীব্র চাহিদা সৃষ্টি হয়েছিল। এদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য কেবলমাত্র ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবের চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

ভারতের স্বনামধন্য রেল পরিসেবার সাথে সমস্ত পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রগুলোতে উন্নয়ন, প্রসারণ এবং সরকারি জনমুখী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ছিল। ব্যাপক দারিদ্রতা এবং বেকারত্বের প্রকোপ দূর করার জন্য সরকারের জনমুখী আর্থিক নীতির প্রয়োজন ছিল। অতি সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, সেই সময় ভারতবর্ষের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা ছিল অপরিসীম।

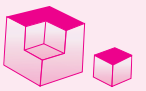

সংক্ষিপ্তবৃত্তি

- স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে অর্জিত উন্নয়নের পর্যায়গুলোকে জানতে এবং তার গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য আমাদের পূর্ববর্তী সময়ের অর্থব্যবস্থাকে বুঝতে হবে।
- ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার অধীনে সরকারের আর্থিকনীতির ধারণাগুলো মূলত ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক স্বার্থের সংরক্ষণ এবং উন্নতির জন্য করা হতো। জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করার জন্য এগুলো করা হতো না।
- দেশের অধিকাংশ জনগণ জীবন নির্বাহের জন্য কৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল হলেও এই ক্ষেত্রটি ক্রমশ স্থবিরতা এবং অবনতির পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।
- ভারতে ব্রিটিশ সরকারের শাসনব্যবস্থা এদেশের বিশ্বখ্যাত হস্তশিল্পকে ধ্বংস করেছিল। এমনকি এর পরিবর্তে ভারতে কোন আধুনিক শিল্পস্থাপনের জন্য তেমন কোন প্রচেষ্টাও নেওয়া হয়নি।
- অপর্যাপ্ত সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা, ঘনঘন সংগঠিত হওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দুর্ভিক্ষ অসহায় ভারতীয় জনগণকে নিঃস্ব করে দিয়েছিল এবং তারই ফলস্বরূপ মৃত্যুহার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।
- পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য ঔপনিবেশিক সরকার দ্বারা কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু তা তাদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য করা হয়েছিল। অতএব, স্বাধীন ভারতের সরকারকে পরিকল্পনার মাধ্যমেই অর্থনৈতিক ভিত্তিস্থাপন করতে হবে।

অনুশীলনী ঃ

1. ভারতে ঔপনিবেশিক সরকার দ্বারা গৃহীত আর্থিক নীতির কেন্দ্রবিন্দু কী ছিল? এই সমস্ত আর্থিক নীতির প্রভাব কী ছিল?
2. ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতের মাথাপিছু আয় পরিমাপকারী কিছু অর্থনীতিবিদ এর নাম করো।
3. ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার স্থবিরতার প্রধান কারণগুলো কী কী?
4. স্বাধীনতার সময়ে দেশে সক্রিয় কিছু আধুনিক শিল্পের নাম করো।
5. প্রাক্ স্বাধীনতার যুগে ব্রিটিশের দ্বারা সুচারুভাবে প্রবর্তিত অবশিল্পায়ন নীতির দ্বৈত উদ্দেশ্যগুলো কী ছিল?
6. ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পকে ধ্বংস করা হয়েছিল। তুমি কি এই মতামতের সাথে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।
7. ভারতে কাঠামোগত উন্নয়নের নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে ব্রিটিশরা কোন্ উদ্দেশ্য পূরণ করতে চেয়েছিল?
8. ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন দ্বারা প্রবর্তিত শিল্পনীতির দুর্বলতাগুলোকে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো।
9. ঔপনিবেশিক সময়ে ভারতীয় সম্পদের নিষ্কাশন বলতে কী বোঝ?
10. জনসংখ্যা রূপান্তরের প্রথম থেকে দ্বিতীয় স্তর নিরূপণের ক্ষেত্রে কোন্ বছরটিকে উল্লেখ করা যেতে পারে?
11. ঔপনিবেশিক সময়ে ভারতের জনসংখ্যার চিত্রটি সংখ্যাতথ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করো।
12. প্রাক্ স্বাধীনতার যুগে ভারতে জনগণের জীবিকার কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো।
13. স্বাধীনতার সময়ে ভারতের মুখ্য অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করো।
14. প্রথম কখন ভারতে সরকারিভাবে জনগণনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল?
15. স্বাধীনতার সময়ে ভারতে বাণিজ্যের পরিমাণ এবং অভিমুখ নির্দেশ করো।
16. ভারতে ব্রিটিশদের কোনরকম সদর্থক অবদান ছিল কি? আলোচনা করো।

প্রস্তাবিত অতিরিক্ত কার্যাবলি ঃ

1. প্রাক্ স্বাধীনতার সময়ে ভারতের গ্রামীণ এবং শহরের জনগণের কাছে উপলব্ধ এবং সেবাকার্যগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো। বর্তমানে মানুষের কাছে এই সমস্ত দ্রব্যগুলোর ভোগ প্রকৃতি কীরূপ তা তুলনা করো। মানুষের জীবনযাত্রার মান-এ পরিলক্ষিত উল্লেখযোগ্য পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করো।

2. তোমার আশেপাশের গ্রাম/শহরের প্রাক্ স্বাধীনতা সময়ের ছবি সংগ্রহ করো এবং তা বর্তমানের পরিস্থিতির সাথে তুলনা করো।

3. "ভারতে কি প্রকৃতই জমিদারি প্রথার অবলুপ্তি ঘটেছে?" — শিক্ষকদের সহায়তা নিয়ে এই বিষয়ে একটি গুচ্ছ আলোচনার ব্যবস্থা করো। যদি সবার মতামত এক্ষেত্রে ঋণাত্মক হয়, তবে কেন এবং কী পদ্ধতি নিয়ে এই প্রথার বিলোপ সাধন করা যায়? তুমি কি মনে করো।

4. স্বাধীনতার সময়ে, দেশের জনগণ জীবিকার জন্য যে সমস্ত ক্ষেত্রে বেশি নিযুক্ত ছিল সেগুলো চিহ্নিত করো। জীবিকার জন্য বর্তমানে মানুষ কোন ক্ষেত্রে বেশি নিযুক্ত? ভারতে প্রচলিত সংস্কার নীতির প্রভাবে, 2020 এর পরবর্তী 15 বছরে জীবিকা কাঠামো কীরূপ হতে পারে বলে তুমি মনে করো?

REFERENCES

BADEN-POWELL, B.H. 1892. *The Land Systems of British India,* Vols I, II and III. Oxford Clarendon Press, Oxford.

BUCHANAN, D.H. 1966. *Development of Capitalist Enterprise in India.* Frank Cass and Co, London.

CHANDRA, BIPAN. 1993. 'The Colonial Legacy' in Bimal Jalan (Ed.), *The Indian Economy: Problems and Prospects.* Penguin Books, New Delhi.

DUTT, R.C. 1963. *Economic History of India*, Vols I and II. Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, New Delhi.

KUMAR, D. AND MEGHNAD DESAI (Eds.). 1983. *Cambridge Economic History of India.* Cambridge University Press, Cambridge.

MILL, JAMES.1972. *History of British India.* Associated Publishing House, New Delhi.

PRASAD, RAJENDRA. 1946. *India Divided.* Hind Kitabs, Bombay.

SEN, AMARTYA. 1999. *Poverty and Famines.* Oxford University Press, New Delhi.

Government Reports

Economic Survey (for various years). Ministry of Finance, Government of India.

2

ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থা
1950 — 1990

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থীরা সক্ষম হবে —

- ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য সম্পর্কে জানতে।
- 1950 থেকে 1990 সাল পর্যন্ত, কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রের ন্যায় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৃহিত উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতিগুলো সম্পর্কে বুঝতে।
- একটি নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থার সুফল এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে চিন্তা করতে।

ভারতে পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ..... এমন একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সূচনা করা, যা জনগণের জীবন যাত্রার মানকে উন্নত করবে এবং মানুষকে সমৃদ্ধতার এবং আরও বেশি বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রার জন্য খুলে দেবে নতুন সুযোগ।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

2.1 ভূমিকা

15 আগস্ট 1947 সালে ভারতে স্বাধীনতার নতুন সকাল এসেছিল। অবশেষে, প্রায় দুইশত বছরের ইংরেজ শাসনের পরে আমরা আমাদের নিজের ভাগ্য গড়ার অধিকার পেলাম। দেশ গড়ার দায়িত্ব এখন আমাদের হাতে এল। অন্যান্য বিষয়ের মতোই, আমাদের দেশের ভাগ্য নির্দ্ধারনে উপযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধরন কী হবে তা স্বাধীন ভারতের নেতৃত্বকেই স্থির করতে হতো, যে ব্যবস্থায় সার্বিকভাবে মুষ্টিমেয়র বদলে সবার কল্যাণ সাধন হতে পারে। এক্ষেত্রে অনেক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে। যার মধ্যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাই জওহরলাল নেহরুর কাছে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছিল। তবে পূর্বতন সোভিয়েত সংঘে যে ধরনের সমাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তিনি তার পক্ষে ছিলেন না। সেখানে উৎপাদনের সকল মাধ্যম বা উৎসগুলো সরকারের মালিকানায় ছিল। যেমন - বিভিন্ন কল কারখানা এবং ফার্ম যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে কোনো সম্পদই ছিল না।

পূর্বতন সোভিয়েত সংঘে যা করা সম্ভব হয়েছিল তা ভারতের মতো গণতন্ত্রে ছিল না। ভারতের মতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, সরকারের পক্ষে সার্বিকভাবে জমির মালিকানা এবং অন্যান্য সম্পত্তি সংক্রান্ত মালিকানার ধরণ পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না।

তাই নবগঠিত স্বাধীন রাষ্ট্র, ভারতের জন্য নেহরু অন্যান্য জাতীয় নেতৃত্ব এবং চিন্তাবিদরা চূড়ান্ত পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিবর্তে একটি বিকল্পনীতি খুঁজেছিলেন। মূলত সমাজতান্ত্রিক মনোভাবের উপর সহানুভূতি রেখেই তারা এমন একটি অর্থ ব্যবস্থা প্রণয়নের পথ অনুসন্ধান করেছিলেন যাতে তাদের বিচারে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার ত্রুটিগুলোকে দূরে সরিয়ে রেখে এর সুফলগুলো বজায় রাখা যাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতে শক্তিশালী সরকারি ক্ষেত্রের সাথে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গঠিত হবে। কিন্তু এর পাশাপাশি জনগণের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা এবং গণতান্ত্রিক

কাজগুলো করো

➢ বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের অর্থ ব্যবস্থার একটি চার্ট তৈরি করো। এদের মধ্যে পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক এবং মিশ্র অর্থ ব্যবস্থাভুক্ত দেশগুলোকে তালিকাভুক্ত করো।

➢ একটি কৃষি খামার ভ্রমণের পরিকল্পনা করো। শ্রেণির সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সাতটি দলে বিভক্ত করো এবং প্রত্যেক দলের জন্য একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করো। যেমন- ভ্রমণের উদ্দেশ্য, ভ্রমণের আর্থিক খরচ সংক্রান্ত বিষয়, সময়কাল নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় সম্পদ বা উপকরণ দলের সাথে কে যাবে এবং কাদের সাথে পরামর্শ করা হবে, ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ, সেখানে কি জানবে কি প্রশ্ন করা হবে ইত্যাদি। এখন, শিক্ষকের সহযোগিতায় এই সমস্ত লক্ষ্যগুলোকে একত্রিত কর এবং দীর্ঘকালীনভাবে কৃষিক্ষেত্র ভ্রমণের সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় লক্ষ্যের সাথে এদের তুলনা করো।

বাক্স ২.১ : অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ধরন

প্রত্যেক সমাজকেই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে

- দেশে কী ধরনের দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদিত হবে?
- কীভাবে দ্রব্য এবং সেবাকার্য উৎপাদিত হবে? উৎপাদক উৎপাদন ক্ষেত্রে মানবিক শ্রম বা মূলধনের (মেশিন) মধ্যে কোন্‌টি বেশি ব্যবহার করবে?
- কীভাবে উৎপাদিত দ্রব্য এবং সেবাকার্য জনগণের মধ্যে বণ্টিত হবে?

চাহিদা ও যোগানের বাজার শক্তির উপর ভিত্তি করেই এই সমস্ত প্রশ্নের একটা উত্তর খোঁজা যেতে পারে। বাজারি অর্থ ব্যবস্থায়, যাকে পুঁজিবাদও বলা হয়, শুধুমাত্র সেই সমস্ত ভোগ্যপণ্য ও সেবাকার্যই উৎপাদিত হবে যেগুলোর পর্যাপ্ত চাহিদা রয়েছে। অর্থাৎ সে সমস্ত দ্রব্যকে দেশীয় বা বিদেশি বাজারে লাভজনকভাবে বিক্রি করা যেতে পারে। যদি গাড়ির চাহিদা থাকে তবে গাড়ি এবং যদি বাইসাইকেলের চাহিদা থাকে তবে বাইসাইকেল উৎপাদিত হবে। যদি মূলধনের তুলনায় শ্রম সস্তা হয়, তবে উৎপাদনে শ্রম নিবিড় পদ্ধতিটি প্রযোজ্য হবে, এবং বিপরীত ক্রমেও তা সত্য হবে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদিত দ্রব্যের বণ্টন জনগণের চাহিদার উপর ভিত্তি করে হয় না। এক্ষেত্রে দ্রব্যে ও সেবার বণ্টন মূলত জনগণের ক্রয়ক্ষমতার উপর ভিত্তি করেই হয়। অর্থাৎ দ্রব্য ক্রয়ের জন্য পকেটে অর্থ থাকতেই হবে। দরিদ্র জনগণের জন্য স্বল্প খরচের বাসস্থান খুবই প্রয়োজনীয় কিন্তু বাজার ব্যবস্থায় এটাকে কোনোভাবেই চাহিদা হিসাবে গণ্য করা হবে না। কারণ, চাহিদা পূরণের মতো ক্রয় ক্ষমতা দরিদ্রদের কাছে নেই। যার ফলে বাজার শক্তির ভিত্তিতে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন এবং যোগান সৃষ্টি হবে না। আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহর লাল নেহরুর কাছে এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থা মোটেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। এর কারণ হল যে এইরকম সমাজ ব্যবস্থায় দেশের অধিকাংশ জনগণ তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়, সরকার মূলত সামাজিক চাহিদার উপর ভিত্তি করেই, কী পণ্য উৎপাদিত হবে, তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে মনে করা হয়, দেশের জনগণের জন্য কী উৎকৃষ্ট হবে তা সরকার ভালো জানে এবং তাই, ভোক্তার ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ তেমন গুরুত্ব পায় না। দ্রব্য সামগ্রী কীভাবে উৎপাদিত হবে এবং কীভাবে তা বণ্টিত হওয়া দরকার সে সম্পর্কে কেবল সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তত্ত্বগতভাবে, সমাজতন্ত্রে মূলত মানুষের প্রয়োজনে বা চাহিদার ভিত্তিতে দ্রব্যের বণ্টন হয়ে থাকে, বণ্টন কখনো তাদের ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে হয় না। উদাহরণ স্বরূপ, একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সকল নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করে, যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কাঠামোগতভাবে সব কিছুই যেহেতু রাষ্ট্রের মালিকানাধীন, তাই এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে কিছু থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ, সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের ভিত্তিতে অধিকাংশ অর্থনৈতিক কার্যকর্ম পরিচালিত হচ্ছে।

বেশির ভাগ অর্থ ব্যবস্থাই মূলত মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা অর্থাৎ সরকার এবং বাজার ব্যবস্থা একত্রিতভাবেই, কি উৎপাদিত হবে, কিভাবে উৎপাদিত হবে এবং কিভাবে উৎপাদিত দ্রব্য বণ্টিত হবে, এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে। মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায়, বাজার ব্যবস্থা সেই সমস্ত দ্রব্য এবং সেবাকার্যই উৎপাদন করবে যেগুলো ওরা ভালোভাবে যোগান দিতে পারে। অন্যদিকে সরকার সেইসমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবাকার্যের যোগান দেবে সেগুলো বাজার ব্যবস্থা দিতে ব্যর্থ হবে।

বাক্স 2.2 : পরিকল্পনা কি?

কোনো দেশের সমস্ত সম্পদ বা উপকরণগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করা উচিত, সেটাই পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। যে-কোনো পরিকল্পনাতে কিছু সাধারণ লক্ষ্যের সাথে সাথে কিছু বিশেষ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যও থাকে, যেগুলো নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে পূরণ করতে হয়। ভারতে পরিকল্পনার সময়কাল পাঁচ বছর এবং তাই এদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বলে (জাতীয় পরিকল্পনার, অগ্রণীদেশ, পূর্বতন সোভিয়েত সংঘ থেকেই আমরা পরিকল্পনার ধারণাগুলো গ্রহণ করেছিলাম)। আমাদের পরিকল্পনা নথিতে কেবলমাত্র পাঁচ বছরের জন্য কিছু লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা থাকে না। এর সাথে পরবর্তী বিশ বছরে কাঙ্খিত উদ্দেশ্যগুলো স্থির করা হয়। দীর্ঘকালীন পরিকল্পনাকে পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোই পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনার জন্য ভিত্তি প্রদান করবে, এটাই ধারণা করা হয়।

সব পরিকল্পনায় সবগুলো লক্ষ্যই সমান গুরুত্ব পাবে, তা আশা করা অবাস্তব হবে। বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে লক্ষগুলো পরস্পর বিরোধীও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি প্রবর্তনের লক্ষ্যে এবং প্রসারের দিকটি রোজগারের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের বিপরীতে কাজ করতে পারে যদি এই প্রযুক্তি শ্রমের প্রয়োজনকে হ্রাস করে দেয়। এক্ষেত্রে পরিকল্পনাকারীদের বিভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে হবে, যা বাস্তবে খুবই কঠিন কাজ। আমরা এটা দেখতে পাই যে ভারতে বিভিন্ন পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন লক্ষ্যের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, কোন্ দ্রব্য এবং সেবার কি পরিমাণে উৎপাদন করা হবে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় না। এটা করা অসম্ভব এবং অপ্রয়োজনীয় (পূর্বতন সোভিয়েত সংঘ তা করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল)। এটাই যথেষ্ট যদি পরিকল্পনায় কোন ক্ষেত্রগুলোকে সুনির্দিষ্ট গুরুত্ব দেবে তা বলা হয়। যেমন বিদ্যুৎ এবং সেচ ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব প্রদান। বাকি ক্ষেত্রগুলোকে বাজার ব্যবস্থার উপর ন্যস্ত করা।

অধিকারগুলোও বজায় থাকবে। সরকার অর্থ ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করবে সাথে সাথে বেসরকারি ক্ষেত্রকেও উৎসাহিত করা হবে পরিকল্পনা প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করার জন্যে। (বাক্স 2.2 লক্ষ করো) 1948 সালের 'শিল্পনীতিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ" এবং ভারতের সংবিধানে নির্দেশাত্মক নীতিগুলোতে একই দৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছিল। 1950 সালে, প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়েছিল। সেই থেকে শুরু হয়েছিল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যুগ।

2.2 পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ

যে-কোনো পরিকল্পনার কিছু সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলো হল ঃ প্রবৃদ্ধি বা বিকাশ, আধুনিকীকরণ, আত্মনির্ভরতা এবং সাম্য - এর অর্থ এই নয় যে, সবগুলো পরিকল্পনাতে উক্ত সবগুলো লক্ষ্যের উপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সীমিত সম্পদের কারণে প্রত্যেক পরিকল্পনাতেই প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যাই হোক, পরিকল্পনার নীতি নির্দেশিকার প্রধান চারটি লক্ষ্যের মধ্যে যাতে পরস্পর বিরোধী অবস্থার সৃষ্টি না হয় পরিকল্পনাকারীদের এই বিষয়টি অন্তত সুনিশ্চিত করতে হবে। চলো, এখন আমরা বিশদভাবে পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।

বিকাশ ঃ বিকাশ বা প্রবৃদ্ধি বলতে দেশের পণ্য এবং সেবাকর্ম উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধিকে বোঝায়। এর মানে হল হয় দেশের উৎপাদনশীল মূলধনের মজুত বৃদ্ধি বা উৎপাদন মূলধন এবং সেবাদ্রব্যের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা অথবা পরিবহন এবং ব্যাংক পরিষেবার মতো সহায়কমূলক

বাক্স 2.3 : মহালনবিশ ঃ ভারতীয় পরিকল্পনার রূপকার

আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করার ক্ষেত্রে বহু বিশিষ্ট চিন্তাবিদরা তাদের অবদান রেখেছেন। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের নাম খুবই উল্লেখযোগ্য।

পরিকল্পনা বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বোঝায়, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকেই তা শুরু হয়েছিল। ভারতে সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য অবস্থান ছিল। যেখানে ভারতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলোর মৌলিক ধারণা প্রদান করা হয়। এই পরিকল্পনাটি মূলত মহালনবিশের চিন্তাভাবনার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপট থেকে বিচার করলে তাঁকে ভারতীয় পরিকল্পনার স্থাপিতকার বলা যায়।

1893 সালে কোলকাতায় মহালনবিশের জন্ম হয়েছিল। কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। পরিসংখ্যান বিষয়ে অবদানের কারণে উনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 1946 সালে তিনি ব্রিটেনের রয়েল সোসাইটির একজন সভ্য নির্বাচিত হন। যা ছিল বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। শুধুমাত্র অসাধারণ বিজ্ঞানীদেরই এই সোসাইটির সভ্য করা হত।

মহালনবিশ কোলকাতার "ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউট" (ISI) স্থাপন করেছিলেন এবং "শঙ্খ" নামে একটি পত্রিকা চালু করেছিলেন যা এখনও পরিসংখ্যানবিদের কাছে মতবিনিময় এবং আলোচনার এক সম্মানজনক মঞ্চ হিসেবে কাজ করছে। আজও 'ISI' এবং শঙ্খ উভয়েই সমগ্র বিশ্বের পরিসংখ্যানবিদ এবং অর্থনীতিবিদদের দ্বারা খুবই সমাদৃত। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে মহালনবিশ ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ভারতের এবং বিদেশের বহু অর্থনীতিবিদদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন পরবর্তী সময়ে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তা থেকেই বোঝা যায় তিনি মেধাবী মানুষ চিনতে পারতেন। মহালনবিশের আমন্ত্রিত অর্থনীতিবিদ্দের মধ্যে এমন মানুষও ছিলেন, যারা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমাজবাদি চিন্তাধারার তীব্র সমালোচক ছিলেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, তিনি তার সমালোচকদের বক্তব্য শুনতে চেয়েছিলেন। এ থেকে উনার মহান পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্তমানে অনেক অর্থনীতিবিদরাই, মহালনবিশ রচিত পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতির পথ নির্দশনের ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। পরিসংখ্যান তত্ত্বে তার অবদানের জন্য পরিসংখ্যানবিদরা উপকৃত হচ্ছেন।

উৎস ঃ- *Sukhamoy Chakraborty, 'Mahalonobish, Prasanta Chandra' in John Eatwell et.al, (Eds.). The New palgrave Dictionary Economic Development, w.w. Noton New York and London.*

বাক্স ২.৪ : সেবাক্ষেত্র

একটি দেশের উন্নয়নের সাথে সাথে তার 'কাঠামোগত পরিবর্তন' সাধিত হয়। এক্ষেত্রে ভারতের অদ্ভুত রকমের কাঠামোগত পরিবর্তন হয়। সাধারণত, উন্নয়নের সাথে সাথে সমগ্র দেশীয় উৎপাদনে কৃষিক্ষেত্রের অবদান কমতে থাকে এবং শিল্পক্ষেত্রের অংশিদারিত্ব ক্রমশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। উন্নয়নের উচ্চ স্তরে সেবা ক্ষেত্রটি অন্যান্য দুটি ক্ষেত্রের তুলনায় GDP (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন) তে বেশি অবদান রাখে। ভারতের GDP -তে কৃষিক্ষেত্রের অংশ 50 শতাংশের বেশি ছিল, যা আমরা একটি দরিদ্র দেশের ক্ষেত্রে আশা করতে পারি। কিন্তু 1990 সাল নাগাদ ভারতের সেবাক্ষেত্রের অংশ ছিল 40.59 শতাংশ (GDP-তে), যা কৃষি অথবা শিল্পক্ষেত্র থেকে অধিক ছিল। এমনটাই মূলত উন্নত দেশগুলোতে দেখতে পাওয়া যায়। সেবাক্ষেত্রের অংশীদারিত্বের এই ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া 1991 সালের পরবর্তী সময়ে লক্ষ করা যায়। (এটি ছিল দেশের বিশ্বায়ন শুরুর চিহ্ন স্বরূপ- যা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হবে)।

ক্ষেত্রের প্রসার ঘটানো। অর্থনীতির ভাষায়, প্রবৃদ্ধি বা বিকাশের উৎকৃষ্ট সূচক হল মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) ক্রমাগত/নিয়মিত বৃদ্ধি। কোন নির্দিষ্ট বছরে কোন দেশে উৎপাদিত সমস্ত দ্রব্য এবং সেবাকর্মের আর্থিক /বাজার মূল্যই হল ঐ দেশের GDP। তোমরা GDP কে একটি 'কেক্' মনে করতে পারো এবং বিকাশ হল ঐ কেকের আয়তন বৃদ্ধি হওয়া। যদি কেক্টির আয়তন বড়ো হয়, তবে অধিক সংখ্যক লোক তা ভোগ করতে পারবে। ভারতের জনগণ যদি আরো সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় জীবনযাপন করতে চায় তবে তাদের আরও দ্রব্য এবং সেবাকার্যের উৎপাদন করতে হবে (প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে)।

অর্থ ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকেই দেশের GDP-র উদ্ভব হয়। যেমন — কৃষিক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র এবং সেবাক্ষেত্র। প্রত্যেকটি ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত অবদানের মাধ্যমেই অর্থব্যবস্থার কাঠামোগত বা ক্ষেত্রগত গঠন তৈরি হয়। কিছু দেশে, GDP-র বিকাশ কৃষির অবদান বেশি, আবার কিছু দেশের GDP-র বিকাশে সেবাক্ষেত্রের অবদান বেশি থাকে। (বাক্স 2.4-এ দেখো)।

আধুনিকীকরণ ঃ দ্রব্য এবং সেবা কার্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য উৎপাদকের নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে। যেমন — পুরানো বীজের পরিবর্তে নতুন বীজ ব্যবহার করে একজন কৃষক উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। একইভাবে নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। নতুন প্রযুক্তির গ্রহণকেই আধুনিকীকরণ বলা হয়।

তবে আধুনিকীকরণ বলতে কেবলমাত্র নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারকেই বুঝায় না। এরসাথে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনকেও বোঝায়। যেমন— সমাজে মহিলাদেরও পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার প্রদানের স্বীকৃতি। চিরাচরিত সমাজ ব্যবস্থায় এটা মনে করা হয়, মহিলারা ঘরে থাকবে এবং পুরুষরা কাজ করবে। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায়, মহিলাদের কর্মদক্ষতাকে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যেমন— ব্যাংক পরিষেবায়, শিল্পক্ষেত্রে, বিদ্যালয় ইত্যাদিতে এবং এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থা প্রায়শই খুব সমৃদ্ধ হয়।

আত্মনির্ভরতা ঃ কোনো একটি দেশ তার নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে অথবা অন্যান্য দেশসমূহ থেকে আমদানিকৃত সম্পদ ব্যবহার করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (বিকাশ) এবং আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে পারে। প্রথম সাতটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আত্ম-নির্ভরতার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। যার অর্থ ভারতে উৎপাদন করা

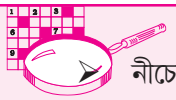

কাজগুলো করো

নীচের বিষয়গুলোতে পরিবর্তিত প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো ঃ-

ক) খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদন

খ) দ্রব্যকে প্যাকেট জাত করা

গ) গণমাধ্যম

- 1990-91 এবং 2014-15 সালের মধ্যে ভারতের রপ্তানি এবং আমদানিজাত মুখ্য দ্রব্যগুলো চিহ্নিত করো এবং তালিকা তৈরি করো।

ক) পার্থক্য বের করো

খ) আত্ম-নির্ভরশীলতার প্রভাব বোঝা যায় কি?

এগুলো বিষদভাবে জানতে তোমরা পরবর্তী বছরের 'ইকোনমিক সার্ভে' দেখ।

সম্ভাব্য দ্রব্যগুলোর আমদানি এড়িয়ে যাওয়া। এই নীতিটি, বিশেষত খাদ্যের জন্য বিদেশি রাষ্ট্রের উপর আমাদের নির্ভরতা কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। এটা সহজেই বোঝা যায় যে জনগণ সম্প্রতি বিদেশি আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়েছে তাদের স্বনির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। অধিকন্তু এই আশঙ্কাও ছিল যে, আমদানিকৃত খাদ্যের সরবরাহ, বিদেশি প্রযুক্তি এবং বিদেশি পুঁজির উপর নির্ভরশীলতা আমাদের সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করতে পারে। বিদেশি নির্ভরশীলতা আমাদের দেশের নীতি নির্দেশকগুলোতে বিদেশি হস্তক্ষেপ বাড়াতে পারে।

সাম্যতা : কেবলমাত্র বিকাশ, আধুনিকীকরণ এবং আত্মবিকাশের স্তর খুব উঁচুতে এবং তার কাছে সর্বোৎকৃষ্ট আধুনিক প্রযুক্তিও থাকতে পারে। তা সত্ত্বেও সেই দেশের অধিকাংশ মানুষদরিদ্র হতে পারে। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সুফলগুলো যাতে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে তা যাতে কেবলমাত্র ধনীর ভোগের বস্তু না হয়। তাই বিকাশ আধুনিকীকরণ এবং আত্মনির্ভরশীলতার সাথে সাথে সাম্যতার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। প্রত্যেক ভারতীয়কে খাদ্য তার উপযুক্ত বাসস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে সমর্থ হতে হবে। সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে অসাম্যতা দূর করতে হবে।

এখন আমরা দেখব 1950-1990 এর সময়কালের মধ্যে প্রথম সাতটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চারটি মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণে কী ধরনের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। তাদের এই প্রচেষ্টা কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যক্ষেত্রের সফলতা অর্জনে কতদূর ফলপ্রসূ হয়েছিল। 1991 সালের পরবর্তী সময়ে উন্নয়ন বিষয়ে এবং নীতি নির্দেশিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে পড়বো।

2.3 কৃষি

প্রথম অধ্যায়ে তোমরা জানতে পেরেছ যে, ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতে কৃষিক্ষেত্রে বিকাশ বা সাম্যতা কোনটাই ছিল না। স্বাধীন ভারতের নীতি নির্ধারকদের এই বিষয়গুলো সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করতে হয়েছিল। কৃষিক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার এবং উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে তারা ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে একরকম বৈপ্লবিক ধারার সূচনা করেছিলেন।

ভূমি সংস্কার

স্বাধীনতার সময়ে, ভারতের ভূমিস্বত্ত্ব ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের অবস্থান (যাদের জমিদার, জাগিরদার ইত্যাদি বিভিন্ন নামে জানা যায়)।

বাক্স ২.৫ : মালিকানা এবং উদ্দীপক সমূহ

"কৃষকের জমি" নীতিটি যে ধারণার উপর ভিত্তি করে হয়েছিল তা হল, কৃষককে যদি জমির মালিকানা প্রদান করা হয়, তবে তারা উৎপাদন বৃদ্ধিতে অধিক উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সাথে কাজ করবে। কারণ, জমির মালিকানা পেলে কৃষকরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উৎপাদন থেকে মুনাফা অর্জন করতে পারবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কেবল জমির মালিকরাই বর্ধিত উৎপাদনের সুফল পাবে ততক্ষণ প্রজাচাষিরা জমির উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হবে না। উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎসাহ উদ্দীপনার ক্ষেত্রে মালিকানার প্রভাবের গুরুত্ব মূল্যায়নের জন্য একটি উদাহরণ আলোচনা করা যায়। যেমন — পূর্বতন সোভিয়েত সংঘে কৃষকরা খুবই দায়সারাভাবে বিক্রির জন্য ফল প্যাকেটজাত করত। প্রায়শই দেখা যেত, কৃষকরা একই বাক্সে ভালো ফলের সাথে পচা ফলও দিয়ে দিচ্ছে। যদিও প্রত্যেকটি কৃষকই জানত, একই বাক্সে পচা ফলের সাথে ভালো ফল দিলে পচা ফলগুলো ভালো ফলকে নষ্ট করে দেবে। যেহেতু ফলগুলো বিক্রি করা যাবে না, তাই কৃষকের লোকসান হবে। তাহলে পূর্বতন সোভিয়েত সংঘে কৃষকরা কেন এমন করত যাতে তাদের নিশ্চিতভাবে লোকসান হবে? এর উত্তরটি কৃষকদের উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জড়িত। যেহেতু পূর্বতন সোভিয়েত সংঘে কৃষকদের নিজস্ব কোনো জমি ছল না, তাই তাদের লাভ বা ক্ষতি কোনটাই স্পষ্ট করত না। মালিকানা স্বত্বের অনুপস্থিতিতে, কৃষকদের দক্ষতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তেমন কোনো উদ্দিপনা ছিল না। এ থেকে বোঝা যায় বিশাল পরিমাণ উর্বর জমি থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েত সংঘে কেন কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা খারাপ ছিল।

উৎস : *Thomas Sowell, Basic Economics : A Citizen's Guide to the Economy, New York : Basic Book, 2004, Second Edition।*

যারা কেবলমাত্র জমির প্রকৃত চাষিদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত। তবে কৃষির উন্নতির জন্য এদের কোনো অবদান ছিল না। কৃষিক্ষেত্রের স্বল্প উৎপাদনশীলতা ভারতকে আমেরিকা থেকে খাদ্য আমদানি করতে বাধ্য করেছিল। কৃষিক্ষেত্রে সাম্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। যাতে প্রাথমিকভাবে জমির জোতের মালিকানা পরিবর্তনকেই বোঝানো হয়েছে। স্বাধীনতার একবছর পরেই মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপ সাধনের জন্য এবং চাষিদের জমির মালিকানা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। এই পদক্ষেপের পেছনে যুক্তি ছিল যে, চাষিদের জমির মালিকানা প্রদান করা হলে তারা জমির উন্নতির জন্য নিজেদের নিয়োজিত করতে উৎসাহিত হবে। তবে তাদের জন্য পর্যাপ্ত মূলধনেরও ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে সাম্যতার পরিধি বিস্তারের জন্য অন্য একটি ব্যবস্থাও ছিল তা হল জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের নীতি। যার অর্থ হল কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন জমির সর্বোচ্চ সীমানা নির্ধারণ করা। জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত জমির মালিকানাকে হ্রাস করা।

মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপ সাধনের ফলে প্রায় 200 লাখ চাষি সরাসরি সরকারের সংস্পর্শে এসেছিল। এভাবে এরা জমিদারদের শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল। প্রজা চাষিদের জমির মালিকানা প্রদান করায় তারা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত হয়েছিল। তার ফলে কৃষিক্ষেত্রের অগ্রগতি হয়েছিল। তবে মধ্যস্বত্বকারীদের অবলুপ্তির মাধ্যমে সাম্যতার লক্ষ্যটি সম্পূর্ণভাবে পূরণ হয়নি। কিছু কিছু অঞ্চলে পুরাতন জমিদাররা আইনের ফাঁক কাজে লাগিয়ে বিশাল পরিমাণ

জমি নিজেদের দখলে রেখেছিল। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছিল যেখানে ভাগচাষিদের উৎখাত করা হয়েছিল এবং ভূস্বামীরা নিজেদের জমির প্রকৃত চাষি হিসাবে দাবি করে জমির মালিকানা দাবি করেছিলেন। এমনকি, কৃষকদের জমির মালিকানা প্রাপ্তির পরেও দরিদ্রতম কৃষি শ্রমিকরা (যেমন ভাগচাষী এবং ভূমিহীন শ্রমিক) ভূমি সংস্কারে সুফল পায় না।

জমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণকারী আইনটিও অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। বড়ো ভূস্বামীরা আদালতে আইনটির বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন। যাতে এর বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছিল। এই বিলম্বিত সময়কালের মধ্যে তারা তাদের জমি নিকট আত্মীয়দের নামে নথিভুক্ত করেছিল। এভাবে তারা ভূমি সংস্কার আইনকে উপেক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। আইনটিতেও এমন অনেক ফাঁক ছিল যেগুলোর সুযোগ কাজে লাগিয়ে বড়ো ভু-স্বামীরা তাদের জমি ধরে রেখেছিল। কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কার প্রক্রিয়াটি সফল হয়েছিল। কারণ, এইসমস্ত রাজ্যের সরকারগুলো তাদের নীতির ভিত্তিতে প্রকৃত চাষীদের কাছে জমি প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত অন্যান্য রাজ্যগুলোর দায়বদ্ধতা একই স্তরের ছিল না এবং যার ফলে আজও জমির জোত নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশাল অসাম্যতা রয়ে গেছে।

সবুজ বিপ্লব : স্বাধীনতার সময় দেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ জনসংখ্যা কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা খুবই কম ছিল কারণ, সেখানে পুরোনো প্রযুক্তি ব্যবহার হত এবং অধিকাংশ কৃষকদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ছিল না। ভারতীয় কৃষি মূলত বৃষ্টিপাত নির্ভর ছিল। যদি বৃষ্টিপাত কম হত তবে কৃষকরা সমস্যায় পড়তো যেহেতু খুব কম সংখ্যক কৃষকরাই সেচের সুবিধা পেত। ঔপনিবেশিক শাসনকালের কৃষিক্ষেত্রের স্থবিরতা মূলত সবুজ বিপ্লবের দ্বারা স্থায়ীভাবে দূর হয়েছিল। এক্ষেত্রে, উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বিশেষত ধান এবং গমের ফলন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই ধরনের বীজ ব্যবহারের জন্য সঠিক পরিমাণে সার এবং কীটনাশকের সাথে সাথে নিয়মিত জল সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই ধরনের উপকরণের সঠিক অনুপাতে প্রয়োগ করা জরুরি ছিলো। যে সমস্ত কৃষকরা উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। তাদের জন্য নিয়মিত জলসেচ ব্যবস্থার পাশাপাশি কৃষকদের অর্থনৈতিক সাহায্যেরও প্রয়োজন হয়ে পরেছিল যাতে তারা সার এবং কীটনাশক কিনতে পারে। তার ফলে সবুজ বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে, (1960 সালের মাঝামাঝি সময় থেকে 1970-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত) উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার কেবলমাত্র পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুর মত কিছু সমৃদ্ধ রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাছাড়া কেবলমাত্র গম উৎপাদক অঞ্চলগুলোতেই উচ্চফলনশীল বীজ প্রয়োগের সুফলগুলো পাওয়া গিয়েছিলো। সবুজ বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে (70-80 দশকের মাঝামাঝি সময়), HYV প্রযুক্তি আরও অনেক রাজ্যের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং এর ফলে আরও অনেক ধরনের ফসলের ক্ষেত্র এর সুফল পাওয়া যায়। সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের বিস্তারের ফলে ভারত খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করে। আমাদের দেশের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে আর আমাদের আমেরিকা বা অন্যান্য দেশের দয়ার উপর নির্ভর করতে হল না।

কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এটি যথেষ্ট নয়। বাজারে বিক্রির পরিবর্তে, যদি কৃষকরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত উৎপাদনের অধিকাংশই নিজেরা ভোগ করে। তবে সামগ্রিকভাবে, অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে কোন পরিবর্তন আসবে না। অন্যদিকে, যদি কৃষকরা বাজারে যথেষ্ট পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রি করে,

তবে এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উৎপাদন অর্থব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে। কৃষকরা কৃষিজাত দ্রব্যের যে অংশ বাজারে বিক্রি করে তাকে বাজার উদ্বৃত্ত বলে। সবুজ বিপ্লবের সময়ে, উৎপাদিত ধান এবং গমের একটি ভালো অংশই কৃষকরা বাজারে বিক্রি করত (বাজার উদ্বৃত্ত হিসেবে)। তার ফলে, অন্যান্য ভোগ্যদ্রব্যের তুলনায় খাদ্যশস্যের দাম কমে গিয়েছিল। স্বল্প আয়ী শ্রেণি যারা তাদের আয়ের একটা বিরাট অংশ খাদ্যের জন্য খরচ করে, দাম হ্রাসের ফলে তারা অপেক্ষাকৃত অধিক উপকৃত হয়েছিল। সবুজ বিপ্লবের ফলে সরকার যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যশস্যের মজুত সৃষ্টি করতে পেরেছিল যাতে খাদ্য সংকটের সময় তা ব্যবহার করা যায়। যদিও সবুজ বিপ্লবের ফলে দেশ বহুলাংশে উপকৃত হয়েছিল, তবে ব্যবহৃত প্রযুক্তি সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকি মুক্ত ছিল না, এরকম একটি প্রধান ঝুঁকি সম্ভবত ছিলো ধনী এবং দরিদ্র চাষিদের মধ্যে অসাম্যতা বৃদ্ধি। কারণ এক্ষেত্রে কেবল ধনী কৃষকদের কাছেই প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সংগ্রহ করার সামর্থ্য ছিল। যাতে কেবল তারাই সবুজ বিপ্লবের সুফলগুলো গ্রহণ করতে পারতো। অধিকন্তু, এসমস্ত উচ্চফলনশীল জাতের শস্যগুলোতে কীটপতঙ্গের আক্রমণের আশঙ্কা বেশি ছিল। তাই ক্ষুদ্র কৃষক, যারা এই প্রযুক্তি গ্রহণ করেছিল তারা কীটপতঙ্গের আক্রমণে সর্বস্বান্ত হতে পারত।

সৌভাগ্যবশত, সরকারের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এই সমস্ত আশঙ্কাগুলো বাস্তবে পরিণত হয়নি। সরকার, ক্ষুদ্রচাষিদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করেছিলো এবং ভর্তুকিতে সার দিয়েছিল যাতে ক্ষুদ্র চাষিরাও তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ পেতে পারে। যেহেতু ক্ষুদ্রচাষিরা প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পারতো, তাই কালক্রমে ক্ষুদ্র ফার্মগুলোর উৎপাদনশীলতা বৃহৎ ফার্মগুলো উৎপাদনশীলতার সমান হয়েছিল। এর ফলে,

সবুজ বিপ্লব ধনী এবং দরিদ্র উভয় শ্রেণির কৃষকদেরই উপকৃত করেছিল। সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গবেষণা কেন্দ্রগুলোর উপযুক্ত পরিষেবার মাধ্যমে ফসলে কীটপতঙ্গোর আক্রমণের প্রকোপ প্রশমিত হয়েছিল। যার ফলে ক্ষুদ্রচাষিদের আশঙ্কাও হ্রাস পেয়েছিল। তোমরা এটি মনে রাখবে যদি সরকার নতুন প্রযুক্তির সুফল ক্ষুদ্র চাষিদের দেওয়ার জন্য ব্যাপক পরিসরে পদক্ষেপ গ্রহণ না করতো, তবে সবুজ বিপ্লবের সুফল কেবলমাত্র ধনী চাষীরাই অর্জন করতে পারত।

ভর্তুকির উপর বিতর্ক : বর্তমানে, কৃষিক্ষেত্রে প্রদেয় ভর্তুকির অর্থনৈতিক যুক্তি গ্রাহ্যতা, একটি বড়ো বিতর্কের বিষয়। এটি সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, সমস্ত কৃষক, বিশেষত ক্ষুদ্র কৃষকদের নতুন HYV প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতে ভর্তুকি প্রদান করা প্রয়োজন ছিল। যেকোন নতুন প্রযুক্তিই কৃষকদের ঝুঁকিপূর্ণ মনে হতে পারে। তাই কৃষকদের নতুন প্রযুক্তির পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য উৎসাহ প্রদান করতে ভর্তুকি প্রদান করা প্রয়োজন। কিছু অর্থনীতিবিদ মনে করেন, একবার কোনো প্রযুক্তি লাভজনক হয়ে উঠলে এবং তা ব্যাপকভাবে গৃহীত হলে পর্যায়ক্রমিকভাবে ভর্তুকি শেষ করে দেওয়া উচিত। কারণ তখন ভর্তুকির উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেছে। যদিও কৃষকদের সুফল প্রদানের জন্য ভর্তুকি প্রদান করা হয় কিন্তু সারের জন্য বেশি পরিমাণে ভর্তুকি প্রদান করলে সারের কারখানাগুলোও উপকৃত হয় এবং ভর্তুকি প্রদানের ফলে কৃষকরা, বিশেষত সমৃদ্ধ অঞ্চলের কৃষকরা অধিক উপকৃত হয়। সুতরাং এটা বলা হয় যে, সার সরবরাহের ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদানের কোন যুক্তি নেই যেহেতু এটা কাঙ্খিত ব্যক্তিবর্গকে উপকৃত করতে পারছে না। বরং সরকারি তহবিলের উপর বিশাল বোঝা সৃষ্টি করছে। **(বাক্স 2.6 দেখো)**

অন্যদিকে, কেউ কেউ এটা মনে করেন, সরকারের উচিত কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকি চালু রাখা কারণ ভারতে কৃষিকাজ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। বেশির ভাগ কৃষকরাই খুব দরিদ্র এবং ভর্তুকি ছাড়া তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম জোগাড় করা সম্ভব নয়। ভর্তুকির সুবিধা বন্ধ করে দিলে দরিদ্র এবং ধনী চাষীদের মধ্যে অসাম্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং তা সাম্যতার উদ্দেশ্যকে বিঘ্নিত করবে। এই সমস্ত বিশেষজ্ঞরা এই মত প্রকাশ করেন যে যদি ভর্তুকি প্রদানের কারণে সার কারখানা এবং বড় কৃষকরা অধিকভাবে লাভবান হয়ে থাকেন, তবে ভর্তুকি বন্ধ না করে সঠিক নীতি প্রণয়ন করে ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শুধুমাত্র কৃষকদের মধ্যে ভর্তুকির সুবিধা প্রদান করা দরকার।

এভাবে, 1960 এর দশকের শেষের দিকে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা যথেষ্টভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যার ফলস্বরূপ ভারত খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছিল। এই সফলতা খুবই গর্বের বিষয় ছিল। তবে এর একটি নেতিবাচক দিক ছিল এই যে, 1990 খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকেও দেশের প্রায় 65 শতাংশ জনগণ কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিল। অর্থনীতিবিদরা লক্ষ্য করেছেন যে, একটি দেশ ক্রমশ যত উন্নত হয়, ঐ দেশের GDP তে কৃষিক্ষেত্রের আনুপাতিক অবদান এবং কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার আনুপাতিক হার ক্রমশ কমতে থাকে। ভারতে, 1950 থেকে 1990 সালের মধ্যে আনুপাতিকভাবে GDP তে কৃষিক্ষেত্রের অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে নির্ভরশীল জনসংখ্যার পরিমাণ তেমন হ্রাস পায়নি (67.5 শতাংশ 1950 থেকে 64.9 শতাংশ 1990)। কৃষিক্ষেত্রে অনেক কম সংখ্যক মানুষকে কাজে লাগিয়েই এইরকম উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব ছিল। তবে কেন জনসংখ্যার এত বৃহৎ অংশ কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিল? এর উত্তর হল এই যে, শিল্প ও সেবা ক্ষেত্রে,

বাক্স ২.৬ : সংকেত হিসেবে মূল্য

তোমরা আগের শ্রেণিতে শিখেছ, কীভাবে বাজারে কোনো পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়। এটা বোঝা খুব জরুরি যে-কোন দ্রব্যের দামই হল তার প্রাপ্যতার সংকেত। যদি কোনো দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হয়, তবে তার দাম বৃদ্ধি পাবে এবং যারা এই দ্রব্য ব্যবহার করবে, তারা দামের উপর ভিত্তি করেই এর ব্যবহার সংক্রান্ত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারলে উপকৃত হবে। জলের সরবরাহ কমে যাওয়ায় যদি জলের দাম বৃদ্ধি পায় তবে মানুষ খুব যত্নসহকারে জল ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, তারা হয়তো জল সংরক্ষণের জন্য বাগানে জল দেওয়া বন্ধ করে দেবে। যখন পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধি পায়, আমরা অভিযোগ করি এবং এরজন্য সরকারকে দোষারোপ করি। কিন্তু পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি তার অধিক দুষ্প্রাপ্যতাকে ইঙ্গিত করে এবং দাম বৃদ্ধি মূলত এর অপেক্ষাকৃত কম প্রাপ্যতাকে নির্দেশিত করে যা মানুষকে কম পেট্রোল ব্যবহার করতে এবং বিকল্প জ্বালানির সন্ধানে উৎসাহিত করে।

কিছু অর্থনীতিবিদ মনে করেন, ভর্তুকি দেওয়ার ফলে মূল্য পণ্যের প্রকৃত যোগানকে নির্দেশ করতে পারে না। যখন ভর্তুকিতে বা বিনামূল্যে বিদ্যুৎ এবং জল সরবরাহ করা হয়, তখন দুষ্প্রাপ্যতার কথা না ভেবেই তাদের যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়। যদি বিনামূল্যে জল সরবরাহ করা হয় তবে কৃষকরা জল নিবিড় শস্যের ফলন করবে। এমনও হতে পারে যে ঐ সমস্ত অঞ্চলে জলের উৎস খুবই দুষ্প্রাপ্য এবং এইরকম ফসলের উৎপাদন ঐ সমস্ত দুষ্প্রাপ্য উৎসকে আরও নিঃস্ব করে দেবে। যদি জলের দুষ্প্রাপ্যতাকে প্রতিফলিত করার জন্য জলের দাম নির্ধারণ করা হয়, তবে কৃষকরা ঐ অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত শস্যই চাষ করবে। ভর্তুকিকৃত সার এবং কীটনাশকের যোগানের ফলে মানুষ এর অতিরিক্ত ব্যবহার করে যা পরিবেশের ক্ষতির কারণ হতে পারে। ভর্তুকি প্রদানের ফলে মানুষ সম্পদের অপব্যবহারে উৎসাহিত হয়। উৎসাহ প্রদানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভর্তুকি বিষয়টি চিন্তা করো এবং জিজ্ঞাসা করো, কৃষকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রদান করার বিষয়টি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যথার্থ কিনা।

কৃষিক্ষেত্রে কর্মরত মানুষদের গ্রহণ করেনি। অনেক অর্থনীতিবিদ এটাকে 1950 থেকে 1990 সালের মধ্যে গৃহীত আমাদের নীতি নির্দেশিকার চরম ব্যর্থতা বলে অভিহিত করেন।

2.4 শিল্প এবং বণিজ্য

অর্থনীতিবিদরা এটা লক্ষ করেছেন যে, দরিদ্র দেশগুলো তখনই উন্নত করতে পারে যখন তাদের সুদৃঢ় শিল্প ক্ষেত্র থাকে। কৃষিক্ষেত্রের কর্মসংস্থানের তুলনায় শিল্প ক্ষেত্রের কর্মসংস্থান অনেক বেশি স্থায়ী হয়। যা আধুনিকীকরণ এবং সার্বিক উন্নতির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। এই কারণেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোতে শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য প্রভূত গুরুত্বারোপ করা হয়। আগের অধ্যায়ে তোমরা নিশ্চয়ই পড়ে থাকবে যে স্বাধীনতার সময়ে ভারতের শিল্প বিবিধতা মূলত সীমাবদ্ধ ছিল সুতিবস্ত্র শিল্প এবং পাট শিল্পের মধ্যে। ঐ সময় দুটি সুব্যবস্থিত লৌহ এবং ইস্পাত কারখানা ছিল — একটি জামসেদপুরে এবং অন্যটি কোলকাতায়।

তবে, নিশ্চিতভাবে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি পেতে হলে, আমাদের শিল্পের বৈচিত্র্যকরণের সাথে এর ভিত্তিকেও বিস্তার করতে হত।

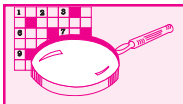

কাজগুলো কর

➢ একদল ছাত্রছাত্রী একটি কৃষিফার্মে ভ্রমণ করতে পারে। তারা ওখানে একটি নমুনা সমীক্ষা করতে পারে। যেখানে কৃষি পদ্ধতি, ব্যবহৃত বীজের ধরণ, সার, যন্ত্রপাতি, সেচের ব্যবস্থা, নির্বাহিত ব্যয়, বাজারজাত উদ্বৃত্ত এবং অর্জিত আয় সংক্রান্ত তথ্য থাকবে। কৃষক পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের কাছ থেকে যদি কৃষি ব্যবস্থা পরিবর্তনের তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তবে তা খুবই উপকারী হবে।

ক) ক্লাসে তোমাদের সংগৃহীত বিষয়গুলো আলোচনা করো।

খ) বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন বিষয়ে চার্ট তৈরি করতে পারে। যেমন — উৎপাদন ব্যয়ের পরিবর্তন, উৎপাদনশীলতা, বীজের ব্যবহার, সার, সেচের ব্যবস্থা, সময়কাল, বাজার উদ্বৃত্ত এবং পারিবারিক আয়।

➢ বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এবং (G7, G8, G10 দেশের সম্মেলন) সংক্রান্ত পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের অংশ সংগ্রহ করো। কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদান সম্পর্কে উন্নত রাষ্ট্র এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর মতামত সম্পর্কে আলোচনা করো।

➢ নিম্নোক্ত সারণি অবলম্বনে ভারতীয় ব্যবস্থায় জীবিকার কাঠামোর একটি পাই চিত্র তৈরি করো ঃ-

বিভিন্ন ক্ষেত্র	*1950–51*	*1990–91*	*2015–16*
কৃষিক্ষেত্র	72.1	66.8	47
শিল্পক্ষেত্র	10.7	12.7	22
সেবাক্ষেত্র	17.2	20.5	31

কৃষি ভর্তুকির পক্ষে এবং বিপক্ষের যুক্তিগুলো পর্যালোচনা করো। এই বিষয়ে তোমার অভিমত কি?

কোন কোন অর্থনীতিবিদ এই যুক্তি দেখান যে, অন্যান্য দেশের কৃষকদের, বিশেষত উন্নত দেশগুলোতে, উচ্চমাত্রায় ভর্তুকি প্রদান করা হয় এবং তাদের উৎসাহিত করা হয় তাদের উৎপাদনকে অন্য দেশে রপ্তানি করার জন্যে। তুমি কি মনে করো আমাদের কৃষকরা উন্নত দেশগুলোর কৃষকদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে সক্ষম?

ভারতে শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়নে সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্র : নীতি নির্দেশকদের সামনে বড় প্রশ্ন ছিল — শিল্প ক্ষেত্রের উন্নয়নে সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকা কি হওয়া উচিত? স্বাধীনতার সময়ে অর্থব্যবস্থার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় শিল্প স্থাপনের জন্য বিনিয়োগ করার মতো মূলধন ভারতীয় শিল্পপতিদের ছিল না। যদি শিল্পপতিদের তেমন মুলধন থাকত, তবেও বৃহৎ প্রকল্প চালু করার মতো তেমন বড় বাজার এখানে ছিল না। মূলত এসমস্ত কারণেই সরকারকে শিল্পক্ষেত্রের উন্নতির জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। এরসাথে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী, ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উন্নতি করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

যেখানে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত নীতি নির্দেশিকতাই অর্থ ব্যবস্থা পরিচালনার সর্বোচ্চ আধার ছিল। যার অর্থ ছিল যে, অর্থ ব্যবস্থার অত্যাবশ্যক শিল্পক্ষেত্রগুলো সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। বেসরকারি ক্ষেত্রের শিল্পনীতিগুলো সরকারি ক্ষেত্রের পরিপূরক হবে, তবে শিল্প বিকাশে সরকারি ক্ষেত্রই মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির সিদ্ধান্তসমূহ (IPR 1956) :

রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ভারী এবং অত্যাবশ্যকীয় শিল্পক্ষেত্রের লক্ষ্যকে ভিত্তি করেই 1956 সালের শিল্পনীতির সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছিল. এই সিদ্ধান্তটিই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিত্তি প্রস্তর রচনা করেছিলো। এই পরিকল্পনাতে ভারতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই নীতি বা সিদ্ধান্তে ভারতের শিল্পক্ষেত্রকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমভাগে, ঐ সমস্ত শিল্পক্ষেত্রকে রাখা হয় যেগুলো সম্পূর্ণভাবে সরকারি মালিকানায় থাকবে। দ্বিতীয় ভাগে, ঐ সমস্ত শিল্পকে রাখা হয়েছিল, যেখানে সরকারি ক্ষেত্রের সাথে বেসরকারি ক্ষেত্রও পরিপূরকভাবে কাজ করতে পারে। তবে নতুন শিল্প ইউনিট শুরু করার দায়িত্ব একমাত্র সরকারের উপর থাকবে। বাদবাকি শিল্পক্ষেত্রগুলো তৃতীয় ভাগে থাকবে, যেখানে বেসরকারি ক্ষেত্র স্বাভাবিকভাবে কর্মকান্ড করতে পারবে।

যদিও বেসরকারি ক্ষেত্রের পরিচালনায় শিল্পের একটি ভাগকে রাখা হয়েছিল। তবে এই ক্ষেত্রটিও সরকার নিয়ন্ত্রিত লাইসেন্স পদ্ধতির অধীনে ছিল। সরকরের কাছ থেকে লাইসেন্স না নিয়ে কোনো নতুন শিল্প বা কারখানা এক্ষেত্রে কাজ করার অনুমতি ছিল না। দেশের পিছিয়ে পরা অঞ্চলগুলোতে শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করার জন্য এই নীতিটি ব্যবহার করা হয়েছিল। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোতে শিল্প স্থাপন করার জন্য খুব সহজেই লাইসেন্স পাওয়া যেত। এরসাথে এই শিল্প এককগুলোকে কিছু বিশেষ ছাড় প্রদান করা হতো। যেমন— কর সংক্রান্ত সুবিধা এবং কম মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। এই নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিক সমতাকে উন্নত করা।

এমনকি বর্তমান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন স্তর বাড়ানোর জন্য বা উৎপাদনের বৈচিত্র্যকরণের জন্যও লাইসেন্সের প্রয়োজন ছিল (নতুন ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে)। অর্থ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় উৎপাদনের তুলনায় যাতে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ অধিক না হয়, তা নিশ্চিত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কেবলমাত্র তখনই লাইসেন্স প্রদান করা হত যখন সরকার সুনিশ্চিত হতো যে, অর্থ ব্যবস্থায় অধিক পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প : 1955 সালের গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কমিটি, যাকে 'কার্ভে কমিটিও' বলা হয়, গ্রামোন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র শিল্পকে ব্যবহার করার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে। একটি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংজ্ঞা মূলত কোনো শিল্প এককের সম্পদের উপর অনুমোদিত সর্বোচ্চ বিনিয়োগের ভিত্তিতে করা হয়। সময়ের সাথে সাথে এই ঊর্ধ্বসীমাও পরিবর্তিত হয়েছে। 1950 সালে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বলতে বুঝাতো যেখানে সর্বাধিক পাঁচ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ হয়েছে। বর্তমানে তা সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা বিনিয়োগের অনুমোদন পেয়েছে।

এটি মনে করা হয় যে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলো অধিক 'শ্রমনিবিড়' অর্থাৎ বৃহদাকার শিল্পের তুলনায় এই সমস্ত ক্ষেত্রে অধিক শ্রমিক ব্যবহার করা হয়। তাই ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে অধিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সমস্ত শিল্পগুলো বৃহৎ শিল্প সংস্থাগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা

করতে পারে না। তাই নিশ্চিতভাবে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের জন্য তাদেরকে বৃহৎ শিল্পের হাত থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এই সমস্ত শিল্প সংস্থাগুলোর উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে সংরক্ষণের শর্ত আরোপ করা হতো। তাছাড়া তাদের অনেক ধরনের ছাড় প্রদান করা হতো, যেমন স্বল্প আবগারি বা অন্তঃশুল্ক এবং স্বল্প সুদে ব্যাংকের ঋণ প্রদান করা।

2.5 বাণিজ্যনীতি : আমদানির বিকল্প

আমাদের গৃহীত শিল্পনীতির সাথে বাণিজ্যনীতি খুব নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ছিল। প্রথম সাতটি পরিকল্পনায়, বাণিজ্যের যেরকম বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গিয়েছে, তা থেকে একে অন্তর্মুখী বাণিজ্য কৌশল বলা যেতে পারে। প্রায়োগিকভাবে এই কৌশলকে 'আমদানির বিকল্প' বলা হয়। এই নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল, দেশীয় উৎপাদনের মাধ্যমে আমদানিকৃত দ্রব্যের পরিবর্ত তৈরি করা। যেমন - বিদেশে নির্মিত গাড়ি আমদানির পরিবর্তে ভারতে নিজস্বভাবে এই সমস্ত গাড়ি উৎপাদনের জন্য শিল্প স্থাপনকে উৎসাহিত করা হতো। এই নীতির মাধ্যমে সরকার দেশীয় শিল্পকে বিদেশি প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করেছিল। দুটি উপায়ে আমদানি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রদান কার হয়— বাণিজ্য শুল্ক এবং কোটা। বাণিজ্য শুল্ক হল আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর 'কর'। বাণিজ্য শুল্ক আরোপের ফলে আমদানিকৃত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় এবং ওইসব দ্রব্যের ব্যবহারে মানুষকে অনাগ্রহী করে তুলে। আবার 'কোটা'র দ্বারা আমদানিকৃত দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। বাণিজ্য শুল্ক এবং কোটার প্রয়োগের ফল এই যে, তা আমদানির পরিমাণকে সীমিত করে এবং এভাবে দেশীয় শিল্প কারখানাগুলোকে বিদেশী প্রতিযোগিতায় হাত থেকে রক্ষা করে।

সংরক্ষণের নীতিটি এই ধারনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো খুব উন্নত অর্থব্যবস্থার উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর সাথে প্রতিযোগিতা করার মতো অবস্থায় নেই। এটা মনে করা হয়েছে যে, যদি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংরক্ষণ প্রদান কার হয় তবে কালক্রমে তারাও প্রতিযোগিতার কৌশল শিখবে। আমাদের নীতি প্রণেতাদেরও আশঙ্কা ছিল যে, যদি আমদানির উপর বিধিনিষেধ আরোপ না করা হয়, তবে সম্ভবত বিলাসবহুল দ্রব্যের আমদানির জন্য বিদেশি মুদ্রার খরচ বেড়ে যাবে। অথচ 1940-এর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রপ্তানি বৃদ্ধির জন্যও তেমন কোনোও গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনা ছিল না।

শিল্প উন্নয়নের উপর বিভিন্ন নীতির প্রভাব : প্রকৃতপক্ষে, প্রথম সাতটি পরিকল্পনার সময়কালে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে প্রশংসাজনক সাফল্য এসেছে। এই সময়ে GDP-তে শিল্পক্ষেত্রের আনুপাতিক অবদান বৃদ্ধি পেয়েছিল যা 1950 সালে 11.8 শতাংশ থেকে 1990-91 সালে 24.5 শতাংশ হয়েছিল। GDP-তে শিল্পক্ষেত্রের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পাওয়া হল উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। এই সময়ে শিল্প ক্ষেত্রের বার্ষিক ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য বিষয়। এখন আর ভারতীয় শিল্পক্ষেত্র কেবলমাত্র সুতি বস্ত্রশিল্প এবং পাটশিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না। বাস্তবে, 1990 সালের মধ্যেই, বিশেষত সরকারি ক্ষেত্রের অবদানের কারণে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্র খুবই বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছিল। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসার এমন বহু মানুষকে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ দিয়েছিল যাদের বৃহৎ শিল্প স্থাপনের জন্য মূলধন ছিল না, বৈদেশিক প্রতিযোগিতা থেকে সুরক্ষা, ইলেকট্রনিক এবং অটোমোবাইল ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পথকে সুগম করেছিল অন্যথায় তা সম্ভব হত না।

ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থার বিকাশে সরকারি ক্ষেত্রের

কাজগুলো কর

➢ নিম্নোক্ত সারণির উপর ভিত্তি করে GDP তে বিভিন্ন ক্ষেত্রের অবদানের একটি পাই চিত্র গঠন করো এবং 1950 থেকে 1991 সালের মধ্যে উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোর অবদানের মধ্যে সৃষ্ট পার্থক্যের বিষয়ে আলোচনা করো।

ক্ষেত্রসমূহ	1950-51	1990-91
কৃষিক্ষেত্র	59.0	34.9
শিল্পক্ষেত্র	13.0	24.6
সেবাক্ষেত্র	28.0	40.5

➢ শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের দুটি দলে বিভক্ত করে, সরকার অধিগৃহীত সংস্থার উপকারিতা সম্পর্কে একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করো। একদল ছাত্রছাত্রী সরকার অধিগৃহীত সংস্থার পক্ষে বক্তব্য রাখবে এবং অন্য দলটি এর বিপক্ষে বক্তব্য রাখবে। (যত বেশি সম্ভব ছাত্রছাত্রীদের এখানে অংশগ্রহণ করান এবং তাদের উদাহরণ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করুন।)

উল্লেখযোগ্য অবদান সত্ত্বেও কিছু অর্থনীতিবিদ্ অনেক সরকারি উদ্যোগের কর্মদক্ষতার সমালোচনা করেছেন। প্রাথমিকভাবে, সরকারি ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা খুব অধিক ছিল যা এই অধ্যায়ের শুরুতে উদ্বৃত্ত করা হয়েছে। এখন, এটা বহুলাংশে স্বীকৃত যে, সরকারি উদ্যোগগুলো এমন কিছু পণ্য এবং সেবাকার্যের উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছে, যেগুলোর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই (প্রায়শই তাদের একচেটিয়াকরণের মাধ্যমে)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, টেলিযোগাযোগ সেবার সংস্থান। বেসরকারি ক্ষেত্রে এই সেবা প্রদান করতে পারে, এটা বোঝার পরেও এই শিল্প ক্ষেত্রটি এখনও সরকারি ক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতির কারণে, 90-এর দশকের শেষের দিকেও একটি টেলিফোন সংযোগ পাওয়ার জন্য একজন মানুষকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো। অন্য একটি উদাহরণ হল 'মডার্ন ব্রেড'-এর প্রতিষ্ঠা। যা ছিল একটি পাউরুটি উৎপাদন সংস্থা এমনটা মনে হয় যেন বেসরকারি ক্ষেত্র পাউরুটি উৎপাদন করতে পারে না। 2001 সালে এই সংস্থাটি বেসরকারি ক্ষেত্রের কাছে বিক্রি করা হলো। প্রকৃত বিষয় হল যে, ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থায় চার দশকের পরিকল্পিত উন্নয়নের পরেও কিছু কিছু বিষয়ে পার্থক্য করা হয়নি। যেমন — (ক) সরকারি ক্ষেত্র স্বতন্ত্রভাবে কি করতে পারে, (খ) বেসরকারি ক্ষেত্রও

কী করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এখনও পর্যন্ত কেবলমাত্র সরকারি ক্ষেত্রই জাতীয় সুরক্ষা প্রদান করেছে। যদিও বেসরকারি ক্ষেত্র খুব ভালোভাবেই হোটেল শিল্প পরিচালনা করতে পারে, তবুও সরকারি ক্ষেত্র নিজস্ব হোটেল পরিচালনা করছে।

এইসমস্ত বিষয়ের জন্যই কিছু বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, যে সমস্ত উৎপাদনক্ষেত্রে বেসরকারি ক্ষেত্র পরিচালনা চলতে পারে, সেখান থেকে সরকারকে সরে দাঁড়ানো উচিত এবং সরকার সেইসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবাক্ষেত্রে তার সম্পদের প্রয়োগ করতে পারে যা বেসরকারিক্ষেত্র করতে পারে না।

অনেক সরকারি ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানগুলো বিপুল পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু তারপরও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের সীমিত সম্পদ ক্রমাগত নিঃশোষিত হলেও সরকারি উদ্যোগ বন্ধ করা কঠিন। এর অর্থ এই নয় যে, সবসময় বেসরকারি ক্ষেত্র মুনাফায় চলছে (এমনকি বর্তমানের অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রকৃত পক্ষে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ছিলো যেগুলো লোকসানের ফলে বন্ধ হতে চলছিল। তখন কর্মচারীদের চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য এদের জাতীয়করণ করা হয়। তবে লোকসানে চলা কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কখনো লোকসানের মধ্যে কাজ চালিয়ে গিয়ে সম্পদের অপচয় করবে না।

কোন শিল্প শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্সটিকে অনেক বাণিজ্যিক গোষ্ঠী অপব্যবহার করেছিল। কোন বড় উদ্যোগপতি নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করার জন্য লাইসেন্স নিতো না। প্রকৃতপক্ষে তারা লাইসেন্স নিতো প্রতিযোগীরা যাতে নতুন উদ্যোগ শুরু করতে না পারে তা আটকানোর জন্য। অত্যধিক নিয়মনীতির বেড়াজাল থাকায় তাকে পারমিট লাইসেন্স রাজ বলা হতো। যা কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠনের কর্মদক্ষতার বিকাশের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। তাদের পণ্যগুলো কীভাবে উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা করার পরিবর্তে শিল্পপতিদের লাইসেন্স পাওয়ার জন্য বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে 'লবি' (Lobby) তৈরি করার চেষ্টায় অধিক সময় ব্যয় করত। বৈদেশিক প্রতিযোগিতা থেকে সংরক্ষণ প্রদানের বিষয়টিও সমালোচিত হচ্ছিল, কারণ এর প্রয়োগের ফলে লাভের তুলনায় অধিক ক্ষতি হচ্ছে তা প্রমাণিত হওয়ার পরও এটি চালিয়ে রাখা হচ্ছিল। আমদানিতে বিধিনিষেধ থাকার কারণে, ভারতীয় উৎপাদকরা যা উৎপাদন করত ভোক্তারা তা ক্রয় করতে বাধ্য হতো। উৎপাদকরা সচেতন ছিল যে তাদের কাছে একটি নিশ্চিত বাঁধাধরা (Captive) বাজার আছে। তাই তারা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগতমান বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হতো না। যখন তারা নিম্নমানের দ্রব্য বেশি দামে বিক্রি করতে পারে, তখন দ্রব্যের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য তারা চিন্তাভাবনা করবে কেন? আমদানিকৃত দ্রব্যের সাথে প্রতিযোগিতার ফলে আমাদের উৎপাদকেরা আরো বেশি দক্ষ হতে বাধ্য থাকবে।

কিছু অর্থনীতিবিদ এই মতবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, সরকারি ক্ষেত্র মুনাফা অর্জনের জন্য নয়, বরং দেশের কল্যাণের জন্য করা হয়। এইদিক থেকে বিচার করলে সরকারি ক্ষেত্রের মূল্যায়ণ তাদের অর্জিত মুনাফার ভিত্তিতে না করে জনকল্যাণে তার কতটুকু অবদান রয়েছে তার ভিত্তিতে করা উচিত। সংরক্ষণ সম্পর্কে কিছু অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য হল যে, বিদেশি প্রতিযোগিতা থেকে আমাদের উৎপাদকদের ততক্ষণ পর্যন্ত সংরক্ষণ প্রদান করা উচিত যতক্ষণ বিদেশি, সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলো তা করছে এই সমস্ত দ্বন্দের কারণেই অর্থনীতিবিদরা আমাদের নীতির পরিবর্তন চেয়েছেন। অন্যান্য সমস্যার সাথে এই বিষয়টিও, 1991 সালে সরকারকে নতুন আর্থিক নীতি প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

2.6 উপসংহার

প্রকৃতপক্ষে, প্রথম সাতটি পরিকল্পনাকালে, ভারতের অর্থ ব্যবস্থার উন্নতি ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে পরিস্থিতির তুলনায় আমাদের শিল্পক্ষেত্র অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। সবুজ বিপ্লবের কল্যাণে ভারত খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংভর হয়ে উঠেছে। ভূমি সংস্কারের ফলে ঘৃণ্য জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি ঘটেছে। তবে, বহু সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজের কর্মদক্ষতার সম্পর্কে অনেক অর্থনীতিবিদরা অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। সরকারের অতিরিক্ত নিয়মনীতির বিধিনিষেধ উদ্যোগিক বিকাশকে ব্যাহত করেছিল। স্বনির্ভরতা গড়ার নামে তাদের বিদেশি প্রতিযোগিতা থেকে সংরক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল। যা তাদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধিতে কোনরকম উৎসাহ প্রদান করেনি। আমাদের নীতিগুলো ছিল 'অন্তমুখী দিশায়' এবং তাই আমরা মজবুত রপ্তানি ক্ষেত্র গঠন করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। পরিবর্তিত বিশ্ব-অর্থব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আর্থিক নীতিগুলোকে পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল এবং তাই আমাদের অর্থ ব্যবস্থাকে আরো দক্ষ করার জন্য 1991 সালে 'নতুন আর্থিক নীতি' গৃহীত হয়। এটাই হল পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়বস্তু।

সংক্ষিপ্ত বৃত্তি

- স্বাধীনতার পরে, ভারত এমন একটি অর্থব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছিল যেখানে সামাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যগুলোর সম্মিলন ঘটবে। যার ফলশ্রুতিতে মিশ্র অর্থব্যবস্থার মডেলের স্বরূপ তৈরি হয়েছিল।
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমেই সমস্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গঠিত হয়েছিল।
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো হল — বিকাশ, আধুনিকীকরণ, স্বয়ংভরতা এবং সাম্যতা।
- কৃষিক্ষেত্রের প্রধান নীতি এবং উদ্যোগগুলো ছিল ভূমিসংস্কার এবং সবুজ বিপ্লব। এই সমস্ত উদ্যোগগুলো ভারতকে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে সহায়তা করেছিল।
- কৃষিক্ষেত্রে নির্ভরশীল জনগণের অনুপাত আশানুরূপভাবে হ্রাস পায়নি।
- শিল্পক্ষেত্রে গৃহীত নীতি-উদ্যোগের ফলে GDP-তে এর (শিল্পের) অবদান বৃদ্ধি পেয়েছিল।
- শিল্পক্ষেত্রের একটি প্রধান ত্রুটি ছিল সরকারি ক্ষেত্রের অদক্ষ কার্য পরিচালনা। কারণ এই ক্ষেত্রটি ক্রমশ লোকসানে চলতে শুরু করেছিল। যার কারণে দেশের সীমিত সম্পদগুলো নিঃশেষ হচ্ছিল।

অনুশীলনী

1. পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও।
2. ভারত কেন পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছিল?
3. পরিকল্পনার উদ্দেশ্য থাকা উচিত কেন?
4. উচ্চ ফলনশীল বীজ (HYV) কী?
5. বাজার উদ্বৃত্ত কী?
6. কৃষিক্ষেত্রে রূপায়িত ভূমি সংস্কার-এর প্রয়োজন এবং ধরনগুলো বর্ণনা করো।
7. সবুজ বিপ্লব কী? এটা কেন রূপায়ণ করা হয়েছিল এবং এটি কীভাবে কৃষকদের উপকৃত করেছে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।
8. পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হিসেবে 'সাম্যতার সাথে বিকাশ' এর বিষয়টি বর্ণনা করো।
9. নিয়োগ সৃষ্টির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হিসাবে আধুনিকীকরণ বিরোধ সৃষ্টি করে কিনা ব্যাখ্যা করো।
10. ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হিসেবে 'স্বনির্ভরতা' বিষয়টি অনুসরণ করোা কেন প্রয়োজনীয়?
11. অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রগত গঠন কী? GDP তে সেবাক্ষেত্রের অবদান সর্বাধিক হওয়া কি খুব প্রয়োজনীয়। মতামত দাও।
12. পরিকল্পনাকালে শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়নে সরকারি ক্ষেত্রকে অগ্রণী ভূমিকা প্রদান করা হয়েছিল কেন?
13. সবুজ বিপ্লবের ফলে সরকার যথেষ্ট পরিমান খাদ্যশস্য সংগ্রহের মাধ্যমে এর মজুত সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল যাতে তা খাদ্যের অভাবের সময়ে ব্যবহার করোা যায় বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করো।
14. যদিও ভর্তুকি কৃষকদের নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করে তবুও এর ফলে সরকারের উপর আর্থিক ক্ষেত্রে বিশাল বোঝার সৃষ্টি হয়। এই প্রসঙ্গো ভর্তুকির সুবিধাগুলো আলোচনা করো।
15. সবুজ বিপ্লবের বাস্তবায়ন সত্ত্বেও, 1990 সাল পর্যন্ত 65 শতাংশ জনগণ কৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল ছিল কেন?
16. শিল্পের জন্য সরকারি ক্ষেত্র খুব প্রয়োজনীয় হলেও অনেক সরকারি অধিনস্ত সংস্থা বিপুল লোকসানে চলছে এবং অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের অপচয় ঘটাচ্ছে। এই প্রসঙ্গো সরকারি ক্ষেত্রের উপকারিতাগুলো আলোচনা করো।

17. আমদানি পরিবর্তননীতি কিভাবে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করতে পারে ব্যাখ্যা করো।

18. 1955 সালের শিল্পনীতিতে (IPR 1956), কীভাবে বেসরকারি ক্ষেত্রের পরিচালনের কথা বলা হয়েছে এবং কেন?

19. নীচের স্তম্ভগুলো মেলাও

1. প্রধানমন্ত্রী	ক) যে সমস্ত বীজ অধিক অনুপাতে উৎপাদন প্রদান করে
2. স্থূল দেশীয় উৎপাদন	খ) যে পরিমাণ দ্রব্য আমদানি করা যেতে পারে
3. কৌটা	গ) পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারপার্সন
4. ভূমি সংস্কার	ঘ) কোনো বছরে অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদিত সমস্ত চূড়ান্ত দ্রব্য এবং সেবার আর্থিক মূল্য।
5. HYV বীজ	ঙ) কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত সংস্কার
6. ভর্তুকি	চ) উৎপাদন কর্মসূচি পরিচালনার জন্য সরকার দ্বারা প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা

REFERENCES

BHAGWATI, J. 1993. *India in Transition: Freeing the Economy.* Oxford University Press, Delhi.

DANDEKAR, V.M. 2004. Forty Years After Independence, in Bimal Jalan, (Ed.). *The Indian Economy: Problems and Prospects.* Penguin, Delhi.

JOSHI, VIJAY. and I.M.D. LITTLE. 1996. *India's Economic Reforms 1991-2001.* Oxford University Press, Delhi.

MOHAN, RAKESH. 2004. Industrial Policy and Controls, in Bimal Jalan (Ed.). *The Indian Economy: Problems and Prospects.* Penguin, Delhi.

RAO, C.H. HANUMANTHA. 2004. Agriculture: Policy and Performance, in Bimal Jalan, (Ed.). *The Indian Economy: Problems and Prospects.* Penguin, Delhi.

একক ২

অর্থনৈতিক সংস্কার 1991 থেকে

চল্লিশ বছরের পরিকল্পিত উন্নয়নের মধ্য দিয়ে ভারত শক্তিশালী শিল্পভিত্তি গড়তে সমর্থ হয়েছিল এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বাবলম্বিতা অর্জন করে। তা সত্ত্বেও জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ জীবিকা অর্জনের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল থেকে যায়। 1991 সালে লেনদেন উদ্বৃত্তজনিত সংকটের ফলশ্রুতিতে দেশে অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করা হয়। এই বিভাগে সংস্কার প্রক্রিয়া এবং ভারতের ক্ষেত্রে এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করব।

3

উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বিশ্বায়ন : একটি মূল্যায়ন

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে —

- 1991 সালে ভারতে প্রবর্তিত সংস্কার কর্মসূচির প্রেক্ষাপট
- সংস্কার কর্মসূচি কার্যকর করার পদ্ধতি
- বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া এবং ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রভাব

বর্তমান পৃথিবীতে এই বিষয়ে সর্বসম্মতি রয়েছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নই সব নয় এবং জিডিপি সমাজের প্রগতির মাপক নয়।

— কে আর নারায়ণন

3.1 ভূমিকা

পূর্বতন অধ্যায়ে আমরা পাঠ করেছি যে, স্বাধীনতার পর থেকে ভারত মিশ্র অর্থনীতির কাঠামো অনুসরণ করছে। ওই কাঠামোয় পুঁজিবাদী অর্থনীতির ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সুফলগুলোকে সমন্বিত করা সম্ভবপর হয়েছিল। কিছু বিদ্বানের মতে, এই মিশ্র অর্থনীতির সুবাদে বহু ধরনের বিধি-নিয়ম স্থাপিত হয় এবং যদিও ওই সকল বিধি ও নিয়মগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা কিন্তু কার্যত এর ফলে বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যহত হচ্ছিল। আরেক অংশের বিদ্বানদের বক্তব্য হল, ভারত প্রায় বন্ধ্যাবস্থা থেকে উন্নয়নের পথে যাত্রা শুরু করে সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদনকারী বহুমুখী শিল্পক্ষেত্রর উদ্ভব ও কৃষি উৎপাদনের ধারাবাহিক প্রসারণ যার ফলে খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত হয়। অর্থনীতির এই ক্ষেত্রগুলোতে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল ভারত।

1991 সালে বিদেশি ঋণের ক্ষেত্রে ভারত অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয় কেন না সরকার বিদেশ থেকে নেওয়া ঋণ মেটাতে পারছিল না। পেট্রোল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী আমদানির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয় — এমনভাবে হ্রাস পায় যে এক পক্ষ চলার মতো বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয় ছিল না। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ঊর্ধ্বমুখী দাম সংকটকে জটিল করে তুলে। সব কিছুর পরিণতিতে সরকার নতুন ধরনের নীতিমালা প্রবর্তন করে এবং নয়া নীতিমালা আমাদের উন্নয়ন কর্মসূচির গতিমুখে পরিবর্তন আনে। এই অধ্যায়ে আমরা সংকটের প্রেক্ষাপট এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ এবং অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবস্থাসমূহের প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব।

3.2 পটভূমি

অর্থনৈতিক সংকটের উৎসে ছিল 1980-র দশকে ভারতীয় অর্থনীতির অদক্ষ ব্যবস্থাপনা। এটা আমাদের জানা রয়েছে যে বিভিন্ন ধরনের নীতি কার্যকর করার জন্য এবং সাধারণ প্রশাসন পরিচালনার জন্য সরকারকে কর আরোপ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র পরিচালনাসহ নানাবিধ ক্ষেত্র থেকে সম্পদ আরোহণ করতে হয়। যখন আয়ের চাইতে ব্যয় বেশি হয় তখন সরকার খরচ জোগানোর জন্য ব্যাংক থেকে, দেশের মানুষ থেকে এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সংগ্রহ করে। যখন আমরা পেট্রোল জাতীয় সামগ্রী আমদানি করি তখন আমরা রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত ডলার দিয়ে পেট্রোলের দাম মেটাই। উন্নয়নের কর্মসূচি প্রয়োজনে রাজস্বের অতি নিম্ন অবস্থা সত্ত্বেও বেকারি দারিদ্রতা ও জনবিস্ফোরণ -এর মতো চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য সরকারকে রাজস্বের অতিরিক্ত খরচ করতে হয়। উন্নয়নের কর্মসূচির জন্য সরকারের ধারাবাহিক ব্যয়ের ফলে অতিরিক্ত রাজস্ব সৃষ্টি হয় না।

সরকার অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ যেমন কর থেকে প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারে না। যখন সরকারকে তার আয়ের একটা বিরাট অংশ সামাজিক ক্ষেত্র ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আশু ফল লাভের সম্ভাবনা ছাড়াই ব্যয় করতে হয় তখন বাকি রাজস্ব অত্যন্ত দক্ষভাবে ব্যবহার করতে হয়। ক্রমবর্ধমান ব্যয় মেটানোর জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র থেকে আয়ও যথেষ্ট ছিল না। অনেক সময় বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ঋণ করে নেওয়া বিদেশি মুদ্রা ভোগব্যয় মেটানোর জন্য ব্যবহৃত হত। লাগামছাড়া খরচ নিয়ন্ত্রণে কোনো প্রচেষ্টা ছিল না। একইভাবে ক্রমবর্ধমান আমদানি খরচ মেটানোর জন্য রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়নি।

আশির দশকের শেষ দিকে সরকারি ব্যয় রাজস্ব অতিরিক্ত এতটা হয়ে যায় যে ঋণ করে খরচ মেটানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম অসম্ভব বেড়ে যায়। আমদানি উচ্চহারে বৃদ্ধি পায় এবং আমদানির সাথে রপ্তানির সামঞ্জস্য থাকে না। ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় এতটাই কমে যায় যে দুই সপ্তাহের জন্য আমদানি খরচ মেটানোও কঠিন হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক ঋণদাতাদের সুদ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় ছিল না এবং একই সাথে কোনো দেশ অথবা বিদেশি ঋণ দাতা সংস্থা ভারতকে ঋণ দিতে প্রস্তুত ছিল না। ভারত আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক যাকে বিশ্বব্যাংক বলে সাধারণভাবে অভিহিত করা হয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার বা আই এম এফের কাছে ঋণের জন্য দ্বারস্থ হয় এবং সংকট মোকাবেলার জন্য সাত বিলিয়ন ডলার ঋণ পায়। ওই ঋণ গ্রহণের জন্য ওইসব আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ভারতের কাছে প্রত্যাশা রাখে বেসরকারি ক্ষেত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে অনেক ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা লঘু করে এবং ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে বাণিজ্য বিধিনিষেধ সরিয়ে অর্থনীতিকে উদার ও মুক্ত করা। ভারত বিশ্বব্যাংক ও আই এম এফের শর্ত মেনে নেয় এবং নয়া অর্থনৈতিক নীতি বা এন ই পি ঘোষণা করে। এন ই পি বহুধা বিস্তৃত অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচি। এন ই পি-এর মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক আবহাওয়ার সৃষ্টি করা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ দূর করা। এই ধরনের নীতিগুলোকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। স্থিতিশীলতা আনয়নকারী ব্যবস্থা এবং কাঠামোগত সংস্কার ব্যবস্থা। স্থিতিশীলতা আনয়নকারী ব্যবস্থাগুলো স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা যা মূলত লেনদেন উদ্বৃত্ত জনিত দুর্বলতা দূর করা এবং মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। সহজ কথায় এর অর্থ দাঁড়ায় পর্যাপ্ত বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয় রক্ষা করা এবং ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে আনা। অন্যদিকে কাঠামোগত সংস্কার ব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া যার মূল লক্ষ্য অর্থনীতিতে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনীতিকে প্রতিযোগিতা সক্ষম করে তোলা ভারতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনমনীয়তাকে দূর করে। সরকার বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি প্রবর্তন করে এবং এই কর্মসূচিগুলো মূলত তিনটিভাগে পড়ে উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়ন।

3.3 উদারীকরণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সৃষ্ট আইন ও বিধিনিয়মগুলো বৃদ্ধি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে একসময় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। উদারীকরণের প্রবর্তন করা হয় এই নিয়ত্রণগুলোকে দূর করার জন্য এবং অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র মুক্ত করার জন্য। যদিও 1980র দশকে কিছু উদারীকরণ ব্যবস্থা

যেমন শিল্প লাইসেন্স, আমদানি-রপ্তানি, প্রযুক্তি উন্নতিকরণ, আর্থিক নীতি, বিদেশি বিনিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নেয়া হয়েছিল কিন্তু 1991এ প্রবর্তিত উদারীকরণ ব্যবস্থাগুলো অনেক বেশি সর্বাত্মক ছিল। আমরা এখন অধ্যায়ন করব কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেমন শিল্পক্ষেত্র, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, করসংস্কার, বিদেশি মুদ্রা বাজার, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রগুলো যেগুলো 1991 ও পরবর্তী সময়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল।

শিল্পক্ষেত্রের বিনিয়ন্ত্রণ :

ভারতীয় অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ বিভিন্নভাবে কার্যকর করা হয়েছিল যেমন i) শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থার যার অধীনে সরকারি আমলাদের কাছ থেকে প্রত্যেক উদ্যাগপতিকে উদ্যোগ স্থাপনের জন্য, উদ্যোগ বন্ধ করার জন্য অথবা কী পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করা হবে তার জন্য অনুমতি নিতে হত। ii) অনেক শিল্পেই বেসরকারি ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ছিল না। iii) কিছু পণ্য শুধুমাত্র ক্ষুদ্র শিল্পেই উৎপাদন করা যেত। iv) মূল্য নির্ধারণ এবং বাছাই করা শিল্প সামগ্রী বিতরণের উপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

1991 ও পরবর্তী সময়ে প্রবর্তিত সংস্কার কর্মসূচি এইসব নিয়ন্ত্রণ সমূহের অনেকটা দূর করে। অ্যালকোহল, সিগারেট, বিপজ্জনক রাসায়নিক, শিল্পজাত বিস্ফোরক, বিদ্যুৎ সরঞ্জাম, মহাকাশ ও ওষুধ এগুলো ছাড়া বাদবাকি পণ্যসামগ্রীর জন্য শিল্প লাইসেন্সিং তুলে দেওয়া হল। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের জন্য যেসব শিল্পসমূহকে সংরক্ষিত রাখা হল সেগুলো হল প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের একটি অংশ, পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও রেল পরিবহণ। ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রদ্বারা উৎপাদিত বহু সামগ্রী অসংরক্ষিত করা হল। অনেক শিল্পে দাম নির্ধারণ বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল।

আর্থিক ক্ষেত্রে সংস্কার :

আর্থিক ক্ষেত্রে সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক, স্টক একচেঞ্জ ও বিদেশি মুদ্রা বিনিময় বাজারে সংস্কার। ভারতে আর্থিক ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তোমাদের জানা থাকার কথা যে, ভারতের সমস্ত ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো রিজার্ভ ব্যাংকের বিভিন্ন বিধি ও নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যাংক কতটা অর্থ রাখবে, সুদের হার কীভাবে নির্ধারণ করবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণপ্রদান কীভাবে ব্যাংক করবে ইত্যাদি রিজার্ভ ব্যাংক নির্ধারণ করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সংস্কার কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য হল রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকা নিয়ন্ত্রক থেকে সহায়তাকারীতে পরিণত করা। এর অর্থ হল রিজার্ভ ব্যাংকের সাথে পরামর্শ ছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে অনেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ প্রদান করা। সংস্কার নীতির ফলে ভারতীয় এবং বিদেশীরা প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক স্থাপন করতে পারবে। ব্যাংকে বৈদেশিক বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে 50 শতাংশ করা হয়। যে সকল ব্যাংক কয়েকটি নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করবে তারা ইচ্ছা করলে আর বি আই-এর অনুমোদন ব্যতিরকেই নতুন শাখা খোলার স্বাধীনতা পাবে। প্রয়োজনে এই ব্যাংকগুলোর মধ্যে বিরাজমান শাখা-অন্তজালকে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিস্তার করতে পারবে। যদিও ব্যাংকগুলোকে দেশ ও বিদেশ থেকে সম্পদ সৃজনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তথাপি পরিচালনগত কিছু বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাংকের তদারকি বজায় থাকবে। বৈদেশিক প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের (FII) যেমন, মার্চেন্ট ব্যাংকারস, মিউচুয়াল ফান্ডস এবং পেনশন ফান্ডসকে এখন ভারতের আর্থিক বাজারগুলোতে বিনিয়োগরে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

কর ব্যবস্থায় সংস্কার :

কর ব্যবস্থার সংস্কারের সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ হল সরকারের কর কাঠামোর সংস্কার এবং সরকারের ব্যয়নীতির সংস্কার, যাদেরকে সম্মিলিতভাবে ফিসক্যাল পলিসি বা রাজকোষনীতি বলা হয়। কর দুই ধরনের, যথা প্রত্যক্ষ কর এবং পরোক্ষ কর। ব্যক্তিগত আয় এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মুনাফার উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপ করা হয়। 1991 সালের পর থেকে ব্যক্তিগত আয় করের হার ধারাবাহিকভাবে কমানো হয়েছে। আয় করের উচ্চহারের জন্য কর ফাঁকির পরিমাপ বাড়ছিল বলেই আয়করের হার কমানো হয়েছে।

এটা এখন ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে, আয়করের মাঝারি হার সঞ্চয়ে উৎসাহ যোগায় এবং স্বতঃ প্রণোদিতভাবে আয় প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করে। পূর্বে কর্পোরেট করের (কোম্পানির মুনাফার উপর আরোপিত কর) হারও খুব অধিক ছিল। এই হারও ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হচ্ছে। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রও সংস্কারের আওতায় আনা হয়েছে। পণ্য ও দ্রব্যের সাধারণ জাতীয় বাজার গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকে প্রোৎসাহিত করার লক্ষ্যে পণ্যের উপর কর আরোপ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সংস্কারের আর একটা অভিমুখ হল কর ব্যবস্থার সরলীকরণ। কর দাতাদের সুবিধার্থে অনেক নিয়মনীতি সরল করা হয়েছে এবং কর হারও কমানো হয়েছে। ইদানীংকালে সংসদ একটা আইন পাশ করেছে। আইনটি হল Goods and Services Tax Act. 2016 (পণ্য দ্রব্য ও সেবা কর আইন 2016)। 2017 সালের জুলাই মাসে এই আইন কার্যকরী হয়। এই আইন ভারতে পরোক্ষ কর ব্যবস্থাকে সরলীকৃত করে এবং সারা দেশে এই কর হার চালু করে। এর ফলে এই প্রত্যাশা করা যায় যে, কর সংস্কারের এই কর্মসূচি কর ফাঁকি রোধ করে সরকারের কোষাগারে বাড়তি রাজস্ব জমা হতে সাহায্য করে এবং 'একজাতি, এক কর এবং এক বাজার' সৃষ্টি করবে।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে সংস্কার :

বৈদেশিক ক্ষেত্রের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করা হয়েছিল বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে। 1991 সালে উদ্ভূত লেনদেন উদ্বৃত্তের সমস্যার সমাধানের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্কে টাকার অবমূল্যায়ন করা হয়েছিল। এর প্রভাব দেশে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। এর সাথে সাথে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ের বাজার থেকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ গুটিয়ে নেওয়া হয়। তাই এমন বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার (উদাহরণ স্বরূপ ডলারের রূপীয় মুল্য) বাজারের চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে নির্ধারিত হয় যা সংস্কার পূর্ববর্তী সময়ে হত না।

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতির সংস্কার :

বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উদারীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল শিল্পের উৎপাদনের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাপূর্ণ মানসিকতা বৃদ্ধি করতে। এছাড়াও অর্থনীতিতে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও প্রযুক্তির অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করতে। এক্ষেত্রে উদারীকরণের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। সেটা হল স্থানীয় শিল্পগুলো যাতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির পথ অবলম্বন করে। দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষিত রাখতে ভারতে এতদিন ধরে আমদানির পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু ছিল। আমদানির উপর কঠিন বিধিনিষেধ আরোপ করতে আমদানি শুল্কের হারও খুব বেশি করা হয়েছিল। এই নীতিগুলো উৎপাদন ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং প্রতিযোগিতামূলক ভাবনা কমিয়ে শিল্পে বৃদ্ধির হারকে শ্লথ করেছিল। বাণিজ্যনীতি সংস্কারের লক্ষ্যগুলো ছিল

— ক) আমদানি এবং রপ্তানি ক্ষেত্রে পরিমাণগত বাধাগুলোর হাত টানা, খ) শুল্ক হার কমানো এবং গ) আমদানি ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং প্রথা অবলুপ্ত করা।

আমদানি ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান কেবলমাত্র বিপদজনক এবং পরিবেশগত সংবেদনশীল শিল্পগুলো ছাড়া সব জায়গা থেকেই বিলোপ করা হয়েছিল। এপ্রিল, 2001 থেকে কৃষিজ উৎপাদন এবং উৎপাদনভোগ্য দ্রব্য চিরতরে অবলুপ্ত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় দ্রব্যকে প্রতিযোগী করে তুলতে রপ্তানি শুল্ক পরিহার করা হয়েছিল।

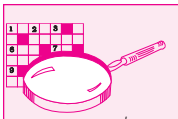

কাজগুলো করো

- রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক, বেসরকারি বিদেশি ব্যাংক, FII এবং মিউচুয়াল ফান্ড — এর একটি করে উদাহরণ দাও।
- তোমার এলাকায় একটি ব্যাংকে তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরিদর্শন করো। ব্যাংকের কার্যাবলিগুলো পর্যবেক্ষণ করো। এবিষয়ে তোমার সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করো এবং একটি চার্ট তৈরি করো।
- নিম্নের করগুলো পরোক্ষ কর না প্রত্যক্ষ কর বলো : বিক্রয় কর, অন্তঃশুল্ক, সম্পত্তি কর, মৃত্যু কর, ভ্যাট (VAT), আয় কর
- জানতে চেষ্টা করো তোমার পিতামাতা কর প্রদান করে কি? যদি হ্যাঁ হয়, তারা কীভাবে তা করে এবং কেন করে?
- তুমি কি জানো আগে দীর্ঘদিন ধরে অনেক দেশ রূপা ও সোনার তহবিল তৈরি করত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য? তুমি খোঁজ করো আমাদের দেশ 'বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়' কী রূপে জমা করে? খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন অর্থনৈতিক সমীক্ষা থেকে জানার চেষ্টা করো বর্তমানে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ভাণ্ডারে কত আছে? নিম্নেবর্ণিত দেশগুলোর মুদ্রার নাম এবং রূপির সাপেক্ষে বিনিময় হারগুলো বের করো —

দেশ	মুদ্রা	ভারতীয় টাকায় 1 ইউনিট বিদেশী মুদ্রার মূল্য
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র		
যুক্তরাজ্য		
জাপান		
চিন		
কোরিয়া		
সিঙ্গাপুর		
জার্মানি		

3.4 বেসরকারিকরণ

বেসরকারিকরণ বলতে বোঝায়, সরকারের মালিকানাধীন উদ্যোগগুলো বা সরকারি কোম্পানিগুলোর মালিকানা বা পরিচালনার দায়ভার থেকে সরকার হাত গুটিয়ে নেয় এবং বেসরকারি কোম্পানির হাতে তা তুলে দেয়। সরকারি কোম্পানির হাতে তা তুলে দেয়। সরকারি সংস্থাগুলোর বেসরকারিকরণ দুইভাগে করা হয় i) সরকারি ক্ষেত্রের কোম্পানিগুলোর মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনা থেকে সরকারের সরে দাঁড়ানো বা ii) সরকারি ক্ষেত্রের কোম্পানিগুলোকে সরাসরি বিক্রি করে দেওয়া।

সরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগের বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ায় যখন পি এস ই-র শেয়ার বেসরকারি হাতে বিক্রি করে দেওয়া হয় তখন তাকে বিলগ্নিকরণ বা বি-বিনিয়োগ বলা হয়। সরকারের মতে, বি-বিনিয়োগ আর্থিক শৃঙ্খলাকে আঁটোসাটো করবে এবং আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াকে বেগবান করবে। এটা আশা করা হয়েছিল যে, বেসরকারি লগ্নি এবং পরিচালনাগত দক্ষতার সমন্বয়ে সরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলোর কর্মক্ষমতার উন্নতি করা সম্ভব হবে।

বাক্স 3.1 : নবরত্ন এবং সরকারি উদ্যোগের নীতিসমূহ

তুমি শৈশবকালে নিশ্চয়ই সম্রাট বিক্রমাদিত্যর রাজ দরবারের নবরত্নদের বিষয়ে পড়েছ, যারা কলা, সাহিত্য এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বিশ্বব্যাপী উদারীকরণের পরিবেশে সরকারি অধিকৃত সংস্থা (PSUs)গুলোর দক্ষতা বাড়াতে, পেশাদারি মনোভাব তৈরি করতে এবং তাদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াতে, সরকার কিছু PSE-কে চিহ্নিত করেছিল এবং তাদের মহারত্ন, নবরত্ন এবং মিনিরত্ন হিসাবে ঘোষণা করেছিল। কোম্পানিগুলোর দক্ষতা এবং মুনাফা বাড়াতে তাদের হাতে পরিচালনাগত এবং প্রক্রিয়াগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। লাভজনক উদ্যোগুলোকেও অধিক পরিচালন, আর্থিক এবং পরিচালনা সংক্রান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যাদের মিনিরত্ন বলা হত।

কেন্দ্রীয় সরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলোকে বিভিন্ন পদমর্যাদা অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ :

i) মহারত্ন : a) Indian Oil Corporation Limited (IOC), b) Steel Authority of India Limited (SAIL), ii) নবরত্ন : (a) Hindustan Aeronautics Limited , (b) Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL) ; iii) মিনিরত্ন : (a) Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL); (b) Airport Authority of India (AAI) এবং (c) Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited.

অনেক লাভজনক সরকার অধিকৃত সংস্থা (PSEs) স্থাপন প্রকৃতপক্ষে 1950 এবং 1960 এর দশকে হয়েছিল যখন সরকারি নীতির এক গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল আত্মনির্ভরশীলতা। এইগুলো স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল পরিকাঠামোর উন্নতি এবং প্রত্যক্ষ রোজগারের বৃদ্ধি ঘটানো, যাতে জনগণের কাছে উচ্চ গুণমানের সামগ্রী নামমাত্র দামে পৌঁছতে পারে। এইভাবে এই কোম্পানিগুলোকে সকল অংশীদারদের প্রতি দায়বদ্ধ করে তোলা হয়েছিল।

এই পদমর্যাদাগুলো কোম্পানিকে আরও ভালো কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছে। গবেষকদের মতে, সরকার ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলোকে আরও বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে তাদের বিশ্বমানের সংস্থা গড়ে তোলার পরিবর্তে সরকার বিলগ্নীকরণের মাধ্যমে আংশিকভাবে বেসরকারিকরণের পক্ষে হাঁটছে। বর্তমানে সরকার তাদের সরকারি ক্ষেত্রে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তারা যাতে আর্থিক বাজার থেকে নিজেদের সম্পদ বাড়িয়ে বিশ্ববাজারের অঙ্গনে আরও এগিয়ে যেতে পারে।

কাজগুলো করো

- কিছু কিছু গবেষক বিলগ্নিকরণকে সরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলোর কর্মদক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বেসরকারি করণের বিশ্বব্যাপী পদক্ষেপ নিতে বলছে। আবার কিছু গবেষক মনে করেন এটা হল কায়েমি স্বার্থে সরকারি সম্পত্তির নির্জলা বিক্রি মাত্র। তুমি কী মনে করো?
- খবরের কাগজ থেকে 10-15টি খবরের অংশ নিয়ে একটি পোস্টার তৈরি করো — যে খবরগুলো নবরত্ন কোম্পানিগুলোর সঙ্গে জড়িত এবং তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই সরকারি উদ্যোগগুলোর বিজ্ঞাপন এবং লগোগুলো সংগ্রহ করো। একটি নোটিশ বোর্ডে তাদের সেঁটে দাও এবং শ্রেণিকক্ষে এনিয়ে আলোচনা করো।
- তুমি কি মনে করো ক্ষতির মুখ দেখছে এমন সরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলোকেই শুধু বেসরকারিকরণ করা প্রয়োজন? কেন?
- রুগ্ন সরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলোর বাড়তি বরাদ্দ সরকারি বাজেট থেকে করা উচিত। তুমি কি এই উক্তিটিকে সমর্থন করো? আলোচনা করো।

সরকার তাও আশা করেছিল বেসরকারিকরণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণকে বাড়ানো যাবে।

সরকার চেষ্টা করেছিল পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং বা পি এস ইউগুলোকে পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়েছিল যাতে তাদের দক্ষতার উন্নতি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু পি এস ইউকে মহারত্ন, নবরত্ন-এর বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল। (বাক্স 3.1 দেখো)

3.5 বিশ্বায়ন

সাধারণত বিশ্বায়ন বলতে বোঝায় বিশ্ব অর্থনীতির সাথে দেশের অর্থনীতির সংযুক্তিকরণ। তবে বিশ্বায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া। আসলে বিশ্বায়ন হল একাধিক নীতির প্রয়োগজনিত ফলাফল। বৃহত্তর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সংযুক্তির পথে পৃথিবীকে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে গৃহীত একগুচ্ছ কর্মসূচির ফলাফল হচ্ছে বিশ্বায়ন। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রমকারী অন্তর্জাল তৎপরতা সৃষ্টি বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বায়ন এমনভাবে সংযুক্তিকরণ ঘটায় যার ফলে বিশ্বের বহুমাইল দূরের ঘটনাবলি দ্বারা ভারতে কী ঘটছে তা প্রভাবিত হয়। বিশ্বায়ন পৃথিবীকে এক জায়গায় নিয়ে আসছে। অন্যভাবে বলা যায় সীমাহীন পৃথিবী সৃষ্টি করছে।

আউট সোর্সিং :

আউটসোর্সিং বিশ্বায়নের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের একটি। আউটসোর্সিং এর ক্ষেত্রে একটি কোম্পানি নিয়মিতভাবে বাহ্যিক উৎসগুলো থেকে পরিসেবা গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাইরের দেশগুলো থেকে, কিন্তু আগে এই পরিষেবা দেশের অভ্যন্তরেই সম্পাদিত করা হতো (যেমন আইনি পরামর্শ, কম্পিউটার পরিষেবা, বিজ্ঞাপন, সুরক্ষা এই প্রতিটি উল্লেখিত বিভাগগুলো কোনো একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করতে পারতো দেশীয় পরিধির মধ্যে থেকেই)। সাম্প্রতিক সময়ে আউট সোর্সিং এর কর্মকাণ্ড অনেক বেশি তীব্রতর হয়েছে। কেন্যনা এটি যোগাযোগের বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তির একটি অন্যতম দ্রুততর মাধ্যম। পরিষেবাগুলির মধ্যে যেমন স্বর (voice) ভিত্তিক বাণিজ্যিক প্রক্রিয়া (BPO বা call centre হিসেবে বহুল পরিচিত), নথিভুক্তকরণ।

বাক্স 3.2 : বিশ্বব্যাপী পদচিহ্ন!

বিশ্বায়নের কারণে তোমার হয়তো মনে হতে পারে অনেকগুলো ভারতীয় কোম্পানি তাদের শাখাপ্রশাখা আরও অনেক দেশে বিস্তৃত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারত সরকারের অধিগৃহীত সহযোগী সংস্থা ONGC Videsh, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস নিগম (ONGC) - তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে 16টি দেশে প্রকল্পের মাধ্যমে নিয়োজিত রয়েছে। 1907 সালে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারি সংস্থা টাটা স্টিল, বিশ্বের শীর্ষ 10টি লৌহ-ইস্পাত কোম্পানিগুলোর মধ্যে অন্যতম যার কর্মকাণ্ড 26টি দেশে বিস্তৃত এবং 50টি দেশে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করে। এটি অন্যান্য দেশে প্রায় 50,000 ব্যক্তির কর্মসংস্থান করে। ভারতে শীর্ষ পাঁচটি আই টি কোম্পানিগুলির মধ্যে HCL টেকনোলজিদের 31টি দেশে অফিস রয়েছে এবং বিদেশে প্রায় 15000 জন কর্মী রয়েছে। ডা. রেড্ডির ল্যাবরেটরিগুলো শুরুতে বড়ো কোম্পানিগুলোর কাছে ঔষধ প্রস্তুতিকরণের পণ্য সামগ্রী সরবরাহকারী একটি কোম্পানি ছিল, আজ এর বিশ্বব্যাপী উৎপাদন কেন্দ্র ও গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে।

উৎস : *www.rediff.com থেকে 14.10.2014 তারিখে নেওয়া।*

হিসাব রক্ষণ, ব্যাংকিং, পরিষেবা, সংগীত রেকর্ডিং, ফিল্ম এডিটিং, বই প্রতিলিপিকরণ, ক্লিনিক্যাল পরামর্শ বা এমনকি ভারতে শিক্ষাদানও উন্নত দেশের কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে আউটসোর্স হচ্ছে। ইন্টারনেটের সাথে আধুনিক টেলিকমিউনিকেশন সংযোগগুলোর সাহায্যে টেক্সট, ভয়েস এবং ভিজ্যুয়াল এই সমস্ত ডিজিটালকৃত ডেটাগুলো বিভিন্ন মহাদেশ এবং জাতীয় সীমানাগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। বেশিরভাগ বহুজাতিক সংস্থা এবং ছোটো ছোটো কোম্পানিগুলো ভারতে তাদের পরিসেবাগুলোর আউটসোর্সিং করে, যেখানে তারা স্বল্প ব্যয়ে দক্ষতা এবং নির্ভুলতার ন্যায়সঙ্গত স্তরে পৌঁছে উপকৃত হতে পারে। ভারতে নিম্নমজুরি হার এবং সুদক্ষ লোকবলের প্রাপ্যতা সংস্কার পরবর্তী সময়ে ভারতকে বিশ্বব্যাপী আউটসোর্সিং এর একটি গন্তব্যস্থল করেছে।

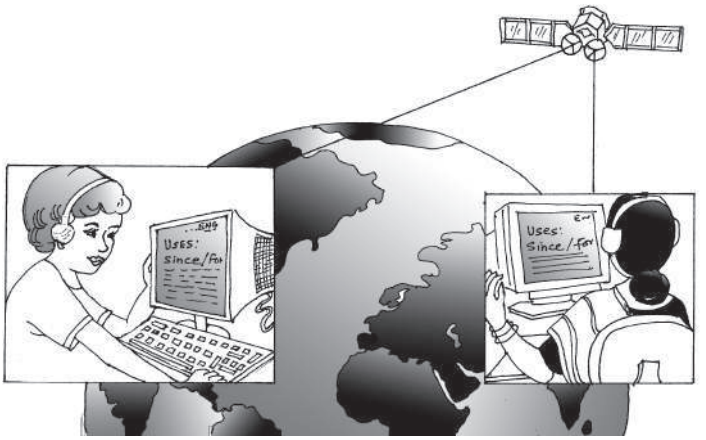

চিত্র 3.1 *: আউটসোর্সিং : বড়ো শহরে একটি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ*

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) :

WTOটি 1995 সালে শুল্ক ও বাণিজ্য নিয়ে সাধারণ চুক্তি (গ্যাট)-র উত্তরাধিকারী সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গ্যাট 1948 সালে 25টি দেশের সাথে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে সকল দেশকে সমান সুযোগ প্রদান করতে প্রতিষ্ঠিত হয়। WTO প্রত্যাশিতভাবে একটি নিয়ন্ত্রিত শাসন দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে কোনো দেশই ব্যবসা বাণিজ্যে নিজের ইচ্ছেমতো বিধিনিষেধ

কাজগুলো করো

➢ অনেক বিশষজ্ঞরা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, বিশ্বায়ন হল প্রকৃতপক্ষে একটি হুমকি কারণ এর ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাস পায়। আবার এর বিপরীতে অনেকে যুক্তি দিয়ে বলেন যে, এটা (বিশ্বায়ন) হল একটি উৎকৃষ্ট সুযোগ যা প্রতিযোগিতা এবং অধিগ্রহণের জন্য বাজারকে উন্মুক্ত করে। শ্রেণিকক্ষে এই বিষয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন করো।

➢ ভারতে (BPO) সেবা প্রদানে কর্মরত পাঁচটি কোম্পানির তালিকা তৈরি করো এবং তার পাশাপাশি তাদের বিক্রির পরিমাণও উল্লেখ করো।

➢ একটি দৈনিক সংবাদপত্র থেকে একটি সংবাদের বিষয় উদ্বৃত করা হয়েছে যা বর্তমানে ক্রমবর্ধমানভাবে ঘটে চলেছে নীচে এমন একটি অংশ তুলে ধরা হল — তোমরা পড়ো।

"একটি সকালে, 7টা বাজার কয়েক মিনিট আগে গ্রীষ্মা তার হেডসেট নিয়ে তার কম্পিউটারের সামনে বসে জোরালো ইংরেজিতে বলেছিল 'হ্যালো ড্যানিয়েলা'। কয়েক সেকেন্ড পরেই সে প্রত্যুত্তর পেল 'হ্যালো, গ্রীষ্মা'। তারা দুইজন খুব উৎফুল্লভাবে কথোপকথন করার পর গ্রীস্মা বলল যে 'আজকে আমরা সর্বনাম বিষয়ে আলোচনা করব'। এই কথোপকথনে আশ্চর্য হওয়ার তেমন কিছু ছিল না। তবে 22 বছরের গ্রীষ্মা ছিল কোচিতে এবং তার 13 বছরের শিক্ষার্থী ড্যানিয়েলা ক্যালিফোর্নিয়াতে অবস্থিত মালিবুতে তার ঘরে বসেছিল। ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত তাদের কম্পিউটারে একটি কৃত্রিম সাদাবোর্ড ব্যবহার করে এবং গ্রীস্মার সামনে ড্যানিয়েলার পাঠ্যবইয়ের একটি প্রতিলিপি রেখে তিনি কিশোরদের বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ক্রিয়ার জটিলতাগুলো বুঝতে সহায়তা করছিলেন। গ্রীস্মা মালয়ালম ভাষা বলতে বলতেই বড়ো হয়েছেন। এখন তিনি ড্যানিয়েলাকে ইংরেজি ব্যাকরণ, কম্প্রিহেনসন এবং লেখার কৌশল শেখাছিলেন।"

- ✓ এটা কীভাবে সম্ভব হয়েছে? ড্যানিয়েলা নিজের দেশে এই শিক্ষা পেতে পারছিল না কেন? কেন সে ভারত থেকে ইংরেজির শিক্ষাগ্রহণ করছিল, সেখানের মাতৃভাষা ইংরেজি নয়?
- ✓ ভারত বিশ্ববাজারের উদারীকরণ এবং একত্রীকরণের ফলে উপকৃত হচ্ছে। তুমি কি এই কথার সাথে একমত?

➢ কল সেন্টারের চাকরি কি স্থিতিশীল? কলসেন্টারে কর্মরত মানুষদের নিয়মিত আয় বজায় রাখতে হলে কী ধরনের দক্ষতা অর্জন করতে হবে?

➢ সস্তা শ্রমিক পাওয়ার কারণে যদি বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ভারতের মতো দেশের সেবাকার্য গ্রহণ করতে থাকে, তবে যে সমস্ত দেশে এই কোম্পানিগুলো অবস্থিত রয়েছে, সেখানকার জনগণের কী হবে? আলোচনা করো।

আরোপ করতে পারে না। উপরন্তু তার উদ্দেশ্য হল উৎপাদন এবং সেবাকার্যের বাণিজ্য বৃদ্ধি করা, বিশ্বের সমগ্র সম্পদের উৎকৃষ্ঠতম ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করা এবং পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষা করা। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার চুক্তিগুলোতে পণ্য বাণিজ্যের সাথে সাথে পরিষেবাগত ক্ষেত্রকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে শুল্ক এমনকি শুল্কবিহীন বাধাগুলোকে দূর করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক সুবিধা প্রদান করা যায় এবং সমস্ত সদস্য দেশগুলোর কাছে বৃহত্তর বাজারের সুযোগ প্রদান করা যায়।

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে ভারত, সুষ্ঠু বিশ্ববিধি গঠন, নীতি প্রণয়ন এবং সুরক্ষা প্রদান এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থরক্ষার সমর্থনে সর্বদা সামনের সারিতে রয়েছে। আমদানি ক্ষেত্রে পরিমাণগত বিধিনিষেধ অপসারণ এবং শুল্ক হারের হ্রাস ঘটিয়ে, ভারত বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় তৈরি বাণিজ্য উদারিকরণের প্রতি নিজের

সারণি **3.1**

জি ডি পি'র এবং প্রধান ক্ষেত্রসমূহের প্রবৃদ্ধি (%)

ক্ষেত্র	*1980-91*	*1992-2001*	*2002-07*	*2007-12*	*2012-13*	*2013-14*	*2014-15*
কৃষি	3.6	3.3	2.3	3.2	1.5	4.2	– 0.2
শিল্প	7.1	6.5	9.4	7.4	3.6	5	5.9
পরিসেবা	6.7	8.2	7.8	10	8.1	7.8	10.3
মোট	**5.6**	**6.4**	**7.8**	**8.2**	**5.6**	**6.6**	**7.2**

উৎস : *অর্থনৈতিক সমীক্ষা 2016-17, অর্থদপ্তর, ভারত সরকার।*

অঙ্গীকার রক্ষা করেছে।

কিছু বিশেষজ্ঞ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় ভারতের সদস্যপদের সুফল প্রাপ্তি নিয়ে প্রশ্ন করেছেন যেহেতু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অধিকাংশই সংগঠিত হয় উন্নত দেশগুলোর মধ্যে। তারা আরও বলেছে যে, যেখানে উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশে কৃষিতে ভর্তুকি দেওয়ায় অভিযোগ করছে। সেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলো মনে করে তারা উন্নত দেশের দ্বারা প্রতারিত হয়ে তাদের বাজার উন্মুক্ত করতে বাধ্য হচ্ছে কিন্তু তারা উন্নত দেশগুলোর বাজারে প্রবেশ করতে পারছে না।

চিত্র 3.2 : *তথ্য প্রযুক্তি শিল্প হল ভারতের রপ্তানি ক্ষেত্রের প্রধান অবদানকারী।*

3.6 সংস্কারকালীন সময়ে ভারতের অর্থনীতি : একটি পর্যালোচনা

সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে দেড় দশক সময় অতিক্রম করেছিল। চলো এক নজরে দেখে নিই সংস্কারকালীন সময়ে ভারতীয় অর্থনীতির কার্যকারিতা কেমন ছিল। অর্থশাস্ত্রে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) মাধ্যমে একটি অর্থনীতির বৃদ্ধি পরিমাপ করা হয়। (সারণি 3.1 দেখো)। 1991 সালের পরবর্তী দুই দশক সময় ধরে ভারতের GDP-র ক্রমাগত দ্রুত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। 1980-91 সাল থেকে 2007-12 সালে GDP এর বৃদ্ধি 5.6 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 8.2 শতাংশ হয়েছে। সংস্কারকালীন সময়ে কৃষির বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে, যেখানে শিল্প ক্ষেত্রের বৃদ্ধির হারের ক্ষেত্রে ওঠানামা পরিলক্ষিত হয় এবং পরিসেবা ক্ষেত্রের বৃদ্ধির হার বেড়ে যায়। এটা দেখায় যে এই ধরনের বৃদ্ধি প্রধানত পরিসেবা ক্ষেত্রের বৃদ্ধির জন্যই সম্ভব হয়েছিল। 1991 সালের পরবর্তী সময় থেকে 2012-15 সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রের বৃদ্ধির হারে অবনমন পরিলক্ষিত হয়। যেখানে 2013-14 সালে কৃষিক্ষেত্রের উচ্চ বৃদ্ধির হার নথিভুক্ত হয়, তবে পরবর্তী বছরেই কৃষিক্ষেত্রে নেতিবাচক বৃদ্ধির হার পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে পরিসেবা ক্ষেত্রে 2014-15 সালের সার্বিক GDP-র হার থেকেও সর্বোচ্চ বৃদ্ধির হার পরিলক্ষিত হয় এবং এই বৃদ্ধির হার ছিল 10.3 শতাংশ যা এখন পর্যন্ত সর্বাধিক। 2012-13 সাল পর্যন্ত শিল্পক্ষেত্রের বৃদ্ধির হারে দ্রুত হ্রাস পরিলক্ষিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে এই ক্ষেত্রের ক্রমাগত বৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে।

অর্থনীতির দ্বারা উন্মুক্ত হওয়ার ফলে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এবং বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় ভাণ্ডার দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। বিদেশি বিনিয়োগ যার মধ্যে প্রত্যক্ষ

বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) এবং প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠানগত বিনিয়োগ (FII) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা 1990-91 সালের $100 মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 2014-15 সালে $73.5 বিলিয়ন হয়েছে। আবার 1990-91 সাল থেকে 2014-15 সালে বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ভাণ্ডার প্রায় $6 বিলিয়ন থেকে বেড়ে প্রায় $321 বিলিয়ন দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের মধ্যে ভারত একটি বৃহত্তম বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় ভাণ্ডারের ধারক।

ভারতবর্ষকে একটি সফল রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে দেখা যেতে পারে কেননা ভারত সংস্কারকালীন সময়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাংশ, কারিগরি পণ্য, তথ্য প্রযুক্তি সফট্ওয়্যার এবং বস্ত্র রপ্তানি করত। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা হয়েছিল।

অন্যদিকে সংস্কার প্রক্রিয়াটি ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিল কারণ কর্মসংস্থান, কৃষি, শিল্প, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং ফিসক্যাল ব্যবস্থাপনার মতো ইত্যাদি বিশেষ ক্ষেত্রের মৌলিক সমস্যা যেগুলো আমাদের অর্থনীতি সম্মুখীন হচ্ছিল তাদের উপর আলোকপাত করা হয়নি।

বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান :

যদিও সংস্কারকালীন সময়ে GDP বৃদ্ধির হার বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন যে

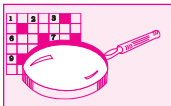

কাজগুলো করো

- পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে তোমার নিশ্চই কৃষিক্ষেত্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভর্তুকি সম্পর্কে পড়ে থাকবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃষিজ শিল্পকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সম্মুখীন করানোর জন্য তার উপর থেকে ভর্তুকি তুলে নেওয়া উচিত। তুমি কি উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে একমত? কীভাবে তা করা সম্ভব, শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো।
- নীচে দেওয়া উদ্ধৃতিটি পড়ো এবং শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো।

চিনাবাদাম অন্ধ্রপ্রদেশের একটি তৈলবীজ শস্য। মহাদেবন অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলার একজন চাষি, যিনি 1500 টাকা ব্যয় করেন চিনাবাদামের চাষ করার জন্য আধা একর জমিতে। তার এই ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কাঁচামাল অর্থাৎ (বীজ সার ইত্যাদি) শ্রম, বলদ এবং ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির খরচ। দেখা গেল, মহাদেবন মোটামুটি দুই কুইন্টাল চিনাবাদাম উৎপাদন করেন এবং তা 1000 টাকা মূল্যে বিক্রি করেন। এইভাবে মহাদেবন 1500 টাকা খরচ করে 2000 টাকা লাভ করেন। অনন্তপুর একটি খরাপ্রবণ অঞ্চল কিন্তু অর্থনৈতিক সংস্কার কালে এখানে সরকার কর্তৃক কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি। তার উপর এখন অনন্তপুরে চিনাবাদাম শস্য উৎপাদন সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে কেন না ফসল রোগাক্রান্ত হয়েছে। অন্যদিকে গবেষণা এবং তার পরিব্যাপ্তিমূলক কাজ অনেক নীচে নেমে গিয়েছিল সরকারের আর্থিক সাহায্যের অভাবে। মহাদেবন এবং তার বন্ধুরা বিষয়টিকে বার বার বিভাগীয় ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি অফিসারদের দৃষ্টিগোচর করার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। কিন্তু বীজ, সার ইত্যাদির উপর থেকে ভর্তুকি হ্রাস পাওয়ার ফলে মহাদেবনের চাষের ক্ষেত্রে ব্যয়ভার বেড়ে যায়। তার উপর আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর কোনরকম বাধা নিষেধ না থাকার ফলস্বরূপ, স্থানীয় বাজারগুলোতে সস্তায় আমদানিকৃত ভোজ্যতেলের চাহিদা মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। মহাদেবন বাজারে তার চিনাবাদাম বিক্রি করে কিন্তু তার উৎপাদন খরচ কোনোভাবেই উঠে আসছিল না।

মহাদেবনের মতো এধরনের কৃষকদের সমস্যা কীভাবে নিরূপণ করা যেতে পারে? তা শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো।

সংস্কারকালীন বৃদ্ধির হার আমাদের দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে কমসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেনি। তুমি পরবর্তী এককে কর্মসংস্থানের বিভিন্ন দিক এবং বৃদ্ধির মধ্যে একটি সংযোগ অধ্যয়ন করবে।

কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার :

সংস্কার কর্মসূচি কৃষিক্ষেত্রকে উপকৃত করতে সমর্থ হয়নি যার ফলে কৃষিতে বৃদ্ধি হারের গতি হ্রাস পেয়েছিল।

সংস্কারকালীন সময়ে কৃষিক্ষেত্রের পরিকাঠামোতে যেমন — জলসেচ, বিদ্যুৎ, সড়ক, বাজার সংযুক্তিকরণ ও গবেষণা এবং তার ব্যাপ্তিতে (যেটা সবুজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল) সরকারি বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছিল। অধিকন্তু, রাসায়নিক সারে ভর্তুকি তুলে নেওয়াতে উৎপাদনের ব্যয় বেড়ে গিয়েছিল, যা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে তীব্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। এই ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক নীতি পরিবর্তনের যেমন কৃষিজাত দ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক হ্রাস, ন্যূনতম সমর্থনমূল্যের প্রত্যাহার এবং কৃষিজাত দ্রব্যের উপর পরিমাণগত হস্তক্ষেপ তুলে নেওয়ার মতো অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল। ভারতীয় কৃষকদের যেহেতু বর্তমানে অধিকতর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাই এই সমস্ত নীতি পরিবর্তনগুলোই তাদের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলছে।

তাছাড়া, কৃষিক্ষেত্রে রপ্তানিকেন্দ্রিক নীতি কৌশল অবলম্বন করায় অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য উৎপাদন থেকে স্থানান্তরিত হয়ে উৎপাদকরা রপ্তানি বাজারের দিকে মনোনিবেশ করছে। যেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিবর্তে অর্থকরী শস্যের উৎপাদনে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এটাই খাদ্যশস্যের দামের উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

শিল্পক্ষেত্রে সংস্কার :

শিল্পের বৃদ্ধির হারেও ধীরগতি নথিভুক্ত করা হয়েছে। এর কারণ হল শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার হ্রাস। এই হ্রাসের বিভিন্ন কারণগুলো হল সস্তায় আমদানি, পরিকাঠামোতে অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ ইত্যাদি। বিশ্বায়নের যুগে উন্নয়নশীল দেশগুলো বাধ্য হয়ে তাদের অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করে উন্নত দেশগুলো থেকে দ্রব্য এবং মূলধন আনার প্রবাহকে বাড়িয়ে দেয় এবং আমদানিকৃত দ্রব্যের দ্বারা উন্নয়নশীল দেশের শিল্পগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সস্তা আমদানিকৃত দ্রব্য দেশীয় দ্রব্যের চাহিদার জায়গা দখল করে নেয়। দেশীয় নির্মাণকারীরা আমদানিকৃত দ্রব্যের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে থাকে। বিদ্যুতের যোগানসহ পরিকাঠামোগত সুবিধাগুলো পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাবে অপূর্ণ থেকে যায়। দ্রব্য এবং সেবার অবাধ চলাচলে বিশ্বায়ন শর্ত আরোপ করায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্থানীয় শিল্পগুলো এবং কর্মসংস্থানের সুযোগগুলো মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়।

তাছাড়া, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশ এখনো উন্নত দেশগুলোর বাজারে প্রবেশাধিকার পায়নি, কারণ উন্নত দেশগুলো উচ্চ শুল্কবিহীন বাধা উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, যদিও ভারত বস্ত্র ও বয়নশিল্পের রপ্তানির উপর সকল প্রকার কোটা সংক্রান্ত হস্তক্ষেপ তুলে নিয়েছিল, কিন্তু আমেরিকা তাদের কোটা সংক্রান্ত হস্তক্ষেপ ভারত এবং চিন থেকে আমদানি করার ক্ষেত্রে দূর করেনি।

বিলগ্নিকরণ :

সরকার প্রতিবছর সরকারি ক্ষেত্রে উদ্যোগগুলোর (PSE) বিলগ্নিকরণের একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। উদাহরণ স্বরূপ 1991-92 সালে বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে 2500 কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল

সরকার সমর্থ হয়েছিল লক্ষ্যমাত্রা থেকে 3040 কোটি টাকা বেশি সংগ্রহ করতে। 2014-15 সালে

লক্ষ্যমাত্রা ছিল প্রায় 56 হাজার কোটি টাকা পক্ষান্তরে অর্জিত হয়েছে 34 হাজার 500 কোটি টাকা। সমালোচকরা ইঙ্গিত করেন যে BSE র সম্পাদকে অবমূল্যায়ন করে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। এর মানে দাঁড়ায় সরকারের প্রচুর ক্ষতি। উপরন্তু, বিলগ্নিকরণ থেকে প্রাপ্তিকে PSE বা সরকারি উদ্যোগগুলোর পুনর্জীবনের বা উন্নতিতে বা দেশের পরিকাঠামো নির্মাণে কাজে না লাগিয়ে সরকারের রাজস্ব খাতে ঘাটতি মেটাতে ব্যবহৃত হয়েছিল। তুমি কি এটা মনে কর যে সরকারি সংস্থার সম্পত্তি আংশিক বিক্রি করে দেওয়াটা তাদের কার্যকরী করে তোলার সর্বোত্তম পন্থা?

সংস্কার এবং রাজস্ব নীতিসমূহ :

অর্থনৈতিক সংস্কার, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যয় বৃদ্ধি, বিশেষ করে সামাজিক ক্ষেত্রগুলোতে ব্যয়ের উপরে সীমারেখা টেনে দিয়েছে। সংস্কার চলাকালীন সময়ের কর ছাড়, যার উদ্দেশ্য ছিল রাজস্বখাতে আয় বৃদ্ধি করা এবং কর ফাঁকি প্রতিরোধ করা, সরকারের জন্য কর বাবদ রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়নি। এটাও উল্লেখ যে, সংস্কার কর্মসূচির অন্তর্গত মাসুল বা শুল্ক হ্রাসের ফলে আমদানি রপ্তানি শুল্কের সাহায্যে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সুযোগও কমে গেছে। বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কর ছাড়ের সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল যাতেকরে করখাতে রাজস্ব আয়বৃদ্ধির সুযোগ আরও কমে গেছে। এতে উন্নয়ন এবং কল্যাণকামী খাতে ব্যয়ের উপরে এক বিরূপ প্রভাব তৈরি হয়েছে।

3.7 উপসংহার

উদারনীতি এবং ব্যক্তি মালিকানাকে উৎসাহিত করার নীতির মাধ্যমে বিশ্বায়নের যে প্রক্রিয়া তা ভারতে এবং অন্যান্য দেশ উভয় ক্ষেত্রেই ধণাত্মক এবং ঋণাত্মক (সুফল এবং কুফল) দুইয়েরই জন্ম দিয়েছে। কিছু কিছু পণ্ডিত এই যুক্তি দেখান যে বিশ্বায়নকে বিশ্ব বাজারসমূহ উন্নত প্রযুক্তি প্রাপ্তির একটা সুযোগ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর বড়ো শিল্পগুলোর সামনে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগী হয়ে উঠার ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা হিসাবে দেখা উচিত।

বাক্স 3.3 : সারিসিল্লরে শোকাবহ ঘটনা!

ভারতের অনেক রাজ্যে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সংস্কার নীতি ভর্তুকি এবং কম দামে বিদ্যুৎ যোগানের ব্যবস্থার ইতি ঘটায় এবং বিদ্যুৎ শুল্কের অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি ঘটায়। এতে ক্ষুদ্র শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের বিদ্যুৎচালিত তাঁত বস্ত্রশিল্প এরকমই একটি উদাহরণ। যেহেতু বিদ্যুৎচালিত তাঁত শ্রমিকদের বেতনাদি কাপড়ের উৎপাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেহেতু বিদ্যুৎ ছাঁটাই মানে সেই সমস্ত তাঁত শ্রমিকদের, যারা এমনিতেই উচ্চ বিদ্যুৎ শুল্কহারে জর্জরিত ছিল, তাদের বেতন বা পারিশ্রমিক হ্রাস বোঝায়। এতে এই সমস্ত তাঁত শ্রমিকদের জীবন জীবিকার উপরে এক বিপর্যয় নেমে আসে এবং এর ফলশ্রুতিতে 'সারিসিল্লা' নামক অন্ধ্রপ্রদেশের একটি ছোট নগরীতে 50 জন বিদ্যুৎচালিত তাঁতশ্রমিক আত্মহত্যা করেন।

- তুমি কি এটা মনে কর যে বিদ্যুৎ শুল্ক বৃদ্ধি করা উচিত নয়?
- সংস্কারে ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোর পুনঃজীবনে তোমার প্রস্তাব কী হবে?

উল্‌টোদিকে সমালোচকরা এই যুক্তি দেখান যে বিশ্বায়ন হচ্ছে উন্নত দেশগুলোর অন্যান্য দেশে নিজেদের বাজার বিস্তার করার পদ্ধতি বা পরিকল্পনা তাদের কথা অনুযায়ী এটা গরিবদেশগুলোর নাগরিকদের কল্যাণ এবং তাদের আত্মপরিচয়ের সাথে এক সমঝোতা স্বরূপ। আরও বাড়িয়ে বলতে গেলে বাজার চালিত বিশ্বায়ন রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে আরও তীব্র করেছে।

ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে কিছু সংখ্যক চর্চায় বা অধ্যয়নে এটা বলা হয়েছে 1990 এর প্রারম্ভিক লগ্নে যে সংকটের উৎপত্তি হয়েছিল তা মূলত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার গভীরে প্রোথিত অসাম্য এবং সরকারি উদ্যোগে নেওয়া সংকট মোকাবেলায় অর্থনৈতিক সংস্কার নীতি সমূহের কারণে, অসাম্যের মাত্রা আরও বেড়ে গিয়েছিল এইসব বহিঃনির্দেশিত নীতিগুচ্ছ শুধুমাত্র উচ্চ আয় শ্রেণির মানুষের আয় এবং ভোগের মান বৃদ্ধি করেছিল এবং বৃদ্ধিসীমাবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র পরিসেবা ক্ষেত্রের কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন টেলিযোগাযোগ তথ্য প্রযুক্তি, অর্থ, বিনোদন, ভ্রমণ এবং আথিথেয়তা সেবা, ভূ-সম্পত্তি এবং বাণিজ্য পরিসেবা ইত্যাদিতে অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেমন কৃষিশিল্প ইত্যাদি, যা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে সেগুলো এর বাহিরে ছিল বা উপেক্ষিত ছিল।

সংক্ষিপ্ত বৃত্তি

- অর্থনীতি, বিদেশি মুদ্রার সংকট, বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন আমদানির বিকাশ এবং উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির হারের মতো সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। ভারত তার অর্থনৈতিক নীতি 1991 সালে পরিবর্তন করেছিল এবং বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার চাপের কাছে নতি স্বীকার করে।
- অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে, শিল্প এবং আর্থিক ক্ষেত্রে বড়োমাপের সংস্কার প্রক্রিয়া সূচনা হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে বিদেশি মুদ্রার বিনিময়ে বিনিয়ন্ত্রণ এবং আমদানি ক্ষেত্রে উদারনীতির মতো সংস্কারগুলো চালু হয়েছিল।
- সার্বজনিক ক্ষেত্রগুলোর পরিসেবার মান উন্নত করতে এদের ভূমিকাকে হ্রাস করা এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের কাছে এদের দরজা খুলে দেওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য সাধিত হয়েছিল। এটা করা হয়েছিল বিলগ্নিকরণ এবং উদারীকরণের মাধ্যমে।
- বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া হচ্ছে উদারীকরণ এবং বেসরকারিকরণ নীতিসমূহের পরিণতি। এর মানে হচ্ছে দেশীয় অর্থনীতিকে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে একত্রীকরণ করা।
- আউট সোর্সিং বা কাজের বহিঃউৎসরণ প্রক্রিয়া একটি দ্রুত উঠে আসা ব্যবসায়িক কার্যকলাপ।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) লক্ষ্য হচ্ছে একটি নিয়মতান্ত্রিক বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রচলন বা প্রতিষ্ঠা করা যার মাধ্যমে বিশ্ব সম্পদের সুষ্ঠু সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার সুনিশ্চিত করা যায়।
- সংস্কারকালীন সময়ে, কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রের বৃদ্ধি নিম্নগামী হয়ে পড়ে কিন্তু পরিসেবা ক্ষেত্রে বৃদ্ধি উর্ধ্বমুখী ছিল।
- সংস্কার প্রক্রিয়া থেকে কৃষিক্ষেত্র লাভবান হয়নি। সার্বজনিক বিনিয়োগও এই ক্ষেত্রে হ্রাস পেয়েছিল।
- আমদানিকৃত দ্রব্য সস্তায় মিলে যাওয়ায় এবং নিম্নহারে বিনিয়োগের কারণে শিল্পক্ষেত্রে বৃদ্ধিও শ্লথ হয়ে পরেছিল।

অনুশীলনী

1. ভারতে কেন আর্থিক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল?
2. WTO এর সদস্য হওয়া প্রয়োজন কেন?
3. ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রে RBI কেন তার ভূমিকা পরিচালক থেকে সুবিধা প্রদানকারীতে পরিবর্তন করেছিল?
4. আর বি আই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে?
5. টাকার অবমূল্যায়ন বলতে কী বোঝ?
6. পার্থক্য লেখো :

   i) কৌশলগত এবং আংশিক বিক্রি

   ii) দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক বাণিজ্য

   iii) শুল্ক এবং শুল্কবিহীন প্রতিবন্ধকতা
7. শুল্ক কেন আরোপ করা হয়?
8. পরিমাণগত বিধিনিষেধ বলতে কী বোঝ?
9. সরকার অধিকৃত সংস্থাগুলোর মধ্যে যারা মুনাফা করছে তাদের বেসরকারিকরণ করা প্রয়োজন। তুমি কি এ মত সমর্থন করো? কেন?
10. তুমি কি মনে করো ভারতের জন্য আউটসোর্সিং ভালো? উন্নত দেশগুলো কেন এর বিরোধী?
11. ভারতের কিছু সুবিধা আছে যেগুলোর জন্য ভারত আউট সোর্সিং এর গন্তব্যস্থল হিসাবে সবার পছন্দের। এই সুবিধাগুলো কী কী?
12. তুমি কি এতে একমত যে, ভারত সরকারের অধিকৃত সংস্থাগুলো উন্নতির জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত নবরত্ননীতি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে? কীভাবে করবে?
13. সেবা ক্ষেত্রের উচ্চবৃদ্ধির পেছনের কারণগুলো কী কী?
14. সংস্কার নীতির জন্য কৃষিক্ষেত্রকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা গেল। কেন?
15. সংস্কারের সময়কালে শিল্পক্ষেত্রের মন্দাদশার কারণ কী?
16. সামাজিক ন্যায়বিচার ও কল্যাণের প্রেক্ষাপটে ভারতে আর্থিক সংস্কারকে ব্যাখ্যা করো।

প্রস্তাবিত অতিরিক্ত কার্যাবলি

1. নীচের সারণিটিতে 2004-05 সালের জি ডি পির বৃদ্ধির হার দেখানো হল। রাশিতথ্যের উপস্থাপন পদ্ধতির সম্বন্ধে তুমি তোমার 'অর্থনীতিতে পরিসংখ্যান' -বই এ পাঠ করেছ। নীচের সারণিতে প্রদত্ত রাশিতথ্যগুলোর মাধ্যমে Time series বা কালীন সারি রেখার লেখচিত্র অঙ্কন করো এবং এটা ব্যাখ্যা করো।

বছর	জি ডি পি বৃদ্ধির হার (%)
2004-05	7.1
2005-06	9.5
2006-07	9.6
2007-08	9.3
2008-09	6.7
2009-10	8.6
2010-11	8.9
2011-12	6.7
2012-13	5.1
2013-14	7.4

2. তোমার চারপাশে দেখো তুমি দেখতে পাবে বিদ্যুৎ নিগম (SEBs), বি এস ই এস এবং অনেক সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা যারা বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে শহরে এবং রাজ্যগুলোতে। রাস্তায় সরকারি বাসের পাশাপাশি বেসরকারি বাসও দেখা যায়।

i) সরকারি এবং বেসরকারি এই দ্বৈত ব্যবস্থার সহবস্থানকে তুমি কীভাবে দেখ?

ii) এই দ্বৈত ব্যবস্থার সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো কী কী?

3. তোমার পিতামাতার এবং দাদু দিদার সাহায্য নিয়ে স্বাধীনতার সময়কালে ভারতের বহুজাতিক সংস্থাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো। এখন তাদের পাশে ✓ চিহ্ন দাও যারা এখনো আছে আর যারা নেই তাদের পাশে × চিহ্ন দাও। এমনকি কোনো সংস্থা আছে যাদের নাম পরিবর্তিত হয়েছে? এই সমস্ত সংস্থার বর্তমান নামসমূহ, সংস্থার উৎপত্তি দেশ, দ্রব্যের ধরন, লোগো ইত্যাদি খুঁজে বের করো এবং তোমার শ্রেণিকক্ষে একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

4. নীচেরগুলোর উপযুক্ত উদাহরণ দাও

দ্রব্যের প্রকৃতি	কোন একটি বিদেশি কোম্পানির নাম
বিস্কুট	
জুতা	
কম্পিউটার	
গাড়ি	
টিভি এবং ফ্রিজ	
স্টেশনারি দ্রব্য	

এখন দেখো উল্লেখিত সংস্থাগুলোকে 1991 সালের আগে ভারতে ছিল নাকি নতুন আর্থিক নীতি চালু হওয়ার পর এসেছে। এই তথ্য পাওয়ার জন্য তোমার শিক্ষক, পিতামাতা, দাদু দিদা এবং দোকানমালিকের সাহায্য নাও।

5. WTO এর বৈঠকগুলোর বিষয়ে প্রকাশিত কিছু খবরের কাগজের অংশ সংগ্রহ করো। ওই বৈঠকগুলোতে বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করো এবং কীভাবে বিশ্ববাণিজ্যের প্রসারে এই সংস্থা সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিল।

6. বিশ্বব্যাংক এবং IMF এর নির্দেশে আর্থিক সংস্কারের কর্মসূচি চালু করা কি ভারতের জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল? লেনদেন উদ্বৃত্তের সংকট মোকাবিলার জন্য কি সরকারের কাছে অন্য কোনো বিকল্প ছিল না? এই ব্যাপারে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো।

REFERENCES

Books

ACHARYA, S. 2003. *India's Economy: Some Issues and Answers*. Academic Foundation, New Delhi.

ALTERNATIVE SURVEY GROUP. 2005. *Alternative Economic Survey, India 2004–05, Disequalising Growth.* Daanish Books, Delhi.

AHLUWALIA, I.J. and I.M.D. LITTLE. 1998. *India's Economic Reforms and Development*. Oxford University Press, New Delhi.

BARDHAN, PRANAB. 1998. *The Political Economy of Development in India*. Oxford University Press, Delhi.

BHADURI, AMIT and DEEPAK NAYYAR. 1996. *The Intelligent Person's Guide to Liberalisation*. Penguin, Delhi.

BHAGWATI, JAGDISH. 1992. *India in Transition: Freeing the Economy.* Oxford University

Press, Delhi.

Byres, Terence J. 1997. *The State, Development Planning and Liberalisation in India.* Oxford University Press, Delhi.

Chadha, G.K. 1994. *Policy Perspectives in Indian Economic Development.* Har-Anand, Delhi.

Chelliah, Raja J. 1996. *Towards Sustainable Growth: Essays in Fiscal and Financial Sector Reforms in India.* Oxford University Press, New Delhi.

Debroy, B. and Rahul Mukherji (Eds.). 2004. *The Political Economy of Reforms.* Bookwell Publication, New Delhi.

Dreze, Jean and Amartya Sen. 1996. *India: Economic Development and Social Opportunity.* Oxford University Press, New Delhi.

Dutt, Ruddar and K.P.M. Sundaram. 2005. *Indian Economy. S.* Chand and Company, New Delhi.

Guha, Ashok (Ed.) 1990. *Economic Liberalisation, Industrial Structure and Growth in India.* Oxford University Press, New Delhi.

Jalan, Bimal. 1993. *India's Economic Crisis*: *The Way Ahead.* Oxford University Press, New Delhi.

Jalan, Bimal. 1996. *India's Economic Policy: Preparing for the Twenty First Century.* Viking, Delhi.

Joshi, Vijay and I.M.D. Little. 1996. *India's Economic Reforms 1991-2001.* Oxford University Press, New Delhi,

Kapila, Uma. 2005. *Understanding the Problems of Indian Economy.* Academic Foundation, New Delhi.

Mahajan, V.S. 1994. *Indian Economy Towards 2000 A.D.* Deep & Deep, Delhi.

Parekh, Kirit and Radhakrishna, *2002, India Development Report* 2001-02. Oxford University Press, New Delhi.

Rao, C.H. Hanumantha. and Hans Linnemann. 1996. *Economic Reforms and Poverty Alleviation in India*, Sage Publication, Delhi.

Sachs, Jeffrey D., Ashutosh Varshney and Nirupam Bajpai.1999. *India in the Era of Economic Reforms.* Oxford University Press, New Delhi.

Government Reports

Economic Survey (for various years). Ministry of Finance, Government of India. Published by Oxford University Press, New Delhi.

Tenth Five Year Plan 1997-2002. Vol. 1. Government of India, Planning Commission, New Delhi.

(NITI Aayog) Appraisal Document of Twelfth Five Year Plan 2012-2017, Government of India.

একক ৩

ভারতীয় অর্থব্যবস্থার বর্তমান চ্যালেঞ্জ

বর্তমানে ভারত যে প্রতিকূল সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হচ্ছে তাদের মধ্যে কয়েকটি হল দারিদ্রের সমস্যা, গ্রামীণ ভারতের উন্নয়ন এবং পরিকাঠামো নির্মাণ। আজ ভারতবর্ষ একশো কোটি জনসংখ্যার দেশ এবং মানবসম্পদই হল এই দেশের বৃহৎ সম্পদ। এই বৃহৎ সম্পদের জন্য স্বাস্থ্য ও শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ অত্যাবশ্যক। আমাদের কর্মসংস্থানের ধারণা সম্পর্কে বুঝতে হবে এবং একই সঙ্গে আমাদের দেশে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাও বুঝতে হবে। উন্নয়নের পদ্ধতিগুলোকে এমনভাবে চয়ন করব যাতে পরিবেশগত উন্নয়নের পাশাপাশি স্থিতিশীল উন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়। উপরোক্ত সমস্যাগুলোর মোকাবিলার জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলোর আলোচনাত্মক মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক, যা এই এককে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

4

দারিদ্র্য

এই অধ্যায় পাঠের পর, শিক্ষার্থীরা সক্ষম হবে

- দারিদ্র্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বুঝতে,
- দারিদ্র্যের বিভিন্ন ধারণা সম্বন্ধে ব্যাপক জ্ঞান লাভ করতে,
- দারিদ্র্য পরিমাপের পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে,
- দারিদ্র্য দূরীকরণের বর্তমান কর্মসূচিগুলোর উপলব্ধি করতে।

"কোনো সমাজ কখনো-ই সমৃদ্ধশালী ও সুখী হতে পারে না, যার অধিকাংশ জনগণ দরিদ্র এবং দুর্দশাগ্রস্ত।"

— অ্যাডাম স্মিথ

4.1 ভূমিকা

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে তোমরা বিগত সাত দশক ধরে ভারতে গৃহীত অর্থনৈতিক নীতিগুলো এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সূচকের উপর ঐ নীতিগুলোর প্রভাব সম্পর্কে অধ্যায়ন করেছ। স্বাধীন ভারতের প্রধান লক্ষ্য ছিল জনসাধারণের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদার সংস্থান করা এবং দারিদ্র্যতা দূরীকরণ। আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে উন্নয়নের ধরন সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল— দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতমদের উন্নয়ন (অন্ত্যোদয়), জীবনের মূলস্রোতে দরিদ্রদের সংযুক্তিকরণ এবং সকলের জন্য জীবনের ন্যূনতম জীবিকার স্তর সুনিশ্চিত করা।

1947 সালে জওহরলাল নেহেরু সংবিধান সভায় সম্বোধনের সময় বলেছিলেন যে "স্বাধীনতা লাভ শুধুমাত্র একটি পদক্ষেপ, একটি মাত্র সুযোগের প্রারম্ভ, আরও অধিক উপলব্ধি ও বিজয়োৎসব আমাদের জন্য প্রতীক্ষমান ..... দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, রুগ্নতা এবং সুযোগের বৈষম্যের সমাপ্তিকরণ।"

এইজন্যই আমাদের জানতে হবে বর্তমানে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। যেহেতু পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ দরিদ্র মানুষ ভারতেই বসবাস করে তাই দারিদ্র্যই শুধুমাত্র আমাদের একমাত্র সমস্যা নয়, কারণ পৃথিবীর 300 মিলিয়ন জনগণ এখনও তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু পূরণে অক্ষম।

বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন স্থানে দারিদ্র্যের বিভিন্ন ধরন লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে তার ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। দারিদ্র্য হল এমন একটি অবস্থা যা থেকে সবাই মুক্তি পেতে চায়। অতএব দারিদ্র্য দূরীকরণ হল দরিদ্র এবং ধনী উভয়কে নিয়েই বিশ্ব পরিবর্তনের একটি আহ্বান করা যাতে অধিক থেকে অধিকতর জনগণের পর্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা যায়, পর্যাপ্ত আশ্রয়ের, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা করা যায়, হিংসা থেকে বাঁচানো যায় এবং প্রতিটি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা করা যায়।

এখন জানতে হবে দারিদ্র্য দূরীকরণে কোন্ নীতিগুলো সহায়ক হবে, কোন্‌গুলো হবে না, সময়ের সাথে সাথে কীরূপ পরিবর্তন হতে পারে। একই সাথে আমাদের দারিদ্র্যতাকে সংজ্ঞায়িত, পরিমাপ, অধ্যয়ন, এবং উপলব্ধি করতে হবে। যেহেতু দারিদ্র্যের বিভিন্ন দিক রয়েছে, তাই বিভিন্ন সূচকের মাধ্যমে তাকে বুঝতে হবে। এই সূচকগুলো হল — আয় ও ভোগের স্তর, সামাজিক সূচক, ঝুঁকিসংক্রান্ত দুর্বলতার সূচক এবং সামাজিক-রাজনৈতিক প্রবেশাধিকারের সূচক।

4.2 দরিদ্র কারা ?

তোমরা অবশ্যই লক্ষ করেছ যে, প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে (গ্রাম ও শহরে) কিছু লোক ধনী এবং কিছু লোক গরীব হয়ে থাকে। অনু এবং সুধা-র কাহিনিটি পড়ো। তাদের জীবন হল বৈষম্যতার দুটি চরম অবস্থার উদাহরণ (বাক্স - 4.1 দেখো)। এমন অনেক লোক রয়েছে যারা এই দুই চরম অবস্থার মধ্যেও জীবনযাপন করছে।

ঠেলাগাড়িতে দ্রব্য বিক্রয়কারী ব্যক্তি গলিতে কর্মরত মুচি, ফুলের মালা প্রস্তুতকারী মহিলা, পুরোনো কাপড় সংগ্রহকারী ব্যক্তি, ফেরিওয়ালা এবং ভিক্ষুক — প্রমুখরা হল শহরের দরিদ্র এবং দুর্বলতর শ্রেণির উদাহরণ।

দরিদ্র ব্যক্তিদের সম্পত্তির পরিমাণ খুবই কম হয় এবং তারা মাটির তৈরি ঘরে বসবাস করে।

এই সমস্ত ঘরগুলোর দেওয়াল তৈরি হয় মাটি দিয়ে এবং ঐগুলোর ছাউনি তৈরি হয় খড়, তালপাতা, বাঁশ ও গাছের ডালপালা দিয়ে। তাদের মধ্যে যারা অধিক দরিদ্র তাদের কাছে এই ধরনের ঘরও নেই। গ্রামীণ ক্ষেত্রগুলোতে দরিদ্ররা অনেকেই ভূমিহীন হয়। এদের মধ্যে যাদের কিছু পরিমাণ জমি আছে সেগুলো আবার শুষ্ক বা পতিত জমি। অনেকেই আবার দিনে দুবেলা খেতে পায় না। উপবাস ও ক্ষুধা এই ধরনের পরিবারগুলোর নিত্যসঙ্গী, তাদের মধ্যে মৌলিক শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব থাকায় তারা অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে পায় না। দরিদ্র পরিবারের কর্মসংস্থাগুলোও অস্থায়ী প্রকৃতির।

অপুষ্টির ব্যাপারটি দরিদ্রদের মধ্যে খুবই

বাক্স 4.1 : অনু এবং সুধা

একই দিনে অনু এবং সুধার জন্ম হয়েছিল। অনুর মা বাবা ছিলেন নির্মাণ শ্রমিক। অন্যদিকে সুধার বাবা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী এবং মা ছিলেন একজন নকশা প্রস্তুতকারী বা পরিকল্পক।

প্রসব যন্ত্রণা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অনুর মা নিজের মাথায় করে ইটের ভার বহন করেছিলেন। যন্ত্রণা শুরু হওয়ার পর যন্ত্রপাতি মজুতকারী স্থানে গিয়ে একাই তিনি তাঁর কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। তিনি তাঁর কন্যাকে মাতৃদুগ্ধ পান করিয়ে এরপর একটি পুরোনো কাপড় দিয়ে তাকে মুড়ে চটের থলে দিয়ে তৈরি দোলনাতে একটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে অতিসত্ত্বর কাজে ফিরে আসেন, কেন না তার কাজ চলে যাওয়ার ভয় ছিল। অনুর মা আশা করেছিলেন যে অনু সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমাবে।

অন্যদিকে, সুধা শহরের একটি নামিদামি নার্সিং হোমে জন্মগ্রহণ করেছিল। সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিল, তাকে সুন্দরভাবে স্নান করিয়ে নরম কাপড় দিয়ে জড়িয়ে তার মার পাশে একটি দোলনাতে দেওয়া হয়েছিল। যখনই তার খিদে পেত তখনই তার মা তাকে মাতৃদুগ্ধ পান করাত, বুকে জড়িয়ে ধরত, চুম্বন করত এবং গান গেয়ে ঘুম পাড়াত। সুধার পরিবার পরিজনরা সুধার আগমনে উৎসব পালন করেছিল। অনু এবং সুধার শৈশব ছিল খুবই ভিন্ন ধরনের। অনু খুব ছোটোবেলা থেকে নিজেই নিজের দেখভাল করতে শিখে গিয়েছিল। সে জানত ক্ষুধা এবং অভাবের যন্ত্রণা কাকে বলে। সে আবিষ্কার করেছিল কীভাবে ডাস্টবিন থেকে খাবার তুলে নিতে হয়, শীতের সময় কীভাবে নিজেকে গরম রাখতে হয়, বর্ষাকালে কোথায় আশ্রয় নিতে হয় এবং সুতো ঘাস-লতাপাতা ও পাথর দিয়ে কীভাবে খেলতে হয় — তাও সে রপ্ত করেছিল। অনু কখনোই স্কুলে যেতে পারেনি কেননা অনুর বাবা মা ছিল যাযাবর বা ভ্রাম্যমাণ শ্রমিক, কাজের সন্ধানে তাদেরকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হত।

অনু নাচতে ভালবাসত। যখনই সে গান শুনতে পেত, তার মন নেচে উঠত, নাচ নিয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবন করার উন্মাদনায়। সে খুব সুন্দরী ছিল এবং তার ভাবভঙ্গিও খুবই লাবণ্যময় এবং অর্থপূর্ণ ছিল। তার মনোবাসনা ছিল জীবনে কোনো একদিন রঙ্গামঞ্চে নৃত্য প্রদর্শন করা। অনু খুব বড়ো নৃত্যশিল্পী হতে পারত, কিন্তু তাকে 12 বছর বয়স থেকেই কাজ শুরু করতে হয়েছিল। বেঁচে থাকার জন্য মাত্র বারো বছর বয়সেই বাবা মার সঙ্গে তাকে নেমে পড়তে হয়েছিল রোজগারের খুঁজে। সে ধনীদের জন্য প্রাসাদ তৈরি করত অথচ সেখানে বাস করার মতো স্বপ্ন দেখা পর্যন্ত ছিলো তার কাছে বিলাসিতা।

অন্যদিকে, সুধা খুবই গুণমান সম্পন্ন একটি বিদ্যালয়ে যেত, যেখানে সে কীভাবে পড়তে হবে, লিখতে হবে, গণনা করতে হবে — তা শিখত। সে মাঝেমধ্যে শিক্ষামূলক ভ্রমণে নক্ষত্রশালাতে, জাদুঘরে, জাতীয় উদ্যানে যেতো। পরবর্তী সময়ে সে একটি খুবই ভালো বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল। সে অঙ্কন করতে ভালোবাসত এবং একজন বিখ্যাত চিত্রকারের কাছ থেকে একান্তে শিক্ষা নিত। পরবর্তী সময়ে সে একটি ললিত কলা মহাবিদ্যালয়ে সুযোগ পায় এবং আজ সে একজন সুপরিচিত চিত্রশিল্পী হিসাবে পরিচিত।

উদ্বেগজনক। ভগ্নস্বাস্থ্য, অক্ষমতা এবং দুরারোগ্য ব্যধির কারণে এরা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়। তারা মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চসুদের হারে টাকা ধার নেয় যা তাদের পরিবারকে আজীবন ঋণের জালে জড়িয়ে রাখে। দরিদ্ররা খুবই দুর্বল প্রকৃতির হয়। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের ন্যায্য বেতনটুকু আদায় করতে ব্যর্থ হয় এবং এইভাবেই তারা শোষিত হতে থাকে। অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। তাদের জ্বালানির প্রধান উপাদান হল জ্বালানি কাঠ এবং গোবর দিয়ে তৈরি ঘুঁটে। দরিদ্রদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ স্বচ্ছ পানীয় জলের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এই ধরনের পরিবারগুলোতে সুযোগ সুবিধা সমন্বিত কর্মসংস্থানে, শিক্ষাতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে চরম লিঙ্গ বৈষম্যতা পরিলক্ষিত হয়। দরিদ্র মহিলারা গর্ভাবস্থায় পর্যাপ্ত যত্ন পায় না। তাদের শিশুদের আয়ুষ্কাল কম হয় বা জন্মসূত্রেই ভগ্নস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

চিত্র 4.2 *: অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারগুলো কাঁচা ঘরে বসবাস করে।*

অর্থনীতিবিদরা দরিদ্রদের শনাক্তকরণে তাদের পেশা ও সম্পদের মালিকানার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অর্থনীতিবিদরা বলেছেন যে দরিদ্ররা প্রধানত ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক হয় এবং খুবই কম কৃষিজোতের অধিকারী হয়। এদের মধ্যে এমনও ভূমিহীন কৃষক রয়েছে যারা বিভিন্ন ধরনের অকৃষিকার্যে যুক্ত থাকে এবং ক্ষুদ্র জোতের অধিকারী কৃষকদের জমিতে ভাড়াটে শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। গ্রাম থেকে যারা বিকল্প কর্মসংস্থানের খোঁজে শহরে এসেছে তারাই হল শহরের অধিকাংশ দরিদ্র। এই লোকগুলো বিভিন্ন ধরনের অনিয়মিত বা নৈমিত্তিক কাজ করে। এই স্বনির্ভর লোকগুলোকে আবার সড়কের কিনারে ও অলিগলিতে ঘুরেঘুরে কিছু দ্রব্য বিক্রয় করতে দেখা যায়।

চিত্র 4.1 *: অধিকাংশ কৃষিশ্রমিকরা দরিদ্র*

বাক্স 4.2: দারিদ্র্যতা কী?

দুজন গবেষক, শাহীন রফী খান এবং ডেমিয়ন কিল্লেন দারিদ্র্যের পরিস্থিতিকে খুবই সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন : দারিদ্র্য হল ক্ষুধা। দারিদ্র্য হল রোগাক্রান্ত হওয়া এবং ডাক্তার দেখানোর অসমর্থতা। দারিদ্র্য হল বিদ্যালয়ে যেতে না পারা এবং নিরক্ষর রয়ে যাওয়ার নাম। দারিদ্র্য হল কর্মসংস্থানের অভাব। দারিদ্র্য হল অসুরক্ষিত ভবিষ্যত এবং দিনে একবার খাওয়া। অপরিস্রোত পানীয় জলের কারণে রোগাক্রান্ত হয়ে শিশুদের মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে যাওয়ার নামই হল দারিদ্র্য। দারিদ্র্য শক্তিহীনতা, প্রতিনিধিত্ব হীনতা এবং স্বাধীনতা হীনতার নাম। তুমি কী মনে করো?

4.3 দরিদ্রদের কীভাবে চিহ্নিত করা হয়?

যদি ভারতের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করতে হয়, তাহলে দারিদ্র্যের কারণগুলোকে নির্মূল করার জন্য বাস্তব উপযোগি এবং স্থিতিশীল রণকৌশল গড়ে তুলতে হবে। একই সঙ্গে দরিদ্রদের নিদারুণ অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য উপযুক্ত যোজনা গ্রহণ করতে হবে। সেইজন্য এই পরিকল্পনা বা যোজনাগুলো বাস্তবায়িত করতে হলে সরকারকে প্রকৃত দরিদ্রদের শনাক্ত করতে হবে। একই সঙ্গে দারিদ্র্য পরিমাপের জন্য একটি মাত্রা স্থির করতে হবে এবং যে কারণগুলো এই মাত্রা স্থিরিকরণে প্রয়োজনীয় সেগুলোর সাবধানতার সঙ্গে চয়ন করতে হবে।

ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে দাদাভাই নৌরোজি-ই সর্বপ্রথম দারিদ্র্য রেখা সম্বন্ধে ধারণা দিয়েছিলেন। তিনি জেলখানার কয়েদিদের দেওয়া খাদ্যের বাজার মূল্যের ওপর ভিত্তি করে 'জেলখানার কয়েদিদের জীবিকা নির্বাহ ব্যয়' নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু জেলখানায় শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্করাই থাকে, বাস্তব সমাজে শিশুরাও বসবাস করে। অতএব তিনি জেলখানার কয়েদিদের জীবিকা নির্বাহ ব্যয় এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে দারিদ্র্য রেখা প্রস্তুত করার প্রয়াস করেছেন। এইজন্য তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ শিশু, যার মধ্যে অর্ধেক শিশুর ভোগের পরিমাণ খুবই কম হয় এবং বাকি অর্ধেক শিশুর ভোগও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোগের অর্ধেক হয়। এইভাবে তিনি তিন চতুর্থাংশের (Three fourths) সূত্রের রচনা করেন। সূত্রটি হল $\frac{1}{6}\times 0+\frac{1}{6}\times\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\times 1=\frac{1}{12}+\frac{2}{3}=1+\frac{8}{12}=\frac{9}{12}=\frac{3}{4}$ ভোগের তিন অংশের ভারযুক্ত গড় থেকেই গড় দারিদ্র্য রেখা পাওয়া যায়, যা জেলখানার প্রাপ্ত বয়স্ক কয়েদিদের জীবিকা নির্বাহের ব্যায়ের $\frac{3}{4}$ অংশ ছিল।

স্বাধীনতার পরে ভারতের দরিদ্রদের শনাক্তকরণে বহু সংখ্যক কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ 1962 সালে পরিকল্পনা কমিশন একটি অধ্যয়ন দল গঠন করেছিলেন। 1979 সালে 'Task Force on Projections of Minimum Needs and Effective consumption Demand' নামক অপর একটি দল গঠন করা হয়েছিল। 1989 এবং 2005 সালে একই

সরণী 4.1 : দারিদ্র্য সীমারেখা

চরমভাবে দরিদ্র	খুবই দরিদ্র	দরিদ্র	ততটা দরিদ্র নয়	মধ্যবিত্ত শ্রেণি	উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণি	ধনী	খুব-ই ধনী	লাখপতি	কোটিপতি
দরিদ্র			বিত্তশালী বা ধনী						

উদ্দেশ্যে 'বিশেষজ্ঞ দল' গঠন করা হয়েছিল। পরিকল্পনা কমিশন ছাড়াও অনেক অর্থনীতিবিদরা ব্যক্তিগতভাবে এই ধরনের দারিদ্র্য সীমারেখা নির্ধারণের চেষ্টা করেছিলেন।

দারিদ্র্যকে সংজ্ঞায়িত করার উদ্দেশ্যে আমরা মোট জনগণকে দুইটি অংশে ভাগ করি — দরিদ্র এবং বিত্তশালী বা ধনী। দারিদ্র্যসীমা রেখা এই দুই শ্রেণিকে পৃথক করেছে। যদিও বিভিন্ন ধরনের দরিদ্র্য রয়েছে, যেমন — চরম দরিদ্র, খুব-ই দরিদ্র এবং দরিদ্র। অনুরূপভাবে বিত্তশালীদেরও বিভিন্ন শ্রেণি রয়েছে, যেমন --- মধ্যবিত্ত শ্রেণি, উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণি, ধনী, খুব-ই ধনী এবং চরম ধনী। এই উপশ্রেণিগুলোকে একটি সরলরেখা হিসাবে ধরো, যার দুটি শেষ প্রান্তে রয়েছে চরমভাবে দরিদ্র ও চরমভাবে ধনী এবং সরলরেখাটি দারিদ্র্য রেখার দ্বারা ধনী ও দরিদ্র দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে।

দারিদ্র্যের শ্রেণিকরণ

দারিদ্র্যের শ্রেণিকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। একটি পদ্ধতির মধ্যে যারা সর্বদাই দরিদ্র এবং সামান্যতম দরিদ্র কিন্তু যাদের কিছু পরিমাণ টাকা রয়েছে (যেমন — কায়িক শ্রমিক) তাদের একসঙ্গে চিরকালীন দরিদ্র হিসাবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। আরেকটি শ্রেণি রয়েছে যারা পর্যায়ক্রমিকভাবে দরিদ্র ও বিত্তশালীর মধ্যে দুদোল্যমান (যেমন, ক্ষুদ্র কৃষক ও মরশুমি শ্রমিক), তাদের অস্থিত দরিদ্র বলা হয় এবং যারা বেশিরভাগ সময়ই ধনী থাকে কিন্তু মাঝেমধ্যে ভাগ্য যাদের সহায় হয় না, তাদের আকস্মিকভাবে দরিদ্র বলা হয়। এই দুটো শ্রেণিকে একত্রে অস্থায়ী দরিদ্র বলে। এছাড়া যারা কখনো দরিদ্র নয় তাদের বিত্তশালী বা ধনী বলা হয়।

দারিদ্র্য সীমারেখা

এখন আমরা দারিদ্র্য সীমারেখা কীভাবে নির্ধারিত হয় তা জানবো। দারিদ্র্যতা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এরমধ্যে একটি হল ন্যূনতম ক্যালোরি ভোগের আর্থিক মূল্য (মাথাপিছু ব্যয়). যা গ্রামীণ এলাকায় প্রতিজনের ক্ষেত্রে 2400 ক্যালোরি শহুরে এলাকায় প্রতিজনের ক্ষেত্রে 2100 ক্যালোরি। এর উপর ভিত্তি করেই 2011-12 সালে দারিদ্র্য রেখাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যেখানে প্রতিমাসে গ্রামীণ এলাকায় জনপ্রতি ভোগ্যমূল্য 816 টাকা এবং শহুরে এলাকায় জনপ্রতি 1000 টাকা ছিল।

যদিও আমাদের দেশের সরকার দরিদ্র

চার্ট 4.2 : চিরকালীন দরিদ্র, অস্থায়ী দরিদ্র এবং ধনী

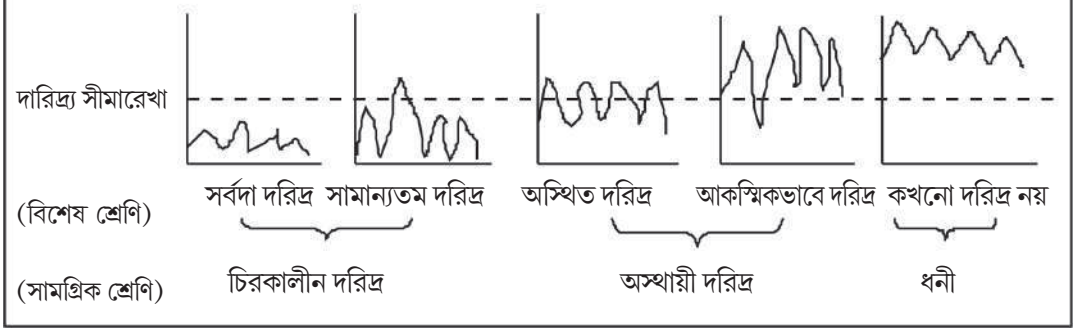

পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করতে প্রতিমাসে প্রতি ব্যক্তির ভোগব্যয়কে (MPCE) পরিবারের আয়ের দ্যোতক হিসাবে প্রয়োগ করেছেন, তথাপি তুমি কি এই যান্ত্রিক পদ্ধতিকে দেশের নির্ধন বা দরিদ্র পরিবারের চিহ্নিত করণের উপযুক্ত পদ্ধতি হিসাবে মানবে?

অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ্‌দের মতামত হল এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল যে তা সমস্ত দরিদ্র শ্রেণিকে একই শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করে এবং অতি দরিদ্র ও অন্য দরিদ্রদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। (চার্ট 4.2 দেখো)। এই পদ্ধতিতে মূলত খাদ্যবস্তু ও কিছু নির্বাচিত পণ্যের উপর ব্যয়কে আয়ের প্রতীক হিসাবে ধরেছে, এর ভিত্তির উপরও অর্থনীতিবিদদের প্রশ্ন বা আপত্তি রয়েছে। এর মাধ্যমে কাদের সরকারি সহযোগিতার আবশ্যিকতা রয়েছে তা অতি সহজে চিহ্নিত করা গেলেও কাদের অধিক সহযোগিতার প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা যায় না।

আয় ও সম্পত্তি ছাড়াও দারিদ্র্যের সঙ্গে জড়িত অনেক উপাদান রয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — বুনিয়াদি শিক্ষায় অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্যবিধি, পানীয় জল এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্মত পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি। এগুলোর জন্যও দারিদ্র্য সীমারেখা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। বর্তমানে দারিদ্র্য সীমারেখা নির্ধারণের কৌশলে নিরক্ষরতা, ভগ্নস্বাস্থ্য, সম্পদ আহরণে অপর্যাপ্ততা, নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বৈষম্যতা — এইসব সামাজিক উপাদানগুলোকে বিবেচনা করা হয় না। দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পগুলোর লক্ষ্য হওয়া উচিত — মানব জীবনের সার্বিক উন্নয়ন। এরমধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে যে, মানুষ কী হতে পরে এবং কী করতে পারে, অর্থাৎ স্বাস্থ্যবান ও পরিপুষ্ট তথা জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়ন হল একজন মানুষের জীবনের করণীয় কাজগুলোর পথে আসা প্রতিবন্ধকতার নিবারণ যেমন — নিরক্ষরতা, ভগ্নস্বাস্থ্য, সম্পদ আহরণে অসমর্থতা বা নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার অভাব।

যদিও সরকার দাবি করছে যে, প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার, কৃষি উৎপাদনে বৃদ্ধি, গ্রামীণ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান প্রদান এবং 1990-এর দশকে গৃহীত অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচিগুলো দারিদ্রের স্তরকে নামিয়ে এনেছে, তথাপি সরকারের এই দাবির ওপর অর্থনীতিবিদরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অর্থনীতিবিদরা দেখিয়েছেন যে, রাশিতথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতিসমূহ, ভোগকারীর ঝুড়ির অন্তর্গত পণ্য সামগ্রী, দারিদ্র্য রেখা নির্ধারণকারী পদ্ধতিসমূহ এবং দারিদ্র্যের প্রকৃত সংখ্যায় হেরফের করে ভারতে দারিদ্র্যের সংখ্যাকে কম দেখাচ্ছে।

দারিদ্র্য পরিমাপের বিভিন্ন সরকারি পদ্ধতিগুলোর সীমাবদ্ধতা থাকায় বিশেষজ্ঞরা বিকল্প পদ্ধতিতে দারিদ্র্য পরিমাপের চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন একটি সূচকের উদ্ভাবন করেছেন যা 'সেন সূচক' নামে পরিচিত। এছাড়াও দারিদ্র্য ব্যবধান সূচক এবং বর্গীয় দারিদ্র্য ব্যবধান (Poverty Gap Index & Squared Poverty Gap) নামক উপকরণগুলোকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তুমি এই উপকরণগুলো সম্পর্কে উচ্চশ্রেণিগুলোতে ক্রমশ জানতে পারবে।

4.4 ভারতে দরিদ্রের সংখ্যা

দরিদ্র জনগণের সংখ্যার আনুমানিক পরিমাণের সঙ্গে দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে বসবাসকারী জনগণের অনুপাতকে 'মাথা গুনতি অনুপাত' বলে।

ভারতে বসবাসকারী মোট দরিদ্র জনগণের সংখ্যা জানতে তুমি হয়তো আগ্রহী হবে। তারা কোথায় বসবাস করে এবং বিগত বৎসরগুলোতে তাদের সংখ্যা বা অনুপাত কমেছে না কমেনি? যখন এই ধরনের তুলনা

কাজগুলো করো

➢ 4.2 এবং 4.3 অংশে তুমি পড়েছ যে, শুধুমাত্র কম আয় এবং ব্যয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সূচকের মাধ্যমে দারিদ্র্য শনাক্তকরণ হয় না। কিন্তু এর শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে জমি, ঘরবাড়ি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধিসম্মত ব্যবস্থাদি অধিগত করার ক্ষমতাও বিবেচনায় আনতে হবে। তাছাড়া বৈষম্যমূলক পদ্ধতিগুলোকেও বিবেচনায় আনতে হবে। এই সমস্ত সূচকগুলি ব্যবহার করে কীভাবে একটি বিকল্প দারিদ্র্য সীমারেখা তৈরি করা যায় তা বর্ণনা করো।

➢ দারিদ্র্য সীমারেখার প্রদত্ত সংজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে গৃহস্থালির কাজে সাহায্যকারী, ধোপা, সংবাদপত্র বিক্রেতা প্রমুখ যারা তোমার এলাকায় / প্রতিবেশী রূপে বসবাস করে, তারা কী দারিদ্র্য সীমারেখার উপরে না নীচে রয়েছে তা বের করো।

প্রধানত অনুপাত এবং শতাংশের আকারে প্রকাশ করা হয়, তখন আমাদের দরিদ্র জনগণের বিভিন্ন স্তর এবং বিভিন্ন রাজ্যে সময়ে সময়ে তাদের প্রসারের ধারণা প্রাপ্ত হয়।

পরিকল্পনা কমিশন দ্বারা দরিদ্র জনগণের সরকারি তথ্য প্রকাশিত হয়। ন্যাশনাল সেম্পল সার্ভে অরগানাইজেশন (NSSO) দ্বারা ভোগ্য ব্যয়ের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতেই দরিদ্র জনগণের সংখ্যা পরিমাপ করা হয়। 4.3 নং চার্ট ভারতে 1973-2012 সালের মোট জনসংখ্যার মধ্যে দরিদ্র জনগণের সংখ্যা এবং তাদের অনুপাত দেখায়। 1973-74সালে 320 মিলিয়নের অধিক জনগণ দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে বসবাস করত।

2011-12 সালে এই দরিদ্র জনগণের সংখ্যা প্রায় 270 মিলিয়নে নেমেছে। অনুপাতের ভিত্তিতে 1973-74

চার্ট 4.3 : ভারতে দারিদ্র্যের গতিপ্রকৃতি, 1973-2012

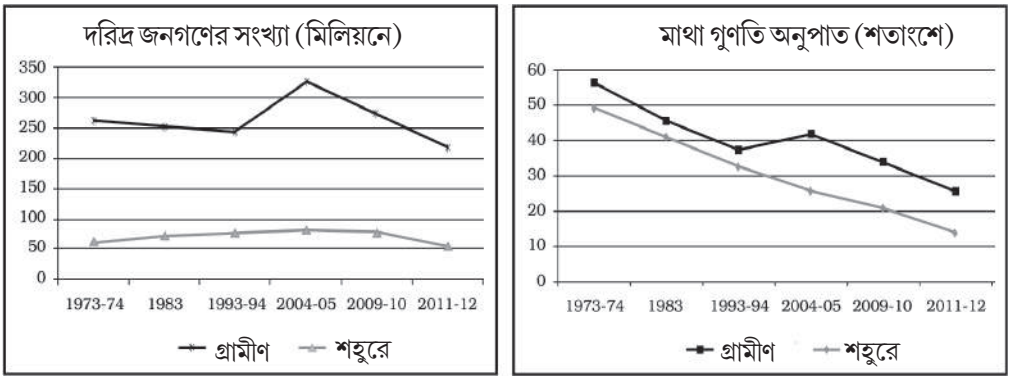

সালে মোট জনসংখ্যার প্রায় 55 শতাংশ জনগণ দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে বসবাস করত। 2011-12 সালে এটা 22 শতাংশে নেমেছে। 1973-74 সালে 80 শতাংশের অধিক দরিদ্র জনগণ গ্রামীণ এলাকাগুলোতে বসবাস করত এবং এই পরিস্থিতি 2011-12 সাল পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়েছে। এর অর্থ হল — ভারতের গ্রামগুলোতে এখনও তিন-চতুর্থাংশ ($^3/_4$) দরিদ্র জনগণ বসবাস করছে। কেন? বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করো।

1990-এর দশকে, গ্রামীণ এলাকাগুলোতে চরম দরিদ্র জনগণের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। যেখানে শহরে তাদের সংখ্যা খুবই সামান্য পরিমাণে বেড়েছিল। শহর এবং গ্রামীণ এলাকাগুলোতে দরিদ্র জনগণের অনুপাত ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। 4.3 নং চার্টে তুমি লক্ষ করে দেখো 1973-2012 সালের মধ্যে দরিদ্র জনগণের সংখ্যা এবং তাদের অনুপাত হ্রাস পেয়েছে কিন্তু এই দুটি মানদণ্ডের হ্রাসের প্রকৃতি ততটা উৎসাহব্যাঞ্জক নয়। দেশে চরম দরিদ্র জনগণের সংখ্যার তুলনায় এই অনুপাতটি কম হারে হ্রাস পাচ্ছে। তুমি আরও লক্ষ করে থাকবে যে গ্রামীণ এবং শহর এলাকাগুলোতে চরম দরিদ্র জনগণের সংখ্যার ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে। যেখানে 1990-2000 সাল পর্যন্ত এই অনুপাতের ব্যবধান একই রয়েছে। আর 2011-12 সালে এই অনুপাত বেড়েছে।

4.4 নং চার্টে রাজ্যস্তরে দারিদ্র্যের গতিপ্রকৃতি (trends) দেখানো হয়েছে। এই চার্টে দুটি লাইনই জাতীয়

চার্ট 4.4 : কিছু বৃহদায়তন রাজ্যের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যা, 1973-2012 (শতাংশে)।

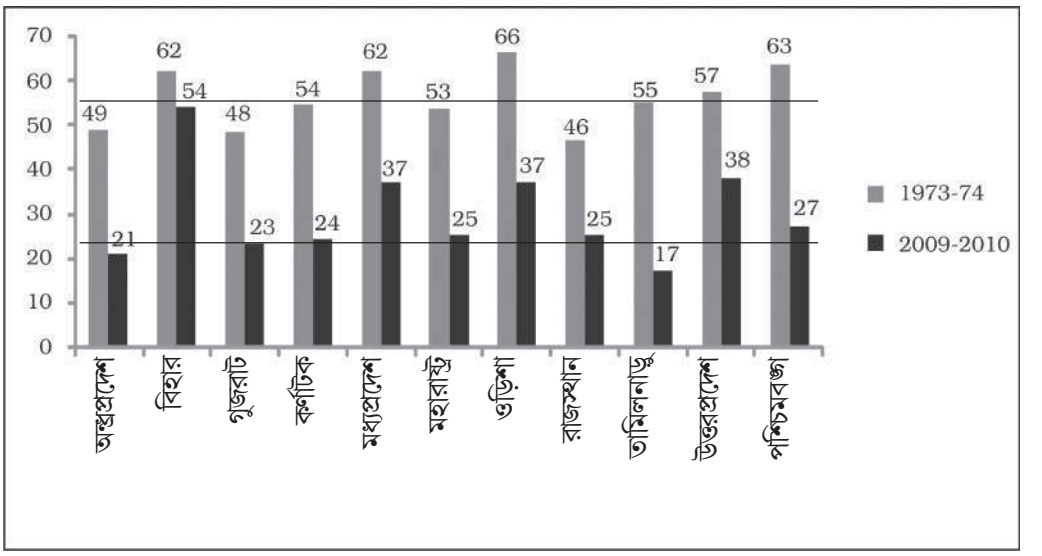

বিশেষ দ্রষ্টব্য : *1973 সালের জন্য উত্তরপ্রদেশ বর্তমান উত্তরাখণ্ডকে, মধ্যপ্রদেশ ছত্তিসগড়কে এবং বিহার ঝাড়খণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।*

দারিদ্র্যস্তর নির্দেশ করছে। প্রথম লাইনটি নীচের দিক থেকে 2011-12 সালের দারিদ্র্য স্তর এবং অন্য লাইনটি 1973-74 সালের দারিদ্র্যস্তর নির্দেশ করছে। এর অর্থ এই যে 1973-2012 সালের মধ্যে ভারতে দরিদ্র জনগণের অনুপাত 55 শতাংশ থেকে 22 শতাংশে নেমেছে। এই চার্টটি আরও দেখায় যে ছয়টি রাজ্যে — তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবাংলা এবং উড়িষ্যা — 1973-74 সালে একটা বৃহৎ অংশের দরিদ্র জনগণ বাস করতো। আবার 1973-2012 সালের মধ্যে কিছু ভারতীয় রাজ্য তাদের দরিদ্র জনগণের স্তরকে একটা বিবেচ্যস্তরে নামিয়ে এনেছে। তথাপি ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ এই চার রাজ্যে দারিদ্র্যস্তর জাতীয় দারিদ্র্যস্তর থেকে অনেক উপরেই রয়ে গেছে। তুমি লক্ষ করে থাকবে যে পশ্চিমবাংলা এবং তামিলনাড়ুতে দারিদ্র্যস্তর অন্যান্য রাজ্যগুলোর তুলনায় বেশি হারে কমিয়ে এনেছে। কীভাবে এই রাজ্য দুটি অন্যান্য রাজ্যগুলোর তুলনায় দারিদ্র্যস্তর নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে?

4.5 দারিদ্র্যতার কারণসমূহ কী কী?

দারিদ্র্যে কারণগুলো প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক উপাদানগুলোর সহিত সম্পর্কিত যা দরিদ্রদের জীবনে একটি ছাপ রাখে। দরিদ্ররা গুণগত শিক্ষা অর্জনে বঞ্চিত হয় এবং দক্ষতা অর্জনে অক্ষম হয়, যা তাদের অধিক আয়ের সহায়ক হতে পারত। দরিদ্ররা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত পরিসেবায় প্রবেশের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত কারণবশত বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। জাতিগত ভেদাভেদ, ধর্মীয় অনুশাসন এবং অন্যান্য বৈষম্যমূলক কার্যক্রমের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তরাই মুখ্যত দরিদ্র। যে সমস্ত কারণসমূহ এরজন্য দায়ী সেগুলো হল — i) সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বৈষম্য, ii) সামাজিক বহির্ভূক্তিকরণ, iii) বেকারত্ব, iv) ঋণগ্রস্ততা, v) সম্পদের অসম বণ্টন। সামগ্রিক দারিদ্র্য হল ব্যক্তিগত দারিদ্র্যে সমষ্টি। দারিদ্র্যতাকে সাধারণত অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত সমস্যার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন — i) স্বল্প মূলধন গঠন ii) পরিকাঠামোর অভাব iii) চাহিদার ঘাটতি iv) জনসংখ্যার চাপ v) সামাজিক / কল্যাণ ব্যবস্থার অভাব।

প্রথম অধ্যায়ে তুমি ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে পড়েছ। যদিও ভারতীয়দের জীবনযাত্রার মানের ওপর ব্রিটিশ শাসনের চূড়ান্ত প্রভাব এখনও পর্যন্ত বিতর্কিত, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ভারতীয় অর্থনীতি এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানের ওপর এর অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। ইংল্যান্ডের লাংকাশায়র থেকে প্রস্তুতকৃত সূতি বস্ত্র আমদানির ফলে স্থানীয় উৎপাদন ব্যাপকভাবে উৎপাটিত হয় এবং ভারত সুতিবস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ থেকে শুধুমাত্র সূতা (yarn) রপ্তানিকারক দেশে পরিবর্তিত হয়।

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয়দের 70 শতাংশের বেশি কৃষির সঙ্গে জড়িত ছিল যার ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় জীবনযাত্রার মানের ওপর কৃষি ক্ষেত্রের প্রভাব বেশি ছিল। ব্রিটিশ নীতিগুলো অনুসারে গ্রামীণ করের হার উত্তরোত্তর বাড়ানোর প্রবণতা থাকায় ব্যবসায়ী এবং মহাজনরা অতিদ্রুত বৃহৎ জমির মালিক হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারত খাদ্যশস্যের রপ্তানি আরম্ভ করেছিল, এর ফলস্বরূপ 1875 এবং 1900 সালের মধ্যে 26 মিলিয়ন জনগণের দুর্ভিক্ষের ফলে মৃত্যু হয়েছিল।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালে ইংরেজদের প্রধান লক্ষ্যই ছিল ব্রিটিশ রপ্তানিকৃত দ্রব্যের জন্য বাজার তৈরি করা যাতে ভারত ইংরেজদের ঋণ পরিশোধ করতে পারে এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী সেনাদের জন্য মানবশক্তি প্রদান করতে পারে।

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের কোটি কোটি মানুষকে দরিদ্র করে দিয়েছিল। ব্রিটিশরা আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে লুণ্ঠন করেছিল, আমাদের শিল্প কারখানাগুলো ব্রিটিশদের জন্য কম দামে দ্রব্য উৎপাদন করতে শুরু করেছিল এবং আমাদের খাদ্যশস্যগুলোও ব্রিটেনে রপ্তানি হচ্ছিল। বহুসংখ্যক লোকের দুর্ভিক্ষ এবং ক্ষুধায় মৃত্যু হয়েছিল। 1857-58 সালে ব্রিটিশদের দ্বারা স্থানীয় নেতাদের সরিয়ে দেবার ফলে ভারতীয়দের মনে চরম ক্ষোভ এবং অসন্তোষ দানা বাঁধে তাছাড়া উচ্চহারে চাষীদের উপর কর আরোপ করা এবং অন্যান্য অসন্তোষের ফল-ই সিপাহি এবং ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভারতীয় সেনাদের মধ্যে বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছিল।

চিত্র 4.4 : *স্বরোজগারের গুণগত নিম্নমান দারিদ্র্যতাকে বাঁচিয়ে রাখে।*

আজও কৃষিই গ্রামীণ জনগণের জীবন ধারণের মুখ্য উপায় এবং জমিই তাদের প্রাথমিক সম্পদ। জমির মালিকানাই বস্তুগত কল্যাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক এবং যাদের কিছু পরিমাণ নিজস্ব জমি আছে তারাই জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সমর্থ হয়েছে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে সরকার জমির পুনর্বণ্টনের চেষ্টা করেছেন এবং যাদের প্রচুর পরিমাণ জমি রয়েছে তাদের কাছ থেকে জমি নিয়ে ওইগুলো ভূমিহীনদের অর্থাৎ জমিতে মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক হিসাবে কাজ করে এমন লোকের মধ্যে বণ্টন করেছেন। যদিও এই পদক্ষেপটির সাফল্য ছিল সীমিত, যেহেতু কৃষি শ্রমিকদের বৃহৎ অংশ তাদের মালিকানাধীন ক্ষুদ্র জোতগুলো চাষ করতে অসমর্থ ছিল কারণ তাদের অর্থ বা সম্পদ ছিল না, জমিকে উৎপাদনশীল করার দক্ষতাও ছিল না এবং জোতের আকার ব্যবহারিক দিক থেকে খুবই ছোটো ছিল। উপরন্তু বেশিরভাগ ভারতীয় রাজ্যগুলো-ই জমি পুনর্বণ্টনের নীতিগুলোর প্রয়োগে অসমর্থ হয়েছিল।

ভারতের অধিকাংশ গ্রামীণ দরিদ্ররা ক্ষুদ্র কৃষক। তাদের যে জমিগুলো রয়েছে সেগুলো সাধারণত কম উর্বর এবং বৃষ্টি নির্ভর। তাদের জীবিকা ফসলের উপর এবং কখনো কখনো পশুসম্পত্তির উপর নির্ভর করে। জনসংখ্যার দ্রুতহারে বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের উৎস না থাকায় চাষের জন্য মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমাগত কমছে যার ফলে ভূমির খণ্ডিকরণ হচ্ছে। এই ধরনের ক্ষুদ্র জোত থেকে যে আয় হয় তা দিয়ে পরিবারের মৌলিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ হয় না।

তুমি অবশ্যই কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনা শুনে থাকবে। তাদের এই আত্মহত্যার পিছনের কারণ হল — চাষের জন্য ও গৃহস্থালির অন্যান্য প্রয়োজনে গৃহীত ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা। ঋণ পরিশোধের অসমর্থতার কারণ হল খরা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে তাদের ফসল

চিত্র **4.5** : *গুণমান সম্পন্ন কর্মসংস্থান দরিদ্রের কাছে এখনও একটি স্বপ্ন*

নষ্ট হয়ে যাওয়া। (বাক্স 4.3 দেখো)।

বেশিরভাগ তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতিরা গ্রাম এবং শহরের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভুত কর্মসংস্থানের সুযোগগুলোতে তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে অংশগ্রহণ করতে পারছে না।

ভারতের শহুরে দরিদ্রদের একটা বৃহৎ অংশই গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ, যারা কর্মসংস্থান ও জীবিকা নির্বাহের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত হয়েছিল। শিল্পায়ন এই সমস্ত দরিদ্র জনগণের সকলকে কর্মসংস্থান প্রদান করতে পারছে না। শহরের দরিদ্ররা হয়তো বেকার অথবা কখনো কখনো সাময়িক শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত থাকে। এই সাময়িক শ্রমিকরা সমাজের সবচেয়ে দুর্বল অংশের মধ্যে পরে কেন না তাদের কোনো চাকুরির নিরাপত্তা থাকে না, সম্পত্তি থাকে না, সীমিত দক্ষতা থাকে, সুযোগ সুবিধাও কম থাকে এবং বেঁচে থাকার জন্য উদ্বৃত্ত বলতে কিছু-ই থাকে না।

দারিদ্র্যতা কর্মসংস্থানের প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বেকারত্ব বা আংশিক বেকারত্ব, সাময়িক ও কখনো কখনো কাজের প্রকৃতি ইত্যাদি শহর এবং গ্রামীণ শ্রমিকদের ঋণগ্রস্ত হতে বাধ্য করে যা পর্যায়ক্রমে তাদের আরও দারিদ্রের মধ্যে জড়িয়ে দেয়। ঋণগ্রস্ততাই দারিদ্র্যতার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কারণের

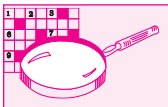

কাজগুলো করো

➢ তুমি তোমার প্রতিবেশী ধোপা এবং নাপিতকে দেখেছ। এটা জানতে চেষ্টা করো যে ওরা এই কাজগুলো কেন করে। তারা তাদের পরিবারকে নিয়ে কোথায় থাকে, দিনে তারা কতবার খাবার খেতে পারে, তাদের কোনো ভৌতিক সম্পত্তি আছে কিনা এবং তারা কেন চাকুরি করতে পারে না। তুমি যে তথ্যগুলো পেয়েছ তা তোমার শ্রেণিকক্ষে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করো।

➢ গ্রামীণ এবং শহর এলাকায় জনগণের কাজকর্মের পৃথক পৃথক তালিকা তৈরি করো। তুমি দরিদ্র নয় এমন জনগণেরও কাজ কর্মের একটি তালিকা তৈরি করতে পারো। এই দুটি তালিকার মধ্যে তুলনা করো এবং তোমার শ্রেণিতে দরিদ্র জনগণরা কেন এই ধরনের কাজে অংশগ্রহণে অক্ষম তা নিয়ে আলোচনা করো।

বাক্স 4.3 : কার্পাস চাষিদের দুর্দশা

অনেক ছোটো ভূস্বামী চাষি ও চাষের সঙ্গে যুক্ত পরিবার এবং বয়নশিল্পীরা বিশ্বায়নের প্রচণ্ড আঘাতে দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হচ্ছে এবং ভারতের অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল রাজ্যগুলোতেও আয় উপার্জনের উপলব্ধতার অভাব রয়েছে। যদি পরিবারগুলো তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে, বা ঋণ করে বা অন্য কোনো বিকল্প চাকরির সুযোগ থেকে আয় সৃষ্টি করতে পারে তাহলে তাদের সমস্যাগুলো ক্ষণস্থায়ী হয়ে যাবে। কিন্তু যদি পরিবারগুলোর কাছে বিক্রি করার মতো কোনো সম্পত্তি না থাকে বা ঋণ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকে যদি তারা অত্যন্ত উচ্চ সুদের হারে ঋণ গ্রহণ করে তীব্র ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পরে, এইভাবে পরিবারের সমস্যাগুলো তাদের দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে দারিদ্র্যরেখার নীচে ঠেলে দেয়। এই দুর্দশার নিকৃষ্টতম ফল হল আত্মহত্যা। কেবলমাত্র অন্ধ্রপ্রদেশেই এর সংখ্যা 3000 -এ পৌঁছেছে এবং তা ক্রমাগত বাড়ছে। 2005 সালের ডিসেম্বর মাসে, মহারাষ্ট্রের সরকার স্বীকার করেছেন যে, 2001 সাল থেকে রাজ্যে 1000 এর অধিক কৃষক আত্মহত্যা করেছে।

শান্তাবাঈ, নীলকান্ত সীতারাম খোকের পত্নী যিনি মহারাষ্ট্রের যাভাতমাতে আত্মহত্যা করেন।

2002-03 সালে ভারত বিশ্বের সবথেকে বড়ো কার্পাস বা তুলা উৎপাদক ক্ষেত্র যা 8300 হেক্টর জমিকে অধিগ্রহণ করে রেখেছে। কিন্তু প্রতি হেক্টরে 300 কেজির কম উৎপাদনই বিশ্বের দরবারে ভারতকে কার্পাস উৎপাদনের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে ঠেলে দিয়েছে। উচ্চ উৎপাদন ব্যয়, নিম্ন ও অস্থিতিশীল উৎপাদনের পরিমাণ, বিশ্বের বাজারে দামের হ্রাস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশের দ্বারা প্রদত্ত ভরতুকির ফলে বিশ্বউৎপাদনে আধিক্য এবং বিশ্বায়নের ফলে অভ্যন্তরীণ বাজার খুলে যাওয়ার কারণে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের কার্পাস উৎপাদক চাষিদের কৃষিক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করছে এবং আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই বিষয়টি শুধু মুনাফা বা উচ্চ প্রতিদানের নয়, কিন্তু এটা কৃষির ওপর নির্ভরশীল লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষিদের জীবিকা নির্বাহের ও বেঁচে থাকার সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা কৃষকদের আত্মহত্যার জন্য অনেক কারণ দেখিয়েছেন। সেগুলো হল — i) গতানুগতিক কৃষি পদ্ধতি থেকে উচ্চ উৎপাদনশীল বাণিজ্যিক শস্যের দিকে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও সম্মিলিতভাবে পর্যাপ্ত কারিগরি সুবিধার অত্যন্ত অভাব ছিল এবং সরকারও কৃষকদের সাহায্যকারী কার্যক্রমগুলো যেমন ফার্ম প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পরামর্শ দানের প্রসার, সম্মুখিত সমস্যা, তাৎক্ষণিক প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ এবং কৃষকদের সময়োপযোগী পরামর্শ দান ইত্যাদি সুবিধাগুলো তুলে নিয়েছিলেন। ii) শেষের দুই দশকে কৃষিক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগের হ্রাস, iii) বৃহৎ আন্তর্জাতিক ফার্ম দ্বারা প্রদত্ত বীজের নিম্নহারে অঙ্কুরোদ্গম, বেসরকারি এজেন্ট দ্বারা ভেজাল বীজ এবং কীটনাশকের জোগান, iv) ফসল ব্যর্থতা, পোকার আক্রমণ এবং খরা, v) বেসরকারি মহাজনদের কাছ থেকে 36 শতাংশ থেকে 120 শতাংশের মতো উচ্চহারে ঋণ গ্রহণ, vi) সস্তা আমদানির ফলে দাম ও মুনাফার নিম্নমুখীতা, vii) শস্যক্ষেত্রে জলসেচের অভাবের দরুন কৃষকরা অতিউচ্চ হারে ঋণ গ্রহণ করে অনেক গভীর থেকে জল বেরুনোর মতো নলকূপ (Borewell) স্থাপন করে, যা ব্যর্থ হয়েছে।

উৎস : *এ কে মেহেতা, সৌরভ ঘোষ, রিতু এলাবড়ির সহযোগিতায় কৃত অধ্যয়ন, 'বিশ্বায়ন, জীবিকার ক্ষতি এবং দারিদ্র্যের প্রবেশ', 2004-05 সালে ভারতে বিকল্প অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বিকল্প সমীক্ষা দল, দানিশ বুকস্, দিল্লি 2005 এবং পি সাইনাথ, দি স্যুয়েলিং 'রেজিস্টার অব ডেথস্', দি হিন্দু, 29 ডিসেম্বর 2005।*

মধ্যে একটি। খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বিলাসবহুল দ্রব্যের দামের তুলনায় দ্রুত হারে বাড়ছে, যা নিম্ন আয় সম্পন্ন পরিবারগুলোর কষ্ট এবং অভাবকে আরও বাড়িয়ে দেয়। আয় এবং সম্পদের অসম বণ্টনও ভারতে দারিদ্র্যকে টিকিয়ে রেখেছে।

এইসব কারণগুলো-ই সমাজকে দুটি পৃথক শ্রেণিতে বিভক্ত করেছে। একদিকে যারা উৎপাদনের উপকরণের অধিকারী ও ভালো উপার্জন করে এবং অন্যদিকে যারা জীবিত থাকার জন্য শুধুমাত্র তাদের শ্রম বিক্রি করে। বছরের পর বছর ধরে ভারতে ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান ক্রমাগতই বিস্তৃত হচ্ছে। দারিদ্র্য ভারতের জন্য একটি বহুমাত্রিক সমস্যা যার সঙ্গে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মোকাবিলা করা প্রয়োজন।

4.6 দারিদ্র্য দূরীকরণের নীতি এবং কার্যক্রমসমূহ

ভারতীয় সংবিধান এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সামাজিক ন্যায়কে উন্নয়ন কৌশলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হিসাবে গন্য করা হয়েছে।। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1951-56) অনুসারে 'বর্তমান পরিস্থিতিতে দারিদ্র্য এবং আয়, সম্পদ ও সুযোগের বৈষম্যের মতো ঘটনাগুলো থেকেই আর্থিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রবল সম্ভাবনাগুলো প্রকট হয়ে আসে।' দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও (1956-61) উল্লেখ করা হয়েছে যে 'সমাজের অপেক্ষাকৃত কম সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণিগুলোকে অধিক থেকে অধিকতর পরিমাণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবিধা প্রদান করতে হবে।' সকল প্রকার নীতি বিষয়ক দলিলেই দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং এরজন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কৌশলগুলোর উপর জোড় দেওয়া হয়েছে।

সরকার দারিদ্য দূরীকরণের জন্য তিন ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। প্রথমটি হল প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত পদ্ধতি। এটি এই প্রত্যাশার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রভাবই মোট দেশীয় উৎপাদন (GDP) এবং মাথাপিছু আয়ের দ্রুত হারে বৃদ্ধি ঘটাবে, যা সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে পড়বে এবং এর প্রভাব দরিদ্র অংশের মধ্যেও চুঁইয়ে পড়বে (trickle down)। 1950-এর দশকে এবং 1960-এর দশকের প্রারম্ভে এটাই ছিল পরিকল্পনার মুখ্য কেন্দ্রবিন্দু। এটা আশা করা হয়েছিল যে, অতি দ্রুত শিল্পের উন্নয়ন এবং কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষির পরিবর্তনই অনুন্নত অঞ্চলগুলোকে এবং সমাজের অত্যধিক পশ্চাদপদ শ্রেণিকে উপকৃত করবে। তুমি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে অবশ্য অধ্যয়ন করেছো যে, সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি এবং কৃষি ও শিল্পের বৃদ্ধি ততটা আশাব্যঞ্জক ছিল না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলই হল মাথাপিছু আয়ের খুবই স্বল্প বৃদ্ধির কারণ। দরিদ্র এবং ধনীদের মধ্যে ব্যবধান প্রকৃত পক্ষে বেড়েছে। সবুজ বিপ্লব আঞ্চলিক বৈষম্যের পাশাপাশি বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের মধ্যেও বৈষম্য ঘটিয়েছে। ভূমির পুনর্বণ্টনে অনিচ্ছা এবং অসমর্থতা ছিল। অর্থনীতিবিদরা দেখিয়েছেন যে, দরিদ্রদের উপর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল চুইয়ে পরেনি।

বিশেষত, দরিদ্রদের কথা বিবেচনা করে বিকল্প অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকরা ভাবতে শুরু করেছিলেন যে, অতিরিক্ত সম্পদ এবং কর্মসংস্থানের উপায় সৃজনের মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। নির্দিষ্ট দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (1961-66) থেকে গৃহীত হয়েছিল এবং তখন থেকেই তা ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হতে থাকে। 1970-এর দশকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য

চিত্র 4.6 : *'খাদ্যের বিনিময়ে কাজ' কর্মসূচির অধীন মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থান।*

নামক একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গৃহীত হয়েছিল।

অধিকাংশ দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিগুলোই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত হয়েছিল। বর্তমানে স্বনিযুক্তি কর্মসূচি এবং মজুরি ভিত্তিক কর্মসূচিগুলোকেই দারিদ্র্য নির্মূল করণের মুখ্য মাধ্যম ধরা হচ্ছে। স্বনিযুক্তি কর্মসূচির উদাহরণ হল — গ্রামীণ রোজগার সৃষ্টিকারী কর্মসূচি (REGP), প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা (PMRY) এবং স্বর্ণজয়ন্তী শহুরে রোজগার যোজনা (SJSRY)। প্রথম কর্মসূচিটির লক্ষ্য ছিল শহুরে এলাকায় স্বনিযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করা। এই কর্মসূচিটি খাদি এবং গ্রামোদ্যোগ কমিশন বাস্তবায়িত করছে। এই কর্মসূচির অধীনে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের জন্য ব্যাংকের মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। গ্রামীণ এবং শহর এলাকার স্বল্প আয় সম্পন্ন পরিবারগুলোর শিক্ষিত বেকাররা PMRY এর অধীনে কর্মসংস্থান সৃজনকারী যে-কোনো প্রকারের উদ্যোগ স্থাপনে আর্থিক সহায়তা পেতে পারে। (SJSRY)-এর প্রধান লক্ষ্য হল শহর এলাকাগুলোতে স্বনিযুক্তি এবং মজুরীভিত্তিক নিযুক্তি — এই দুই ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

পূর্বে স্বনিযুক্তি কর্মসূচির অধীনে পরিবারগুলোকে বা ব্যক্তি বিশেষে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হতো। 1990 -এর দশক থেকে এই পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে যারা এই কর্মসূচিগুলো থেকে সুবিধা পেতে চায় তাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী / দল (SHGs) গঠন করতে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। শুরুর দিকে তাদের কিছু অর্থ জমানোর জন্য এবং পরে এই অর্থ নিজেদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণের আকারে ধার দেওয়ার

জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়। পরবর্তী সময়ে সরকার ব্যাংকের মাধ্যমে এই স্বনির্ভর দলগুলোকে আংশিক আর্থিক সাহায্য প্রদান করে থাকেন, এই দলগুলোই পরে সিদ্ধান্ত নেয় স্বনিযুক্তি কার্যক্রম সৃষ্টির জন্য কাকে এই ঋণ দেওয়া হবে। স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (SGSY) হল এই ধরনের একটি কর্মসূচি। SGSY-ই বর্তমানে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (NRLM) নামে পুনর্গঠিত হয়েছে। একইভাবে শহরের দরিদ্রদের জন্য জাতীয় শহুরে জীবিকা মিশন (NULM) নামক একটি কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।

সরকার গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র অদক্ষ জনগণের মজুরিভিত্তিক রোজগার সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। 2005 সালের আগস্ট মাসে সংসদে একটি নতুন আইন পাশ হয় যেখানে প্রত্যেকটি গ্রামীণ পরিবারের একজন ইচ্ছুক প্রাপ্তবয়স্ককে বৎসরে 100 দিনের অদক্ষ শারীরিক কাজ প্রদানের নিশ্চয়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এই কার্যক্রমটি মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসূচি নিশ্চয়তা আইন (MGNREGA) নামে পরিচিত। এই আইনের অধীনে দরিদ্রদের সকলেই যারা ন্যূনতম মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক, তারা যেসমস্ত এলাকাগুলোতে এই কার্যক্রমটি চলছে সেখানে কাজ করার জন্য রিপোর্ট করতে পারে। 2013-14 সালে প্রায় 5 কোটি পরিবার এই আইনের অধীনে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণের তৃতীয় পদ্ধতিটি হল জনগণকে ন্যূনতম মৌলিক সুবিধা দেওয়া। ভারত বিশ্বের অগ্রগামী দেশগুলোর মধ্যে এমন একটি দেশ যেখানে বিবেচনা করা হয়েছিল যে, ভর্তুকিতে খাদ্যশস্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল এবং পয়ঃপ্রণালী সংক্রান্ত সুবিধা ইত্যাদি সামাজিক প্রয়োজনীয় ভোগের উপর সরকারি ব্যয় জনগণের জীনযাত্রার মান উন্নত করতে পারবে। এই পদ্ধতির অন্তর্গত কর্মসূচিগুলো দরিদ্রদের ভোগ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় উন্নতিকরণের পরিপূরক হয়ে ওঠার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই পদ্ধতিটি গৃহীত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, 'কর্মসংস্থানের সুযোগ বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্র জনগণেরা তাদের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী ক্রয়ে অক্ষম থাকবে। একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম স্তর পর্যন্ত দরিদ্রদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানীয় জল, বাসস্থান, যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি রূপে সামাজিক ভোগ ও বিনিয়োগে পরিপূরিত করতে হবে।' গণবণ্টন ব্যবস্থা, সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প এবং মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্প হল এমন তিনটি প্রধান কর্মসূচি যাদের লক্ষ্য হল দরিদ্রদের খাদ্য এবং পুষ্টিগত স্তরের উন্নয়ন ঘটানো। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা। প্রধানমন্ত্রী গ্রামোদয় যোজনা, বাল্মীকি আম্বেদকর আবাস যোজনা ইত্যাদি প্রকল্পগুলোও পরিকাঠামো এবং বাসস্থানের অবস্থার উন্নয়নে চেষ্টা করছে। এটা অবশ্যই সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, ভারত অনেক ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক অগ্রগতি লাভ করেছে।

সরকারের আরও অনেক সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কর্মসূচি রয়েছে যেগুলো কিছু বিশেষ গোষ্ঠীকে সাহায্য করছে। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা গৃহীত জাতীয় সামাজিক সহায়ক কর্মসূচি হল এমনই একটি কর্মসূচির উদাহরণ। এই কর্মসূচির অধীনে বয়স্ক জনগণ যাদের যত্ন করার অর্থাৎ দেখার কেউ নেই তাদের বেঁচে থাকার জন্য ভাতা প্রদান করে। দরিদ্র মহিলারা যারা পরিত্যক্তা এবং বিধবা মহিলারাও এই কর্মসূচির অধীনে রয়েছে। দরিদ্র জনগণকে স্বাস্থ্যবিমা দেওয়ার জন্যও সরকার

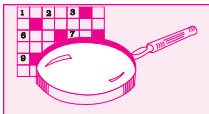

কাজগুলো করো

➢ সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা, মরুভূমি, পাহাড়ি উপজাতি অঞ্চল এবং উপজাতি অঞ্চলগুলোতে সম্ভব এমন তিন ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো এবং বর্ণনা করো যেগুলো i) কাজের জন্য খাদ্য কর্মসূচি এবং ii) স্বনিযুক্তি কর্মসংস্থানের অধীনে রয়েছে।

➢ তুমি তোমার এলাকায় বা প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ দেখে থাকবে। যার মধ্যে রয়েছে সড়ক নির্মাণ, সরকারি হাসপাতালগুলোতে অট্টালিকা নির্মাণ, সরকারি বিদ্যালয় নির্মাণ ইত্যাদি। তুমি ওই সমস্ত স্থানগুলো পরিদর্শন করো এবং কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কত সংখ্যক লোক নিযুক্তি পেয়েছে এবং তাদের কী পরিমাণ মজুরি দেওয়া হচ্ছে, তার উপর দুই-তিন পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করো।

নতুন কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। 2014 সাল থেকে সরকার প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা নামে একটি প্রকল্পের সূচনা করেন যেখানে সকল ভারতীয়দের ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। সঞ্চয়ের অভ্যাসের পাশাপাশি এই পরিকল্পনাটি সরকারি প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুবিধা এবং ভর্তুকিগুলো ব্যাংকের গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রেরণ করে। প্রত্যেক ব্যাংকের গ্রাহকদের 1 লক্ষ টাকা দুর্ঘটনাজনিত বীমা এবং 30,000 টাকার জীবনবিমার সুবিধা থাকে।

4.7 দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মসূচি --- একটি সমালোচনামূলক মূল্যায়ন

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে গৃহীত দারিদ্র্য দূরীকরণের বিভিন্ন কর্মসূচির ফল তখনই প্রথম সামনে আসে যখন কিছু রাজ্যের মধ্যে চরম দরিদ্র জনগণের শতাংশ জাতীয় গড় থেকে অনেক নীচে নেমে আসে। দারিদ্র্য দূরীকরণের বিভিন্ন রণকৌশল হাতে নেওয়া সত্ত্বেও ভারতের বেশিরভাগ অংশেই ক্ষুধা, অপুষ্টি, নিরক্ষরতা এবং মৌলিক সুবিধাগুলোর অভাব একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যরূপে বিদ্যমান রয়েই গেছে। যদিও দারিদ্র্য নিবারণ কর্মসূচিগুলোর বিগত সাড়ে পাঁচ দশক থেকে নিরন্তর বিকাশ হয়ে আসছে। তথাপি দারিদ্রের মধ্যে মৌলিক কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তুমি দেখেছ যে, দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিগুলোর নামের পরিবর্তন করা হয়েছে, একত্রীকরণ করা হয়েছে অথবা রূপান্তরিত করা হয়েছে। যদিও কর্মসূচিগুলোর দ্বারা অতি দরিদ্রদের সম্পত্তির মালিকানায়, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এবং মৌলিক সুবিধাগুলো পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। বিশেষজ্ঞরা যখনই এই কর্মসূচিগুলোর মূল্যায়ন করেছেন, তখনই এই কর্মসূচিগুলোর সফলতামূলক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। জমি এবং অন্যান্য সম্পত্তির অসম বণ্টনের জন্য প্রত্যক্ষ দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিগুলোর দ্বারা বিত্তবান জনগণরাই উপকৃত হয়েছে। দারিদ্র্যতার মাত্রার তুলনায় দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিগুলোর মধ্যে সম্পদ বণ্টনের অপর্যাপ্ততা রয়েছে। তাছাড়া, এই কার্যক্রমগুলোর বাস্তবায়ন প্রধানত সরকার এবং ব্যাংক কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভর করে। যেহেতু এই ধরনের কর্মকর্তারা

বাক্স 4.4 : রামদাস কোড়বার লক্ষ্যহীন সড়ক

রচকেঠা গ্রামের রামদাস কোড়বা এটা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়নি যে, সে 17.44 লক্ষ টাকা যে-কোনোভাবে সরকারের কাছ থেকে পেয়েছেন। 1993 সালের শেষের দিকে উপজাতি উন্নয়নের নামে সরকার রচকেঠা গ্রামের তিন কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তার নির্মাণকার্য 17.44 লক্ষ টাকায় সম্পন্ন করার জন্য একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন।

ভারতের একটি দরিদ্রতম জেলা হল সুরগুজা - 55 যার শতাংশ জনগোষ্ঠীই উপজাতি অংশের। পাহাড়ি বা হিলি কোড়বা, যারা দরিদ্রদেরও সবচেয়ে অন্তিম 5 শতাংশ অংশের মধ্যে রয়েছে, তাদের সরকার আদিম জনজাতি হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছেন। তাদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রয়াস চলছে যেখানে বিশাল পরিমাণ অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থে পরিচালিত প্রকল্পের মতোই পাহাড়ি কোড়বা প্রকল্পে পাঁচ বছরে 42 কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

দেশের পাহাড়ি কোড়বা জনজাতির সংখ্যা প্রায় 15000, যার বৃহৎ অংশই সুরগুজাতেই বসবাস করে। যদিও কিছু রাজনৈতিক কারণে এই পাহাড়ি কোড়বা উন্নয়ন প্রকল্পটির ভিত্তি রায়গড় জেলাতেই করা হয়েছে। রচকেঠা গ্রামে পাহাড়ি কোড়বা রাস্তা নির্মাণে একটিই মাত্র ছোটো সমস্যা ছিল — সেখানো কোনো পাহাড়ি কোড়বা পরিবার থাকত না। রামদাসের পরিবারই প্রকৃতপক্ষে একটি ব্যতিক্রম ছিল।

একজন বেসরকারি সংগঠনের (NGO) কর্মকর্তার বক্তব্য হল — 'এতে কিছু আসে যায় না এই সকল প্রকল্পগুলো পাহাড়ি কোড়বাদের কোনোপ্রকার লাভে আসছে না এমনকি একটি সুইমিং পুল এবং একটি বাংলোর নির্মাণও জনজাতি বিকাশের নামেই করা হবে।' রামদাসের ছেলে রামাবতার কোড়বা বলেছেন যে, 'এই গ্রামে পাহাড়ি কোড়বা পরিবারের সংখ্যা কত তা কেউ জানার চেষ্টা করেনি' এবং 'এখানে তো আগেই একটা কাঁচা রাস্তা ছিল'। 'তারা এই কাঁচা রাস্তার উপর শুধুমাত্র কিছু লালমাটি দিয়েছিল। 17.44 লক্ষ টাকা খরচ করা সত্ত্বেও এই রাস্তাটি আজও পাকা হয়নি।'

রামদাসের চাহিদা তো খুবই সাধারণ। সে বলেছে, "আমিতো শুধুমাত্র কিছু জল চাই। 'আমরা জল ছাড়া কীভাবে কৃষি করব? বারবার জোর দেওয়ার পর সে বলেছিল, '17.44 লক্ষ টাকা রাস্তা নির্মাণে ব্যয়ের পরিবর্তে তারা যদি আমার জমিতে থাকা বিকল কুয়োটির উন্নতিকল্পে কয়েক হাজার টাকা ব্যয় করত, তাহলে কি সেটা ভালো হত না? জমির অবস্থারও কিছু উন্নয়ন প্রয়োজন, কিন্তু তারা কিছু জল দিয়েই কাজটি শুরু করুক।'

রামদাসের সমস্যাগুলোকে অবহেলা করা হয়েছিল। সরকার শুধুমাত্র একটি লক্ষ্যপূরণ করতে চেয়েছিল। যদি এই নগদ রাশিকে ব্যাংকে মেয়াদি আমানত (FD) রূপে গচ্ছিত রাখা হত তাহলে কোনো পাহাড়ি কোড়বা পরিবারের কাউকে কখনো কাজ করতে হত না। শুধুমাত্র সুদ দিয়েই সুরগুজার জনগণের জীবনযাত্রার মান খুবই ভালো থাকত' — একজন সরকারি কর্মকর্তা হাস্যকৌতুকের সঙ্গে বলেছেন।

কেউ-ই রামদাসকে জিজ্ঞাসা করেনি যে — প্রকৃতপক্ষে তার কী প্রয়োজন ছিল, তার সমস্যা কী ছিল, অথবা এই সমস্যাগুলোর সমাধানে তাকে অন্তর্ভুক্ত করেনি। এর পরিবর্তে 17.44 লক্ষ টাকা ব্যয়ে তার নামে একটি রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিল, যা কখনও তার কোনো প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়নি। তার নামে তৈরি লক্ষ্যহীন দুই কিলোমিটার সড়কের উপর চলার জন্য যেই আমরা পা বাড়ালাম, তখনই রামদাস কোড়বা বলে উঠল, 'স্যার, আমার জলের সমস্যার কিছু সমাধান করুন'।

উৎস : *পি. সাইনাথ, 1966, এভ্রিবডি লাভস্ এ গুড ড্রট্ : স্টোরিজ ফ্রম ইন্ডিয়াজ পোরেস্ট ডিস্ট্রিক্টস্, পেঙ্গুইন বুকস্, নিউদিল্লি থেকে সংকলিত।*

চিত্র 4.7 : *স্ক্র্যাপ সংগ্রহকারী : কর্মসংস্থান পরিকল্পনার অব্যবস্থা জনগণকে স্বল্প মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করে।*

দুরভিসন্ধিমূলক, অপর্যাপ্তরূপে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দুর্নীতি প্রবণ এবং স্থানীয় গণ্যমান্যদের দ্বারা অনেক ধরনের চাপের সম্মুখীন হয়, তাই সম্পদগুলোর অদক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার এবং অপচয় হয়ে তাকে। এই কর্মসূচিগুলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণের অভাবও লক্ষ করা যায়।

দারিদ্র্য সীমারেখায় বা দারিদ্র্য সীমারেখার কিছুটা উপরে বসবাসকারী বেশিরভাগ দুর্বলতর শ্রেণির জন্য সরকার দ্বারা গৃহীত নীতিগুলো ব্যর্থ হয়েছে। এটাও স্পষ্ট যে, শুধুমাত্র উচ্চ প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য হ্রাসে যথেষ্ট নয়। দরিদ্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো প্রকল্পকেই সফলতার সাথে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

দারিদ্র্য বস্তুত পক্ষে তখনই দূরীভূত হবে যখন দরিদ্ররা সক্রিয়ভাবে প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ শুরু করবে। এটা তখনই সম্ভব যখন দরিদ্ররা সামাজিক সচলকরণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে, প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় দরিদ্র জনগণ অংশগ্রহণে উৎসাহিত হবে এবং একই সঙ্গে তাদের ক্ষমতায়ন করা হবে। এটা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সাহায্য করবে যার ফলে দরিদ্রদের আয়ের স্তর, দক্ষতার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য এবং স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়াও দারিদ্র্যগ্রস্ত এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন এবং ঐ এলাকাগুলোতে বিদ্যালয়, সড়ক, বিদ্যুৎ টেলিযোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তিগত সেবা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পরিকাঠামো প্রদান করতে হবে।

4.8 উপসংহার

আমরা স্বাধীনতার পরে প্রায় ছয় দশক অতিক্রম করে ফেলেছি। আমাদের সকল নীতিসমূহের উদ্দেশ্যগুলোতে বলা হয়েছিল যে, সমতা এবং সামাজিক ন্যায়ের পাশাপাশি দ্রুত এবং সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রসার ঘটবে। ভারতে যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, নীতি নির্ধারকরা সর্বদাই দারিদ্র্য দূরীকরণকে একটি মুখ্য চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। দেশে চরম দরিদ্রদের সংখ্যা কমেছে এবং কিছু রাজ্যে এই দরিদ্রদের সংখ্যা জাতীয় গড়ের চেয়েও কম। তথাপি সমালোচকেরা দেখিয়েছেন যে বিশাল সম্পদের বণ্টন এবং ব্যয় সত্ত্বেও আমরা দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পৌঁছানো থেকে অনেক দূরেই রয়ে গেছি। মাথাপিছু আয় এবং গড় জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয়েছে, মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের ক্ষেত্রেও কিছু অগ্রগতি ঘটেছে। কিন্তু যখন এই ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের

অগ্রগতির সাথে তুলনা করা হয় তখন আমাদের কার্যকারিতা ততটা সন্তোষজনক নয়। তাছাড়া, উন্নয়নের ফল সকল অংশের জনগণের কাছে পৌঁছায়নি। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক দিয়ে জনগণের কিছু অংশ, অর্থনীতির কিছু ক্ষেত্র, দেশের কিছু অঞ্চলগুলো উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, তথাপি এমন অনেক রয়েছে যারা এখনও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র (vicious circle of poverty) থেকে বেরোতে সমর্থ হয়নি।

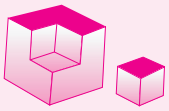

সংক্ষিপ্ত বৃত্তি

- ভারতের উন্নয়নমূলক রণকৌশলগুলোর মধ্যে দারিদ্র্যতা দূরীকরণই হল প্রধান উদ্দেশ্য।
- খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের উপর ন্যূনতম ব্যয়ের সঙ্গে গ্রামীণ ও শহর এলাকাগুলিতে যথাক্রমে 2400 এবং 2100 ক্যালরি দৈনিক মাথাপিছু ভোগব্যয়কেই দারিদ্র্যসীমা রেখা বা চরম দারিদ্র্য বলে।
- যখন দরিদ্রদের সংখ্যা এবং তাদের অনুপাত তুলনা করা হয়, তখন আমরা বিভিন্ন রাজ্যের এবং বিভিন্ন সময়ের মধ্যে জনগণের দারিদ্র্যের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে ধারণা পাই।
- ভারতে দরিদ্রদের সংখ্যা এবং মোট জনসংখ্যার মধ্যে তাদের অনুপাত যথেষ্ট পরিমাণে কমেছে। 1990 -এর দশকে প্রথমবারের মতো চরম দরিদ্রদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।
- বেশিরভাগ দরিদ্ররাই গ্রামীণ এলাকাগুলোতে বসবাস করে এবং তারা নিজেদেরকে অনিয়মিত ও অদক্ষ কাজে নিয়োজিত রাখে।
- আয় এবং ব্যয় সংক্রান্ত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে দরিদ্র জনগণের অন্যান্য গুণাবলি বিবেচনা করা হয় না।
- অনেক বৎসর ধরেই সরকার ভারতে দারিদ্র্য কমানোর জন্য তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছেন : প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত উন্নয়ন, নির্দিষ্ট দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি এবং দরিদ্রদের ন্যূনতম মৌলিক সুবিধা প্রদান।
- সম্পত্তির মালিকানার হস্তান্তর, উৎপাদন প্রক্রিয়ার এবং দরিদ্র জনগণকে মৌলিক সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারকে এখনও পদক্ষেপ নেওয়া বাকি রয়েছে।

অনুশীলনী

1. দরিদ্র চিহ্নিতকরণে ক্যালরিভিত্তিক নীতি পর্যাপ্ত নয় কেন?
2. 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্প বলতে কী বোঝ?
3. ভারতে দারিদ্র্য দূরীকরণে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী প্রকল্পগুলো গুরুত্বপূর্ণ কেন?
4. আয় উপার্জনকারী সম্পদগুলো দারিদ্র্যের সমস্যার সমাধানে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত?
5. ভারতে দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারের দারিদ্র্য বিরোধী ত্রিমাত্রিক পদক্ষেপ সফল হয়নি। মতামত ব্যক্ত করো।
6. সরকার বয়স্ক লোক, গরিব এবং অসহায় মহিলাদের সহায়তায় কী কী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে?
7. বেকারত্ব এবং দারিদ্রের মধ্যে কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি? ব্যাখ্যা করো।
8. ধরো তুমি গরিব পরিবার থেকে আছ এবং ছোটো দোকান খুলতে সরকার থেকে সাহায্য চাইছ। তুমি সহায়তার জন্য কোন্ প্রকল্পের অধীন আবেদন করবে এবং কেন?
9. গ্রামীণ এবং শহরের দারিদ্র্যের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করো। এটা বলা কী ঠিক হবে দারিদ্র্য গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত হয়েছে? দারিদ্র্য অনুপাতের গতিপ্রকৃতি ব্যবহার করে তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
10. ধরো তুমি গ্রামের একজন বাসিন্দা, দারিদ্র্য সমস্যা মোকাবেলায় কিছু ব্যবস্থার সুপারিশ করো।

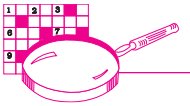

প্রস্তাবিত অতিরিক্ত কাজ

1. তুমি আশেপাশের 30 জন ব্যক্তির দৈনন্দিন বিভিন্ন দ্রব্য ভোগের তথ্য সংগ্রহ করো। আপেক্ষিক দারিদ্র্যের মাত্রা নির্ধারণে ঐ ব্যক্তিগুলোকে অপেক্ষাকৃত ভালো এবং খারাপ অনুসারে ক্রমবদ্ধ করো।

2. চারটি নিম্ন আয়ের পরিবারের বিভিন্ন বস্তুর উপর টাকার অঙ্কে অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ সংগ্রহ করে নিম্নের সারণি পূরণ করো। অনুসন্ধানটি বিশ্লেষণ করো এবং কোন্ পরিবারটি অন্য পরিবারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত গরিব তা বের করো। যদি দারিদ্র্য রেখা ব্যক্তি পিছু মাসিক 500 টাকা স্থির হয় তবে চরম দারিদ্র্যও নিরূপণ করো।

পণ্যসামগ্রী	পরিবার ক	পরিবার খ	পরিবার গ	পরিবার ঘ
গম / চাউল বনস্পতি তেল চিনি বিদ্যুৎ/আলোক সজ্জা ঘি কাপড় বাড়ি ভাড়া				

3. নিম্নের সারণিতে শতাংশের ভিত্তিতে ভারত এবং দিল্লির বস্তির ব্যক্তি পিছু বিভিন্ন বস্তুসামগ্রী ভোগের উপর গড় মাসিক ব্যয় দেখানো হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে 'চাউল এবং গম'-এ 25 শতাংশ কথার অর্থ হল প্রতি 100 টাকা ব্যয়ের মধ্যে কেবল 25 টাকা চাউল এবং গম ক্রয়ে ব্যয় হয়। সারণিটি ভালো করে পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বস্তুসামগ্রী	গ্রামীণ	শহুরে	দিল্লির বস্তিসমূহ
চাউল এবং গম	25.0	35.9	28.7
ডাল এবং ডালজাত পদার্থ	5.7	6.1	9.9
দুধ এবং দুগ্ধজাত পদার্থ	17.4	14.1	10.3
ফল এবং শাকসব্জি	15.1	12.7	19.6
মাংস, মাছ এবং ডিম	6.3	5.3	13.1
চিনি	3.3	3.8	4.0
লবণ এবং মশলা	10.8	10.8	8.1
অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী	16.5	11.3	6.4
মোট : সকল খাদ্য পদার্থ	**100**	**100**	**100**
সামগ্রীর ব্যয়ের উপর খাদ্য সামগ্রীর শতাংশ	62.9	72.2	72.8

- বিভিন্ন ধরনের খাদ্য পদার্থের সমষ্টির উপর ব্যয়ের শতাংশ এবং সেইগুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তুলনা করো।
- তুমি কি মনে কর বস্তি এলাকার পরিবারগুলো খাদ্যশস্য এবং ডালজাতীয় শস্যের উপর অধিক নির্ভরশীল?
- বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করছে এমন জনগণরা কোন্ দ্রব্যের ওপর কম ব্যয় করছে? এদের তুলনা করো।
- তুমি কি মনে কর যে বস্তিবাসীরা মাছ, মাংস এবং ডিমের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়?

REFERENCES

Books

DANDEKAR, V.M. and NILAKANTHA RATH. 1971. *Poverty in India*, Indian School of Political Economy, Pune.

DREZE, JEAN. AMARTYA SEN & AKTHAR HUSAIN (Eds.). 1995. *The Political Economy of Hunger.* Clarendon Press, Oxford.

NAOROJI, DADABHAI. 1996. *Poverty and Un-British Rule in India*, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Second Edition, New Delhi.

SAINATH, P. 1996. *Everybody Loves a Good Drought: Stories from India's Poorest Districts.* Penguin Books, New Delhi.

SEN, AMARTYA. 1999. *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation.* Oxford University Press, New Delhi.

SUBRAMANIAM, S. (Ed.). 2001. *India's Development Experience: Selected Writings of S. Guhan.* Oxford University Press, New Delhi.

Articles

KUMAR, NAVEEN and S.C. AGGARWAL. 2003. 'Pattern of Consumption and Poverty in Delhi Slums.' *Economic and Political Weekly*, December 13, pp. 5294-5300.

MINHAS, B.S., L.R. JAIN and S.D. TENDULKAR. 1991. 'Declining Incidence of Poverty in the 1980s—Evidence versus Artefacts,' *Economic and Political Weekly,* July 6-13.

Government Reports

Report of the Expert Group of the Estimation of Proportion and Number of Poor, Perspective Planning Division, Planning Commission Government of India, New Delhi, 1993.

Economic Survey (for various years). Ministry of Finance, Government of India.

Tenth Five Year Plan 2002-2007, Vol. II: *Sectoral Policies and Programmes,* Planning Commission, Government of India, New Delhi.

Twelfth Five Year Plan (2012-17), Vols. I, II and III. Sage Publications Pvt. Ltd., New Delhi (for Planning Commission, Government of India).

5

ভারতে মানব মূলধন গঠন

এই অধ্যায় পাঠ করে তোমরা সক্ষম হবে —

- মানব সম্পদ, মানব মুলধন এবং মানব উন্নয়নের ধারণা পেতে।
- মানব মূলধনে নিযুক্তি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানব উন্নয়নের মধ্যে যোগসূত্র জানতে।
- সরকারের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে।
- ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে।

শিক্ষার জন্য সরকারি ও বেসরকারি তহবিল থেকে ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তাকে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ ফলাফল দিয়ে পরিমাপ করা ঠিক হবে না। সাধারণ মানুষ সচরাচর যে ধরনের সুযোগ লাভ করেন তার থেকে বৃহত্তর সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে এই ধরনের বিনিয়োগ লাভজনক। এর অর্থ দাঁড়ায় যারা অপরিচিত হিসেবে মারা যেতেন তারা সমর্থ হবেন তাদের মধ্যেকার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলিকে বিকশিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে।

— আলফ্রেড মার্শাল

5.1 ভূমিকা

এমন একটি উপাদান নিয়ে চিন্তা করো যা মানবজাতির বিকাশকে অনেক বেশি প্রভাবিত করেছে। সম্ভবত এটা মানুষের জ্ঞান সংগ্রহ ও তার প্রসারণের ক্ষমতা যা সে কথোপকথনের মাধ্যমে, গানের মাধ্যমে এবং বিশদ বক্তৃতার মাধ্যমে করছে। কিন্তু মানুষ খুব শীঘ্রই জানতে পারল যে, এ সমস্ত জিনিসগুলোকে দক্ষতাপূর্ণভাবে করার জন্য আমাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও কুশলতা প্রয়োজন। আমরা জানি যে, একজন শিক্ষিত লোকের শ্রমদক্ষতা, একজন অশিক্ষিত লোকের শ্রমদক্ষতা থেকে বেশি এবং তাই পূর্ববর্তী জন, পরবর্তী জন থেকে বেশি আয় সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তার যোগদান বেশি হয়।

শিক্ষার অন্বেষণ কেবলমাত্র মানুষকে উচ্চ উপার্জনের ক্ষমতাই প্রদান করে না বরং তার আরও অনেক মূল্যবান উপকারিতা রয়েছে। এটা মানুষকে উচ্চতর সামাজিক স্থিতি ও গৌরব প্রদান করে। এটা একজন মানুষকে তার জীবনের তুলনামূলক ভালো বিকল্পগুলিকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্য বানায়; এটা সমাজে চলতে থাকা পরিবর্তনগুলিকে বুঝতে জ্ঞান প্রদান করে, এটা উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে উদ্দীপিত করে। অধিকন্তু, শিক্ষিত

চিত্র 5.1 : *কৃষকদের পর্যাপ্ত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ খামারের/জমির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে।*

শ্রমশক্তির লভ্যতা, নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ এবং অভিযোজনের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। অর্থনীতিবিদগণ কোন দেশে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেহেতু এটা উন্নয়ন পদ্ধতিকে ত্বরান্বিত করে।

5.2 মানব মুলধন কী ?

যেমনভাবে একটি দেশ তার ভৌতিক সম্পদ যেমন ভূমিকে ভৌতিক মূলধন, যেমন কারখানায় পরিবর্তিত করতে পারে, একইভাবে সে মানব সম্পদ যেমন শিক্ষার্থীদের মানব মূলধন যেমন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারে পরিবর্তিত করতে পারে। প্রাথমিকভাবে সমাজের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণে মানব মূলধন। যা এমন যোগ্য ব্যক্তি রূপে হবে, যারা নিজেরা প্রফেসর বা অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষিত ও প্রক্ষিণপ্রাপ্ত হয়েছেন। অন্য কথায়, আমাদের অন্য মানব মূলধন (যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি) তৈরি করতে হলে ভালো মানব মূলধন প্রয়োজন। এর অর্থ হল, মানব সম্পদ থেকে আরও মানব মূলধন তৈরি করার জন্যে, আমাদের মানব মূলধনে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন।

চলো, নীচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে, মানব মূলধন কী তা সম্বন্ধে আরও একটু স্পষ্টভাবে জেনে নিই ঃ

(ক) মানব মূলধনের উৎসগুলো কী কী?

(খ) মানব মূলধন ও একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি ?

(গ) মানব মূলধনের গঠন কি মানুষের সার্বিক বিকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত যাকে এখন বলা হয় মানব উন্নয়ন?

(ঘ) ভারতে মানব মূলধন গঠনে সরকার কী ভূমিকা পালন করতে পারে?

5.3 মানব মুলধনের উৎস

শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগকে মানব মূলধনের একটি প্রধান উৎস হিসেবে মনে করা হয়। আরও অন্যান্য কতিপয় উৎস যদিও রয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ, কর্ম চলাকালীন প্রশিক্ষণ, অভিপ্রায়ণ তথা তথ্য সঞ্চারণ — এগুলি হল মানব মুলধন গঠনের আরও অন্যান্য উৎস।

তোমাদের পিতা-মাতা কেন শিক্ষা খাতে টাকা ব্যয় করেন?

এটা করো

সমাজের আলাদা আলাদা স্তর থেকে তিনটি পরিবার বাছাই কর ঃ (ক) খুব গরীব, (খ) মধ্যবিত্ত এবং (গ) সমৃদ্ধশালী। এই পরিবারগুলোর ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে শিক্ষাখাতে খরচের ধরন বিচার করো।

ব্যক্তি কর্তৃক শিক্ষাখাতে খরচ কিছুটা এমন যেমন দীর্ঘকালীন এবং ক্রমবর্ধমান লাভের উদ্দেশ্যে কোম্পানি বা কারখানার মুলধনী দ্রব্যে ব্যয়। একইভাবে, ব্যক্তি তার ভবিষ্যতের আয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ করে।

শিক্ষার মতো স্বাস্থ্যকেও কোন দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনে করা হয় যেমনটা একজন ব্যক্তির উন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

কোন্ ব্যক্তি ভালো করে কাজ করতে পারে — একজন অসুস্থ লোক না কি একজন সুস্বাস্থ্যবান ব্যক্তি? চিকিৎসার সুবিধা ছাড়া একজন অসুস্থ শ্রমিক তার কাজ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। এতে উৎপাদনশীলতা

হ্রাস পায়। সুতরাং, স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় মানব মূলধন গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

প্রতিষেধক ঔষধ (টীকাকরণ), আরোগ্যদায়ক ঔষধ (অসুস্থতার সময় চিকিৎসা), সামাজিক ঔষধ (স্বাস্থ্য, শিক্ষার প্রসার) এবং পরিষ্কার পানীয় জলের বিধান ও উন্নত পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা— এগুলি হল স্বাস্থ্য ব্যয়ের বিভিন্ন রূপ। স্বাস্থ্য ব্যয়ে প্রত্যক্ষভাবে সুস্বাস্থ্যবান শ্রমিক শক্তির যোগান বৃদ্ধি করে এবং তাই এটা মানব মূলধন গঠনের একটি উৎস।

ফার্মগুলো তাদের কর্মচারীদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয় করে। এর বিভিন্ন ধরন হতে পারে। এক, ফার্মের নিজ কর্মস্থানে একজন দক্ষ শ্রমিকের তত্বাবধানে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে; দুই, কর্মচারীদের কর্মস্থলের বাইরে অন্য কোনো স্থানে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো যেতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ফার্ম কিছু ব্যয় বহন করে। ফার্মগুলো তাই এটার উপর গুরুত্ব দিতে চাইবে যে, প্রশিক্ষণের পর কর্মচারীরা যেন একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করে। তবেই ফার্মগুলো প্রশিক্ষণের ফলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উৎপাদনের লাভের ফল পেতে সফল হবে। কর্মরত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে ব্যয়, মানব মূলধন গঠনের একটি উৎস। যেহেতু এধরনের খরচের তুলনায় শ্রম উৎপাদনের বৃদ্ধিতে হওয়া লাভ বেশি হয়।

লোক চাকরির খোঁজে স্থানান্তরিত হয় যা তাদের জন্য নিজস্ব স্থান থেকে প্রাপ্ত বেতন থেকে উচ্চতর বেতন

নিয়ে আসে। ভারতে গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরনের কারণটি হল বেকারত্ব। প্রযুক্তিগতভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা যেমন ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার-তারা উচ্চতর বেতন পাওয়ার আশায় নিজের দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হয়। এই উভয় ধরনের স্থানান্তরনের ক্ষেত্রেই জড়িয়ে আছে পরিবহন ব্যয়, স্থানান্তরিত স্থানে উচ্চতর জীবিকা নির্বাহের খরচ এবং অজানা সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ থাকার মানসিক চাপ। কিন্তু নতুন স্থানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উপার্জন, স্থানান্তর সংক্রান্ত বাকি সব খরচ থেকে বেশি হয়। তাই, স্থানান্তরণে ব্যয় ও মানব মূলধন গঠনের একটি উৎস।

লোক শ্রম বাজার তথা অন্যান্য বাজারে যেমন — শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় তথ্য পাওয়ার জন্য ব্যয় করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিভিন্ন ধরনের চাকরির সাথে লোক তার বেতন মান জানতে চায়, জানতে চায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিক ধরনের চাকরিযোগ্য দক্ষতা প্রদান করছে কি না এবং তা কীরকম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মানব মূলধনে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এই তথ্যগুলি জরুরি এবং একইভাবে জরুরি অর্জিত মানব মূলধন ভাণ্ডারের দক্ষ ব্যবহারের জন্য। তাই, শ্রমবাজার ও অন্যান্য বাজার সম্বন্ধীয় তথ্য পাওয়ার জন্য করা ব্যয়ও মানব মূলধন গঠনের একটি উৎস।

বাক্স 5.1 : ভৌত মূলধন ও মানব মূলধন

দু প্রকারের মূলধন গঠনই সুচিন্তিত বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের ফলাফল। ভৌত মূলধনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নিজের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে। উদ্যোগপতিদের কাছে অনেক প্রকার বিনিয়োগ বিকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফলের হার গণনার জ্ঞান থাকে এবং গণনার পর তারা যুক্তিযুক্তভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, কোন্ বিনিয়োগটি করা উচিত। ভৌত মূলধন এর মালিকানা, মালিকের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের পরিণাম — ভৌত মূলধন গঠন মূলত একটি অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া। মানব মূলধন গঠনের একটি মহত্বপূর্ণ অংশ কোন ব্যক্তির জীবনে ঐ সময়ে ঘটে যখন সে সিদ্ধান্ত নিতে অসমর্থ হয় যে এটা তার উপার্জনকে অধিকতর করবে কি না। শিশুদেরকে তাদের মা-বাবা কিংবা সমাজ বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা প্রদান করে থাকে। শিক্ষাবিদগণ এবং সমাজ মানব মূলধন বিনিয়োগের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে সর্বোচ্চ স্তরেও অর্থাৎ মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও অধিকন্তু এই স্তরে মানব মূলধন গঠন, বিদ্যালয় স্তরে ইতিপূর্বে গঠিত মানব মুলধনের উপর নির্ভরশীল। মানব মূলধন গঠন আংশিকভাবে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া এবং আংশিকভাবে মানব মূলধন ধারণকারীদের একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত।

তোমরা জান যে, ভৌত মূলধন যেমন বাসের মালিকের বাস যেখানে ব্যবহৃত হয়, সেখানে থাকার প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে একজন বাস-চালক যার বাস চালানোর জ্ঞান ও সামর্থ্য আছে, তাকে উপস্থিত থাকতে হয় যখন বাসটি মানুষ কিংবা দ্রব্য পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ভৌত মূলধন অধিকম্য এবং অন্যান্য দ্রব্যের মত সহজেই বাজারে বিক্রি করা যায়; অন্যদিকে মানব মূলধন অধিগম্য নয়, এটা তার মালিকদের দেহ এবং মনে অভ্যন্তরীণভাবে তৈরি হয়। মানব মুলধন বাজারে বিক্রি হয় না, কেবলমাত্র মানব মূলধনের সেবা বিক্রি হয় এবং তাই মানব মূলধনের আধিকারিকে উৎপাদনের স্থানে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হয়। ভৌত মূলধনকে তার মালিক বা অধিকারী থেকে আলাদা করা যায়। অন্যদিকে মানব মূলধন তার মালিক বা অধিকারী থেকে আলাদা নয়।

এই দুধরনের মূলধন তাদের স্থানের গতিশীলতার উপর নির্ভর করে আলাদা হয়। কয়েকটি কৃত্রিম বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ ছাড়া ভৌত মূলধন বিশ্বব্যাপী সম্পূর্ণভাবে মরণশীল হয়। আর মানব মূলধন বিশ্বব্যাপী সম্পূর্ণ সঞ্চরণশীল নয়, যেহেতু তার গতিশীলতা জাতীয়তা ও সংস্কৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাই, আমদানির মাধ্যমেও ভৌত মূলধন গঠন করা যেতে পারে। যেখানে মানব মূলধন গঠিত হয়। সমাজ, অর্থনীতি এবং সরকার তথা ব্যক্তিগত ব্যয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে কতগুলি সুচিন্তিত নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে।

সময়ের সাথে সাথে দুধরনের মূলধনেরই মূল্য হ্রাস হয় কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রে মূল্য হ্রাসের প্রকৃতি আলাদা হয়। যন্ত্রের নিরন্তর ব্যবহার তার মূল্য হ্রাস ঘটায় এবং প্রযুক্তির পরিবর্তনে একটি যন্ত্রকে সেকেলে করে তুলে। মানব মূলধনের ক্ষেত্রে, বয়সের সাথে সাথে মূল্য হ্রাস ঘটে কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিরন্তর বিনিয়োগের মাধ্যমে এই মূল্য হ্রাস বা অপচয়কে একটি বিশাল সীমা পর্যন্ত কমানো যেতে পারে। এই বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে মানব মূলধনকে মানিয়ে নিতে যা ভৌত মূলধনের ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে না।

মানব মূলধন থেকে প্রবাহিবত সুফলের প্রকৃতি, ভৌত মূলধন থেকে আলাদা হয়। মানব মূলধন কেবলমাত্র তার মালিকপক্ষকেই লাভ যোগায় না, সাধারণভাবে সমাজেরও লাভ হয়। এটাকে বাহ্যিক সুফল বলা যায়। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কার্যকরীভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে। একজন সুস্থ ব্যক্তি, ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি পালনের মাধ্যমে সংক্রামক রোগকে মহামারির রূপ নেওয়া থেকে আটকাতে পারে। মানব মূলধন ব্যক্তি ও সামাজিক — উভয় সুফলও প্রদান করে, অন্যদিকে ভৌত মূলধন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সুফলই তৈরি করে। অর্থাৎ, মুলধনী দ্রব্য থেকে সুফল তাদের দিকেই প্রবাহিত হয় যারা ঐ দ্রব্যটির জন্য এবং ঐ দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত সেবার জন্য দাম চুকিয়েছে।

ভৌত মূলধনের ধারনা হল মানব মূলধন ধারনার ভিত্তি। এই দু'ধরনের মুলধনের মধ্যে কিছু মিল রয়েছে, আবার কিছু লক্ষণীয় ভিন্নতাও রয়েছে।

মানব মূলধন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা বিকাশ : জাতীয় আয়ে কার বেশি যোগদান রয়েছে একটি কারখানার শ্রমিকদের না একজন সফটওয়ার বিশেষজ্ঞের? আমরা জানি যে, একজন শিক্ষিত লোকের শ্রম দক্ষতা, একজন অশিক্ষিত লোকের শ্রমদক্ষতা থেকে বেশি হয় এবং একজন শিক্ষিত শ্রমিক, অশিক্ষিত শ্রমিক থেকে বেশি আয় করতে সক্ষম হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে কোনো দেশের প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধিকে বোঝায়। স্বভাবতই, কোন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে একজন শিক্ষিত ব্যক্তির যোগদান বা অবদান, একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি থেকে বেশি। যদি একজন সুস্থ ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরে অবিঘ্নিতভাবে শ্রমের যোগান দিতে পারে, তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য ও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই অন্যান্য উপাদান যেমন কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ, চাকরি বাজারের খবরাবখর এবং স্থানান্তরণের সাথে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ইত্যাদি একজন ব্যক্তির আয়

চিত্র 5.2 এর দিকে লক্ষ করো এবং আলোচনা কর।

(ক) উপযুক্ত 'শ্রেণিকক্ষ' থাকার সুবিধাগুলি কী কী?

(খ) তোমরা কি মনে কর এসব বিদ্যালয়ে যে শিশুরা যায় তারা গুণগত শিক্ষা লাভ করে?

(গ) এসব বিদ্যালয়গুলিতে দালানঘর নেই কেন?

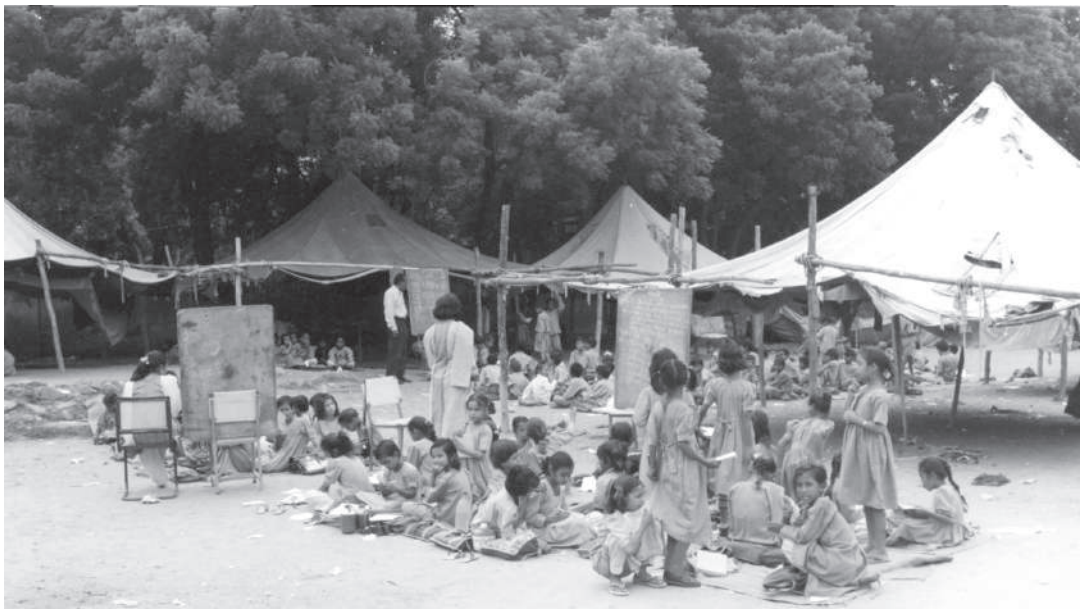

চিত্র 5.2 : *মানব মূলধনের সৃজন ঃ দিল্লিতে অস্থায়ী রূপে চালু একটি বিদ্যালয়।*

অর্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।, মানুষের এই বর্ধিত উৎপাদনশীলতা বা মানব মূলধন কেবলমাত্র শ্রম উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই যথেষ্ট অবদান রাখে না বরং পরিবর্তনকে উৎসাহিত করতে এবং নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষমতা সৃজনে অবদান রাখে। শিক্ষা, সমাজে পরিবর্তন এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে জ্ঞান সরবরাহ করে এক নতুন আবিষ্কার এবং পরিবর্তনকে সহজতর করে। একইভাবে, শিক্ষিত শ্রমিক শক্তির সহজলভ্যতা, নতুন প্রযুক্তির গ্রহণকে সহজতর করে।

'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণ, মানব মুলধনে বৃদ্ধি'— এটাকে প্রমাণ করার জন্য গবেষণামূলক দৃষ্টান্ত স্পষ্ট নয়। এটা পরিমাপণ সমস্যার জন্য হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, বিদ্যালয় শিক্ষার বছর, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত এবং ভর্তির হারের মাধ্যমে শিক্ষার পরিমাপ, শিক্ষার গুণগত মানকে প্রতিফলিত নাও করতে পারে, টাকার অঙ্কে, কাঙ্খিত আয়ুষ্কাল ও মৃত্যু হারের সাহায্যে স্বাস্থ্য পরিসেবার পরিমাপ ও কোনো দেশের মানুষদের সত্যিকারের স্বাস্থ্য স্থিতিকে নাও প্রকাশ করতে পারে। উপরে উল্লিখিত সূচকগুলো ব্যবহার করে, উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশগুলির শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নতি এবং প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধি ব্যাখ্যা করলে, মানব মূলধন পরিমাপে অভিসৃতি লক্ষ্য করা যায় কিন্তু প্রকৃত মাথা পিছু আয়ে কোন অভিসৃতির চিহ্ন পাওয়া যায় না। অন্য কথায়, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মানব মূলধনের প্রবৃদ্ধি বা বিকাশ দ্রুততর কিন্তু প্রকৃত মাথা পিছু আয়ের প্রবৃদ্ধি বা বিকাশ ততটা দ্রুত নয়। এটা বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত যে, মানব মুলধন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এর কার্যকারণ সম্পর্ক একই দিকে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ, উচ্চতর আয় উচ্চ

চিত্র 5.3 *: বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিক মানবশক্তি : মানব মূলধনের একটি মুখ্য উপাদান*

পর্যায়ের মানব মূলধনের নির্মাণ ঘটায় এবং বিপরীতভাবেও তা সত্য, তার মানে হল, উচ্চ পর্যায়ের মানব মূলধনও আয়ের বিকাশ ঘটায়।

ভারতবর্ষ অনেক আগেই অর্থনৈতিক বিকাশে মানব মুলধনের গুরুত্বকে স্বীকার করেছিল। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয় "যে-কোন উন্নয়ন কৌশলে, বিশেষ করে একটি দেশ যেখানে লোকসংখ্যা অধিক, সেখানে মানব সম্পদ উন্নয়নে (পড়তে হবে মানব মূলধন) খুব মহত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা লাভের পর একটা বিরাট সংখ্যক লোক অর্থনৈতিক বিকাশকে বলবান করতে এবং সমাজ পরিবর্তনকে একটি কাঙ্খিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে, নিজেই একটা সম্পদ হতে পারে।"

মানব মূলধনের (শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য) বিকাশ এবং অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে কারণ প্রভাব সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করা কঠিন কিন্তু 5.1 সারণীতে আমরা দেখতে পাই যে,

সারনি 5.1

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নতির সূচকগুলি চালচিত্র

বিবরণ		*1951*	*1981*	*1991*	*2001*	*2014-15*
প্রকৃত মাথাপিছু আয় (টাকায়)		7,651	12,174	15,748	23,095	72,900
অশোধিত মৃত্যুর হার (প্রতি 1,000 লোকে)		25.1	12.5	9.8	8.1	6.7
শিশুমৃত্যুর হার		146	110	80	63	37
জন্মের সময় কাঙ্ক্ষিত জীবনকাল (বছরে)	পুরুষ	37.2	54.1	59.7	63.9	67
	মহিলা	36.2	54.7	60.9	66.9	70
সাক্ষরতা হার (%)		16.67	43.57	52.21	65.20	76

এই ক্ষেত্রগুলি একসাথে বৃদ্ধি লাভ করেছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রের বিকাশ সম্ভবত অন্যান্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করেছে।

সম্প্রতিকালে, ভারতীয় অর্থনীতির উপর দুটি স্বতন্ত্র প্রতিবেদন সনাক্ত করেছে যে, মানব মূলধন গঠনের ক্ষমতার জন্য ভারত দ্রুতহারে বিকাশ লাভ করবে। জার্মানির একটি ব্যাংক, ডয়চে ব্যাংক তার বিশ্ব সমৃদ্ধি কেন্দ্র নামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে (01/07/2005 এ প্রকাশিত হয়েছিল) উল্লেখ করে যে ভারতবর্ষ 2020 এর মধ্যে চারটি মুখ্য সমৃদ্ধি কেন্দ্রের মধ্যে একটি হয়ে উঠবে। রিপোর্ট আরও উল্লেখ করে, ''আমাদের গবেষণামূলক অনুসন্ধান এই অভিমতকে সমর্থন করে যে বর্তমান অর্থনীতিতে মানব মূলধন হল উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। স্থূল দেশীয় উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধির জন্য মানব মূলধনের বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'' ভারতের প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করে, ''2005 ও 2020 এর মধ্যে আমরা প্রত্যাশা করি ভারতে 7 বছরের বেশি বয়সীদের শিক্ষার গড় হার বছরে 40 শতাংশ বৃদ্ধি পাবে...।''

চিত্র 5.4 *: সামনের কাজ : ভারত জ্ঞান অর্থনীতিতে রূপান্তর।*

সাম্প্রতিককালে একটি প্রতিবেদন 'ভারত এবং জ্ঞান, অর্থনীতি —উপজীব্য শক্তি ও সুযোগ' (Indian and the knowledge Economy- leveraging strenghts and opportunities)'-এ বিশ্বব্যাংক উল্লেখ করে যে ভারতের জ্ঞান অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হওয়া উচিত এবং সে যদি, আয়ারল্যান্ডের মতো তার জ্ঞানকে ব্যবহার করে (আয়ারল্যান্ড তার জ্ঞান অর্থনীতি খুব কার্যকরীভাবে ব্যবহার করে বলে মানা হয়), তবে ভারতের মাথাপিছু

বাক্স 5.2 : জ্ঞান অর্থনীতি হিসেবে ভারত

গত শতক ধরে ভারতীয় সফটওয়ার (Software) শিল্পে একটি উৎসাহজনক অগ্রগতি ঘটেছে। ভারত কিভাবে তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে, নিজেকে জ্ঞান-ভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করতে পারে এ ব্যাপারে উদ্যোক্তা, আমলা ও রাজনীতিবিদরা এখন তাদের মতবাদ ব্যক্ত করছেন। কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে গ্রামবাসীরা ই-মেইল ব্যবহার করছেন যা এই ব্যাপক পরিবর্তনকে উদাহৃত করে। একইভাবে, ই-প্রশাসনকে ভবিষ্যতের একটি পথ-প্রদর্শনকারী হিসেবে মানা হয়। তথ্য প্রযুক্তির সঠিক মূল্যায়ণ বর্তমান আর্থিক উন্নতির স্তরের উপর ভীষণভাবে নির্ভর করে। তোমরা কি মনে করো — গ্রামীণ এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সেবাগুলো মানব উন্নয়নে সক্ষম হবে? ব্যাখ্যা করো।

আয় 2002-এ 1000 মার্কিন ডলারের কিঞ্চিৎ বেশি থেকে বৃদ্ধি হয়ে 2020 এ 3000 মার্কিন ডলার হবে। বিশ্বব্যাঙ্ক আরও উল্লেখ করে যে, এই রূপান্তরের জন্য ভারতীয় অর্থনীতির সকল সহায়ক উপাদান রয়েছে। যেমন — দক্ষ শ্রমিকের বিশাল সমাহার, সক্রিয়ভাবে কার্যক্রম গণতন্ত্র এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিকাঠামো।

এভাবে এই দুটি প্রতিবেদনই নির্দেশ করে যে ভারতে আরও মানব মূলধনের গঠন তার আর্থিক সমৃদ্ধিকে আরও উচ্চস্তরে নিয়ে যাবে।

5.4 মানব মূলধন ও মানব উন্নয়ন

এই দুটি পরিভাষা একই মনে হলেও, এদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মানব মূলধন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে শ্রম উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একটি নিমিত্ত হিসেবে বিবেচনা করে। মানব উন্নয়ন এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য হল মানব উন্নতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কারণ, একমাত্র তখনই মানুষ পড়তে, লেখতে ও দীর্ঘ: সুস্থ জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। তখনই তারা অন্যান্য বিকল্প যা তারা মূল্যবান মনে করে, নির্বাচন করতে সক্ষম হয়। মানব মূলধন মানুষকেই কোন পরিণামের সাধন হিসেবে মনে করে; এই পরিণাম হল উৎপাদনের বৃদ্ধি। এই মতানুসারে, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেকোন বিনিয়োগ অলাভজনক হয়, যদি তা দ্রব্য এবং সেবার উৎপাদন বৃদ্ধি না করে। মানব উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ নিজেরাই পরিণত সম্পদ। মানব উন্নয়নকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ করে

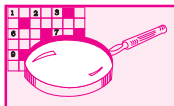

এটা সমাধান করো

যদি একজন নির্মাণ শ্রমিক, গৃহপরিচারিকা, ধোবি অথবা একজন বিদ্যালয়ের চাপরাশি অসুস্থতার জন্য যদি তার কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে, তবে এগুলির উপর কি প্রভাব পরে—— জানার চেষ্টা করো।

(ক) কর্মসুরক্ষা

(খ) মজুরি/বেতন

সম্ভাব্য কারণগুলো কী হতে পারে?

বাড়ানো উচিত যদি এই ধরনের উন্নয়ন উচ্চতর শ্রম উৎপাদনের পরিণতি বা ফল নাও দিতে পারে। সুতরাং শ্রম উৎপাদনে অবদান ছাড়াও, প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যের একটি আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। এই মতানুসারে, প্রত্যেকেরই প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিসেবা পাওয়ার অধিকার আছে। অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেক সদস্যেরই স্বাক্ষর হওয়ার ও সুস্থ জীবন কাটানোর অধিকার আছে।

5.5 ভারতে মানব মূলধন গঠনের অবস্থা

এই অংশে আমরা ভারতে মানব মুলধন গঠন বিশ্লেষণ করতে যাচ্ছি। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে মানব মুলধন গঠন হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মরত প্রশিক্ষণ, স্থানান্তকরণ এবং তথ্যে বিনিয়োগের উৎপাদন। এগুলোর মধ্যে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য হল মানব মুলধন গঠনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আমরা জানি যে, আমাদের দেশ যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশ যেখানে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় সরকার (পৌরনিগম, পৌরসভা এবং গ্রাম পঞ্চায়েত)। ভারতীয় সংবিধানে এই প্রত্যেক সরকারের কাজগুলোর কথা উল্লেখ আছে। অনুরূপভাবে, এই তিন স্তরের সরকারই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এই দুই ক্ষেত্রে ব্যয়ভার বহন করে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বিস্তৃত বিশ্লেষণ অষ্টম অধ্যায়ে করা হয়েছে তাই, এখানে কেবলমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রের বিশ্লেষণ করা হবে।

তোমরা কি জান, ভারতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কে দেখাশোনা করে? ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রের বিস্তৃত বিশ্লেষণের আগে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিচার করে দেখব। আমরা অবশ্যই জানি যে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিসেবা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় লাভেরই সৃষ্টি করে, আর এটাই হল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিসেবার বাজারে ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের কারণ। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যয় একটা দীর্ঘকালীন মহত্বপূর্ণ প্রভাব তৈরি করে এবং এগুলিকে সহজে বদলানো যায় না। তাই, সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশুকে যদি কোন একটি বিদ্যালয়ে কিংবা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ভর্তি করানো হয় যেখানে প্রয়োজনীয় পরিসেবা সরবরাহ করা হয়নি— এক্ষেত্রে শিশুটিকে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার আগেই, তার বড়োসড়ো ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। অধিকন্তু, এই ধরনের পরিসেবার স্বতন্ত্র ভোক্তাদের কাছে পরিসেবাগুলোর গুণগ মান ও খরচ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য নেই। এই পরিস্থিতিতে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদানকারীরা একচেটিয়া ক্ষমতা অর্জন করে এবং শোষণে লিপ্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে সরকারের ভূমিকা হল— যাতে এই পরিসেবাগুলির বেসরকারি সরবরাহকারীরা সরকার নির্ধারিত মান বজায় রাখে এবং সঠিক দাম নেয় — তা সুনিশ্চিত করা।

ভারতে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বিভাগ ও বিভিন্ন সংস্থা যেমন ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (NCERT), ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন (UGC) এবং অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল এডুকেশন (AICTE) শিক্ষা ক্ষেত্রের অন্তর্গত। একইভাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য বিভাগ এবং বিভিন্ন সংস্থাগুলো যেমন — ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR)— স্বাস্থ্যক্ষেত্রের অন্তর্গত।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে একটা বিরাট অংশের লোক দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে, আমাদের অনেকেই প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার

সুবিধা ভোগ করতে পারে না। অধিকন্তু, আমাদের লোকসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অত্যাধুনিক, স্বাস্থ্যসেবা ও উচ্চ-শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে পারে না। তা সত্ত্বেও, প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবাকে যখন জনগণের অধিকার হিসাবে মানা হয়, তাই উপযুক্ত নাগরিকদের এবং সামাজিকভাবে নিপীড়িত শ্রেণিদের বিনামূল্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদান করা উচিত। শত শতাংশ সাক্ষরতা ও ভারতীয়দের গড় শিক্ষা বিষয়ক প্রাপ্তিতে পূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য এই উভয় সরকারই বিগত কয়েক বছর ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধি করছে।

এইগুলো করো

NCERT, UGC, AICTE, ICMR - এর উদ্দেশ্য এবং কাজগুলো নিরূপণ করো।

5.6 ভারতে শিক্ষা ক্ষেত্র

শিক্ষায় সরকারি ব্যয়ের বিকাশ : তোমরা কি জান শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকার কত ব্যয় করে? সরকার কর্তৃক এই ব্যয় দুভাবে প্রকাশ করা হয় — (ক) মোট সরকারি ব্যয়ের শতকরা হিসেবে, (খ) মোট স্থুল অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) শতকরা হিসেবে। মোট সরকারি ব্যয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়ের শতকরা, সরকারি প্রকল্পে শিক্ষার গুরুত্বকে নির্দেশ করে। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) মধ্যে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের শতকরা প্রকাশ করে, আমাদের আয়ের কত অংশ দেশের শিক্ষার উন্নতিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 1952-2014 এই সময়কালে মোট সরকারি ব্যয়ের শিক্ষাখাতে ব্যয়ের শতকরা পরিমাণ 7.92 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 15.7 হয় এবং GDP-র শতকরা পরিমাণ 0.64 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 4.13 হয়। এই সময়কালব্যাপী, শিক্ষাখাতে ব্যয়ের বৃদ্ধি সমান নয় বরং সেখানে অনিয়মিতভাবে বৃদ্ধি এবং হ্রাস হয়েছে। এর সাথে আমরা যদি স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং পরোপকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যয়িত বেসরকারি ব্যয় যুক্ত করি, তবে শিক্ষাখাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশি হবে।

মোট শিক্ষা ব্যয়ের একটি বিশাল অংশ প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যায়িত হয় এবং উচ্চতর/তৃতীয় শিক্ষাখাতে (উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠান যেমন মহাবিদ্যালয়, পলিটেকনিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়) এই অংশ সামান্যতম। যদিও সরকার উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে গড়ে কম ব্যয় করে, শিক্ষার্থী প্রতি ব্যয়ের' পরিমাণ প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রে অধিক হয়। এর অর্থ এই নয় যে, আর্থিক উৎসগুলিকে উচ্চতর শিক্ষা থেকে প্রাথমিক শিক্ষার দিকে স্থানান্তরিত করতে হবে। যেই আমরা বিদ্যালয় শিক্ষার বিস্তার করব, আমাদের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আরও অধিক শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। তাই, শিক্ষার সমস্ত স্তরে ব্যয় বৃদ্ধি করা উচিত।

2014-15তে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রতি মাধাপিছু সরকারি ব্যয়ে রাজ্যগুলির মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেখানে হিমাচল প্রদেশে ব্যয়ের অঙ্কে 34,651 টাকা, বিহারে তা মাত্র 4088 টাকা। এরফলে শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে ও শিক্ষা বিষয়ক উপলব্ধির ক্ষেত্রে রাজ্যগুলোর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

শিক্ষা ব্যয়ে অপ্রতুলতা সম্বন্ধে একজন বুঝতে পারবে যদি আমরা বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশ করা শিক্ষা ব্যয়ে কাঙ্খিত স্তরের সাথে তাকে তুলনা করি।

চিত্র 5.5 : *শিক্ষা পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ অনিবার্য।*

প্রায় 50 বছর আগে শিক্ষা কমিশন (1964 - 66) সুপারিশ করেছিল যে কমপক্ষে GDP এর 6 শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে হবে যাতে করে শিক্ষা বিষয়ক সাফল্য বৃদ্ধির হার বা উন্নতির হার উল্লেখযোগ্য হয়। 1988 সালে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত তাপস মজুমদার কমিটি, 6 - 14 বছরের সমস্ত ভারতীয় শিশুদের 10 বছরে (1998-99 থেকে 2006-07) বিদ্যালয় শিক্ষার আওতায় আনতে প্রায় 1.37 লক্ষ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্ধ করার কথা উল্লেখ করেন। শিক্ষাখাতে GDP-র কাঙ্খিত 6 শতাংশ ব্যয় স্তরের তুলনায় বর্তমান স্তর 4 শতাংশের কিছুটা উপরে যা সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ত। নীতিগতভাবে 6 শতাংশের লক্ষ্যে পৌঁছানো প্রয়োজন ---এটাকে আগামী বছরগুলির জন্য অবশ্যম্ভাবী হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 2009 সালে, ভারত সরার 6-14 বছরের শিশুদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষাকে তাদের মৌলিক অধিকারে পরিণত করার জন্য শিক্ষা অধিকার আইন প্রণয়ন করে।

ভারত সরকার সমস্ত কেন্দ্রীয় করের উপর 2 শতাংশ শিক্ষা উপকর (Education Cess) আরোপ করতে শুরু করে। শিক্ষা উপকর থেকে প্রাপ্ত আয় প্রাথমিক

এইগুলো করো

বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিদ্যালয়ছুট শিক্ষার্থীদের নমুনা সমীক্ষা করো, যেমন ---

ক) প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়ছুট শিক্ষার্থী।

খ) অষ্টম শ্রেণিতে বিদ্যালছুট শিক্ষার্থী।

গ) দশম শ্রেণিতে বিদ্যালয়ছুট শিক্ষার্থী।

কারণগুলো নির্ধারণ করো এবং শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো।

'বিদ্যালয়ছুট শিক্ষার্থীরা শিশু শ্রমের দিকে ধাবিত হয়'। আলোচনা করো কীভাবে তা মানব মূলধনের জন্য একটা ক্ষতি।

সারণি 5.2

ভারতে শিক্ষা বিষয়ক অর্জন

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	*1990*	*2000*	*2015*
1.	বয়স্ক সাক্ষরতা হার (15 থেকে অধিক বয়স্ক লোকের শতাংশ)			
	1.1 পুরুষ	61.9	68.4	81
	1.2 মহিলা	37.9	45.4	63
2.	প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণতার হার (প্রাসঙ্গিক বয়স্ক গোষ্ঠীর শতাংশ)			
	2.1 পুরুষ	78	85	94
	2.2 মহিলা	61	69	99
3.	যুব সাক্ষরতার হার (15 থেকে 24 বছর বয়স্ক লোকের শতাংশ)			
	3.1 পুরুষ	76.6	79.7	92
	3.2 মহিলা	54.2	64.8	87

শিক্ষাখাতে ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ করা হয়। অধিকন্তু, সরকার উচ্চতর শিক্ষার উন্নতির জন্য এবং ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষার অনুবর্তী হওয়ার জন্য নতুন ঋণ প্রকল্পে একটা বিশাল ব্যয় মঞ্জুর করে।

ভারতে শিক্ষা বিষয়ক অগ্রগতি : সাধারণত একটি দেশের শিক্ষাগত অগ্রগতি বয়স্ক সাক্ষরতা স্তর, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণতার হার ও যুব সাক্ষরতা হারের দ্বারা নির্দেশিত হয়। গত দুই দশকের চিত্র পরিসংখ্যান সারণি 5.2তে দেখানো হল।

5.7 ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

সবার জন্য শিক্ষা — এখনো একটা দূরবর্তী স্বপ্ন : বয়স্ক এবং একই সাথে যুবকদের স্বাক্ষরতার হার যদিও বেড়েছে, তবুও ভারতে নিরক্ষরের সংখ্যা ততটাই রয়ে গেছে যতটা স্বাধীনতার সময় ভারতের লোকসংখ্যা ছিল। 1950 সালে যখন সাংবিধানিক পরিষদ কর্তৃক ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হয়, তখন সংবিধানের নীতি নির্দেশনায় এটা উল্লেখ করা

চিত্র 5.6 *: বিদ্যালয়ছুটরা শিশুশ্রমের দিকে ধাবিত হয় ঃ মানব মূলধনের এক বিরাট ক্ষতি।*

হয়েছিল যে, সংবিধান কার্যকর হওয়ার 10 বছরের মধ্যে সরকারকে 14 বছর পর্যন্ত সমস্ত শিশুদের বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা যদি তা অর্জন করতে পারতাম, তবে এখন আমাদের সাক্ষরতার হার 100 শতাংশ থাকত।

লিঙ্গ সমতা- আগের থেকে ভালো : মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতা হারের পার্থক্য কমছে যা লিঙ্গ সমতার মধ্যে একটি ধনাত্মক উন্নতিকে সূচিত করে। তবুও বিভিন্ন কারণে ভারতে নারী শিক্ষার অগ্রসর ঘটানো অপরিহার্য যেমন— আর্থিক স্বাধীনতার উন্নতিসাধন এবং মহিলাদের সামাজিক পদমর্যাদার জন্য এবং মহিলা শিক্ষা মহিলাদের প্রজনন হার ও মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার উপর উপকারী প্রভাব তৈরি করে। অতএব, সাক্ষরতা হারের উর্ধ্ব সঞ্চালন নিয়ে আমরা আত্মতুষ্ট থাকতে পারি না। একশত শতাংশ বয়স্ক সাক্ষরতা হার অর্জনের জন্য আমাদের অনেক মাইল যেতে হবে।

চিত্র 5.7 *: উচ্চতর শিক্ষা ঃ কম প্রাপ্তকারী*

উচ্চতর শিক্ষা — গ্রহণকারী কম : ভারতীয় শিক্ষার পিরামিড খাড়া যা সূচিত করে খুবই কম সংখ্যক লোক উচ্চতর শিক্ষা স্তরে পৌঁছায়। অধিকন্তু, শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্বের স্তর সর্বোচ্চ NSSO এর তথ্য অনুযায়ী, 2011-12 সালে, গ্রামীণ এলাকায় যুবক পুরুষরা যারা স্নাতক বা তার উপর অধ্যয়ন করেছে তাদের মধ্যে বেকারত্বের হার 19 শতাংশ। শহর এলাকায় অনুরূপ ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারত্বের হার তুলনামূলকভাবে কম এবং তা 16 শতাংশ। সবচেয়ে বেশি গভীরভাবে প্রভাবিতরা ছিল গ্রামীণ এলাকার স্নাতক যুবতীরা, তাদের প্রায় 30 শতাংশ বেকার। বিপরীতে, গ্রামীণ ও শহর এলাকায় প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষিত যুবক বা যুবতীদের কেবলমাত্র 3-6 শতাংশ বেকার। তাই সরকারকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান বৃদ্ধি করা উচিত যাতে করে শিক্ষার্থীদের নিয়োগের যোগ্য দক্ষতা, ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রদান করতে পারে। যখন স্বল্প শিক্ষিত লোকদের সাথে তুলনা করা হয়, দেখা যায় শিক্ষিত লোকের একটা বিরাট অংশ বেকার। কেন?

5.8 উপসংহার

মানব মূলধন গঠন ও মান উন্নয়নের আর্থিক ও সামাজিক সুবিধার সাথে সবাই পরিচিত। ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ করছে। সমাজের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিসেবার বিস্তার নিশ্চিত করতে হবে যাতে করে অর্থনৈতিক বিকাশ ও সমতার লক্ষ্যে একসাথে উপনীত হওয়া যায়। পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত মানবশক্তির সমৃদ্ধ সম্ভার রয়েছে ভারতবর্ষে। এখন প্রয়োজন হল এর গুণগত মানের উন্নতি করা এবং এমন ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করা যাতে করে এগুলোকে আমাদের দেশে পর্যাপ্তভাবে প্রয়োগ করা যায়।

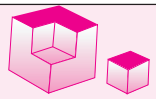

সংক্ষিপ্তবৃত্তি

➢ শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ মানুষকে মানব মূলধনে রূপান্তরিত করে, মানব মুলধন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শ্রম উৎপানের প্রতিনিধিত্ব করে, যা একটি অর্জিত ক্ষমতা এবং স্বেচ্ছাকৃত বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের পরিণাম যেখানে প্রত্যাশা থাকে যে, এটা ভবিষ্যতের আয় উৎসের বৃদ্ধি ঘটাবে।

➢ শিক্ষা, কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, স্থানান্তরণ ও তথ্যে বিনিয়োগ— এগুলো মানব মূলধন গঠনের উৎস।

➢ ভৌত মূলধনের ধারনাই হল মানব মুলধন গঠনের ভিত্তি। এই দু-ধরনের মূলধন গঠনের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য আছে।

➢ মানব মূলধন গঠনে বিনিয়োগকে কার্যকর এবং বিকাশ বৃদ্ধিকারক হিসেবে মনে করা হয়।

➢ মানব উন্নয়ন এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মানব কল্যাণে অবিচ্ছেদ্য, কারণ যখন লোক লেখা এবং পড়ার ক্ষমতা লাভ করে, দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কাটানোর সামর্থ্য লাভ করে, একমাত্র তখনই তারা অন্যান্য বিকল্পগুলি নির্বাচন করতে সক্ষম হবে যেগুলোকে তারা গুরুত্ব দেয়।

➢ মোট সরকারি ব্যয়ে, শিক্ষাখাতে ব্যয়ের শতাংশ সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষার গুরুত্বকে নির্দেশ করে।

অনুশীলনী

1. কোন দেশের মানব মূলধনের দুটি প্রধান উৎস কী কী?
2. একটি দেশের শিক্ষাগত সাফল্য নির্ধারণের নির্দেশকগুলো কী কী?
3. ভারতে শিক্ষা অর্জনে আঞ্চলিক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় কেন?
4. মানব মূলধন ও মানব উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্যগুলো দেখাও।
5. মানব উন্নয়ন কীভাবে, মানব মূলধনের তুলনায় একটি বিস্তৃত শব্দ?
6. মানব মূলধন গঠনে কোন উপাদানগুলি অবদান রাখে?
7. সরকারি সংস্থাগুলো কিভাবে ভারতে বিদ্যালয় ও হাসপাতালের সুবিধা উপলব্ধ করায়?

8. শিক্ষাকে একটি রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভরণ হিসেবে মানা হয়। কীভাবে?

9. নিম্নলিখিতগুলোকে মানব মূলধন গঠনের উৎস হিসেবে আলোচনা করো ঃ-

   ক) স্বাস্থ্য পরিকাঠামো।

   খ) স্থানান্তরণে ব্যয়।

10. মানব সম্পদের কার্যকরী ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য অর্জনের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করো।

11. মানব মূলধনে বিনিয়োগ কীভাবে বিকাশে অবদান রাখে।

12. 'পৃথিবীব্যাপী গড় শিক্ষার স্তর বাড়ার সাথে অসমতার ক্ষেত্রে একটি নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যায়'— মন্তব্য করো।

13. একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

14. কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা বিকাশকে উদ্দীপ্ত করে— ব্যাখ্যা করো।

15. একজন ব্যক্তির জন্য কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তাগুলি ব্যক্ত করো।

16. মানব মূলধন এবং আর্থিক সমৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্কটি অনুসন্ধান করো।

17. ভারতে মহিলা শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো।

18. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন ধরনের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তি দাও।

19. ভারতে মানব মুলধন গঠনের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাগুলি কী কী?

20. তোমাদের মত অনুসারে, সরকারের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য প্রদেয় অর্থের কাঠামো ঠিক করোার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি? যদি থাকে তবে কেন?

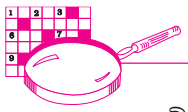

প্রস্তাবিত অতিরিক্ত কার্যাবলি

1. কীভাবে মানব উন্নয়ন সূচক গণনা করা হয় তা নির্ধারণ করো। বিশ্ব মানব উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান কী?
2. ভারত কি নিকট ভবিষ্যতে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি হতে যাচ্ছে? শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করো।
3. সারণি ৫.২-তে দেওয়া তথ্য ব্যাখ্যা করো।
4. একজন শিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষার ক্ষেত্রে তোমার অবদান কী হবে? ব্যাখ্যা করো, প্রত্যেকে একজনকে শিক্ষা দাও।

5. বিভিন্ন উৎসগুলি লিপিবদ্ধ করো যেগুলি শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং শ্রম সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে।
6. কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বার্ষিক প্রতিবেদন পড় এবং সারাংশ তৈরি করো।

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় (Economic Survey), সামাজিক বিভাগের উপর অধ্যায়গুলো পড়ো।

REFERENCES

Books

BECKER, GARY S. 1964. *Human Capital.* 2nd Edition, Columbia University Press, New York.

FREEMAN, RICHARD. 1976. *The Overeducated American.* Academic Press, New York.

SIDDHARTHAN, N.S. AND K. NARAYANAN (Eds.). 2013. *Human Capital and Development — The Indian Experience.* Springer, New Delhi.

Government Reports

India Human Development Report 2011: Towards Social Inclusion, Planning Commission, Government of India.

Educational Statistics At a glance, Ministry of Human Resource Development, (for various years), Government of India.

Annual Reports, Ministry of Human Resource Development, Government of India.

Websites

http://epathshala.nic.in
www.education.nic.in
www.cbse.nic.in
www.ugc.ac.in
www.aicte.ernet.in
www.ncert.nic.in
www.finmin.nic.in
www.mospi.nic.in
http://nroer.gov.in

6

গ্রামোন্নয়ন

এই অধ্যায় পাঠ করে তোমরা সক্ষম হবে —

- গ্রামোন্নয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে এবং গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কিত মুখ্য বিষয়গুলো উপলব্ধি করতে।
- ভারতের সামগ্রিক উন্নয়নে গ্রামোন্নয়ন যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা অনুধাবন করতে।
- গ্রামীণ উন্নয়নে ঋণের সংস্থান এবং পণ্য সামগ্রীর বিপনন ব্যবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা উপলব্ধি করতে।
- স্থিতিশীল জীবিকা উপার্জনের জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার বৈচিত্রকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে।
- স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য জৈব চাষের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে।

"যারা জমিতে চাষ করে তারাই শুধুমাত্র নিজেদের অধিকারে বাঁচে। বাকি সবাই তাদের দয়ার রুটি খেয়ে বাঁচে।"

— থিরুবলুভার

6.1 ভূমিকা

চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা পড়েছি যে দারিদ্র ভারতের সামনে মস্ত বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এটাও জানতে পেরেছি যে দেশের অধিকাংশ গরিব মানুষ গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে যাদের জীবনধারণের জন্য প্রাথমিক অত্যাবশ্যকীয় উপকরণগুলি পাওয়ার সামর্থ নেই। গ্রামীণ ক্ষেত্রে কৃষিই হল জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়। মহাত্মা গান্ধির কথায়, ভারতের প্রকৃত উন্নয়নের প্রাক শর্ত হল গ্রাম ভারতের বিকাশ। কেবলমাত্র শহরের শিল্প কেন্দ্রগুলোর বৃদ্ধি ও প্রসারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে প্রকৃত উন্নয়ন অধরাই থাকবে। বর্তমান সময়েও এই ধরণা প্রাসঙ্গিক যে, দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন প্রক্রিয়া গ্রামোন্নয়নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এইরকম হয় কেন? কেন আমরা গ্রামোন্নয়নকে এতটা গুরুত্ব দিচ্ছি যখন আমরা আমাদের চারপাশের দ্রুত বিকাশমান শহরগুলোতে বিশাল আকৃতির শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির কেন্দ্রগুলোকে গড়ে উঠতে দেখছি। এর কারণ হল, ভারতের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি লোক এখনও কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও কৃষি দেশবাসীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যের সংস্থান করার মত উৎপাদনশীল হয়নি। গ্রাম ভারতের এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা এখনও চরম দারিদ্রে ডুবে রয়েছে। এই কারণেই ভারতের প্রকৃত উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণে সমৃদ্ধ গ্রাম ভারত নির্মাণ করতে হবে। এখন তাহলে দেখতে হবে গ্রামোন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?

6.2 গ্রামোন্নয়ন কী?

'গ্রামোন্নয়ন' হল ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। গ্রামোন্নয়ন মূলত গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থার সেই সকল ক্ষেত্রের উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করে যে ক্ষেত্রগুলো গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। গ্রাম ভারতের কিছু কিছু ক্ষেত্র যেগুলি সমস্যা সঙ্কুল সেই ক্ষেত্রগুলিতে নতুনভাবে গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সেগুলো হল —

- সাক্ষরতা, বিশেষভাবে নারী সাক্ষরতা, শিক্ষা এবং দক্ষতার বিকাশ।
- স্বাস্থ্য, যার মধ্যে স্বচ্ছতা এবং জনস্বাস্থ্য দুটিই সামিল রয়েছে।
- ভূমি সংস্কার
- প্রত্যেকটি স্থানীয় উৎপাদনশীল সম্পদের উন্নয়ন
- পরিকাঠামো উন্নয়ন, যেমন- বিদ্যুৎ, সেচ, ঋণ, বিপনন, পরিবহণ সুবিধা- গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ এবং তার সাথে নিকটবর্তী মহাসড়কের সাথে সংযোগসাধন এবং শাখা সড়ক নির্মাণ, কৃষি গবেষণা এবং গবেষণা সম্প্রসারণের সুবিধা এবং তথ্য বিতরণের সুবিধা।
- দারিদ্র দূরীকরণ এবং দুর্বলতর অংশের মানুষের জীবনধারনের মানের উন্নতিসাধনে বিশেষ ব্যবস্থা যা উৎপাদনশীল রোজগারের সুযোগ বাড়ায়।

এর অর্থ হচ্ছে, গ্রামীণ ক্ষেত্রে যে মানুষগুলো কৃষি ও অ-কৃষি কাজে নিযুক্ত তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করা দরকার। অ-কৃষি উৎপাদনশীল কাজকর্ম যারমধ্যে রয়েছে — খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সুলভ স্বাস্থ্য সুবিধা, গৃহে ও কর্মস্থলে স্বচ্ছতা, শিক্ষার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দ্রুত গ্রামীণ

উন্নয়ন ঘটবে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখা গেছে যে, জিডিপি-তে কৃষিক্ষেত্রের অবদান কমেছে। কিন্তু কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার কোনো বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। অধিকন্তু, অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রম শুরু করার পর, কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধি, 1991 থেকে 2012 পর্যন্ত সময়কালে, বার্ষিক ও শতাংশ হারে হ্রাস পায়। বৃদ্ধির এই হার পূর্ববর্তী বছরগুলির বৃদ্ধির হারের চাইতে কম। বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ 1991 সালের পর থেকে হ্রাস পাওয়ার জন্যই বৃদ্ধির হারে এই পতন হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য অনুসারে, অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো, শিল্প ও সেবাক্ষেত্রে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়া, অনিয়মিত রোজগারের বৃদ্ধির ফলে গ্রামোন্নয়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়েছে। এই কারণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে দুর্দশা দিন দিন বাড়তে থাকে। 2007 থেকে 2012 পর্যন্ত সময়কালে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল 3.2 শতাংশ। এই প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ ভারতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক যেমন — ঋণ ও বিপণন ব্যবস্থা, কৃষির বৈচিত্রকরণ এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে জৈব কৃষির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার দিকে বিশেষ নজর দেব।

এইগুলো করো

- তোমার অঞ্চলের খবরের কাগজ পড়ে মাসিক ভিত্তিতে কাগজে প্রকাশিত গ্রামাঞ্চলের সমস্যাগুলি এবং সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থাগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলোকে চিহ্নিত করো। তুমি নিকটবর্তী একটি গ্রাম পরিদর্শন করো। গ্রামের লোকেরা যে যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তা চিহ্নিত করো। তোমার শ্রেণীকক্ষে এনিয়ে আলোচনা করো।
- সরকারি ওয়েবসাইট http://www.rural.nic.in থেকে ইদানীংকালে শুরু হওয়া প্রকল্পসমূহ এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য তালিকাবদ্ধ করো।

6.3 গ্রামীণ ক্ষেত্রে ঋণ ও বিপণন

ঋণ : গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থার সমৃদ্ধি প্রাথমিকভাবে নির্ভর করে পুঁজির অনুপ্রবেশের উপর যা কৃষি ও অ-কৃষি ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ফলন পাকার পর তা বিক্রি করে কৃষকের হাতে আসা পর্যন্ত সময়টা অনেক দীর্ঘ। এইজন্য চাষের বিভিন্ন সময়ের খরচের সংস্থান করতে কৃষকদের বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ নিতে হয়। বীজ ক্রয়, রাসায়নিক সার ক্রয় ইত্যাদির জন্য কৃষককে বিনিয়োগ করতে হয়। এছাড়াও পারিবারিক ব্যয়ের সংস্থান করতে যেমন - বিবাহ, মৃত্যু, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কৃষককে অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। আর এর জন্য প্রয়োজন হয় ঋণের। স্বাধীনতার সময়কালে গ্রামীণ মহাজন ও ব্যবসায়ীরা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং ভূমিহীন শ্রমিকদের উচ্চ সুদের হারে ঋণ দিত। মহাজন ও ব্যবসায়ীরা ঋণের হিসেবের খাতায়ও কারচুপি করত। এইভাবে তারা কৃষকদের শোষণ করত। ঋণ প্রক্রিয়াটি মহাজনদের কুক্ষিগত থাকায় কৃষকরা ঋণের ফাঁদে আটকে পড়ত। ঋণের বেড়াজাল থেকে কৃষকদের মুক্ত করতে এবং গ্রামীণ ঋণের সরবরাহকে সুনিশ্চিত করতে 1969 সালের পর ভারত সরকার সামাজিক ব্যাংক ব্যবস্থার পত্তন করে এবং বহুবিধ ঋণ সরবরাহকারী সংস্থা স্থাপন করে। পরবর্তীকালে 1982 সালে জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (সংক্ষেপে NABARD) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ব্যাঙ্ক হল সমগ্র গ্রামীণ আর্থিক সংস্থাগুলির কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য এক শীর্ষ সংস্থা।

বাক্স 6.1 : গরিব মহিলাদের ব্যাঙ্ক

'কুটুম্বশ্রী' হল গোষ্ঠীভিত্তিক মহিলা পরিচালিত সংস্থা। এই সংস্থা কেরালাতে দারিদ্র দূরীকরণের কাজে লিপ্ত। 1995 সালে সঞ্চয়কে উৎসাহিত করতে ব্যয় সাশ্রয়ী গরিব মহিলাদের জন্য সঞ্চয়ী ব্যাংক স্থাপন করা হয়। ছোটো ছোটো ঋণ সমিতিগুলোও এই ব্যাংক স্থাপনে অংশ গ্রহণ করে। এই ঋণ সমিতিগুলো ছোটো ছোটো সঞ্চয় একত্রিত করে এক কোটি টাকা পর্যন্ত সঞ্চয় জমা করে। ব্যাংকটি এখন সদস্য সংখ্যা এবং সঞ্চয় সংগ্রহের নিরিখে এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রথাবহির্ভূত ব্যাংক হিসাবে সমাদৃত।

উৎস ঃ-www.kudumbashree.com। তুমি এই ওয়েবসাইট থেকে ব্যাংকের অন্যান্য উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে পারবে। তুমি কি ব্যাংকের সাফল্যের পেছনের কারণগুলোকে চিহ্নিত করতে পারো?

সবুজ বিপ্লব গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। সবুজ বিপ্লব গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থায় বৈচিত্র এনেছিল এবং একে উৎপাদনমুখী ঋণে রূপান্তরিত করেছিল। আজকের দিনে ভারতের গ্রামীণ ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানটি গঠনের বৈশিষ্ট্য হল, একাধিক সহায়ক-সংস্থার উপস্থিতি। এই সহায়ক সংস্থাগুলি হল — বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকসমূহ, কো-অপারেটিভ ও জমি উন্নয়ন ব্যাংক। এই ব্যাংকগুলি কম সুদে পর্যাপ্ত ঋণ প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইদানীংকালে স্ব-সহায়ক গ্রুপগুলি প্রথাগত ঋণ ব্যবস্থার ফাঁক ফোঁকর পূরণের কাজে নিয়োজিত হয়েছে। প্রথাগত ঋণ যোগানের কার্যপদ্ধতি কেবলমাত্র যে অপ্রতুল তাই নয়। এটি গ্রামাঞ্চলের সকল সামাজিক সম্প্রদায়কে সংহত করে উন্নয়নের দৌড়ে সামিল করতে পারেনি বলেই স্ব-সহায়ক সংস্থাগুলিকে এই ঘাটতি পূরণের কাজে সামিল হতে হয়েছে। যেহেতু ব্যাংকের ঋণ পেতে অতিরিক্ত জামানতের প্রয়োজন হয় তাই স্বাভাবিকভাবে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ দরিদ্র পরিবার ঋণের জালের আওতার বাইরে থাকে। তাদের ঋণ গ্রহণের সুযোগই থাকে না। স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমাগুলোকে একত্রিত করে তা থেকে সদস্যদের প্রয়োজনে ঋণ দেওয়া হয়। এই ঋণ ছোট ছোট সহজ কিস্তিতে কম সুদের হারে প্রদান করা হয়। 2003 সালের মার্চ মাস সময় পর্যন্ত সাত লক্ষেরও অধিক স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী ঋণ প্রদানের কাজ করে চলছে। এই ঋণ ব্যবস্থা অতি ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম নামে পরিচিত। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি মহিলাদের ক্ষমতায়নে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে

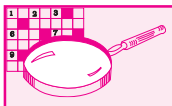

এইগুলো করো

➢ তোমার আশে-পাশের এলাকায় দেখতে পাবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলো ঋণ দিচ্ছে। এইরকম স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করো। এই সংস্থায় কার্যকলাপের একটি বিবরণ তৈরি করো। এই বিবরণে উল্লেখ করো- এটি কখন স্থাপিত হয়েছে। এর সদস্যসংখ্যা কত, সঞ্চয়ের পরিমাণ কত, কিভাবে ঋণ প্রদান করে এবং ঋণগ্রহীতারা কিভাবে ঋণ ব্যবহার করে।

➢ তুমি এমনও দেখতে পাবে যে স্বনিযুক্তির জন্য গৃহীত ঋণের ব্যবহার কিছু লোক অন্য কাজে লাগাচ্ছে। এই রকম কিছু ঋণগ্রহীতার সাথে কথাবার্তা বলো। তাদের স্বনিযুক্তির কার্যকলাপ আরম্ভ না করার কারণ চিহ্নিত করো এবং তা শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করো।

একটা অভিযোগ রয়েছে যে, এই ঋণের অর্থ মূলত ভোট প্রক্রিয়ায় ব্যয় করা হয়। কেন উৎপাদনশীল প্রক্রিয়ায় এই ঋণ লাগানো হচ্ছে না?

গ্রামীণ ব্যাংকিং - একটি আলোচনাত্মক মূল্যায়ন (Rural Banking- a critical Appraisal)

ব্যাংক ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার কৃষি এবং অকৃষি উৎপাদন, আয় এবং রোজগারের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিশেষত সবুজ বিপ্লবের পর কৃষককে ঋণদান এবং নানাবিধ সুবিধা দানের মধ্য দিয়ে উৎপাদনের প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা করেছে। দুর্ভিক্ষের যুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। এর প্রতিফলন ঘটছে খাদ্যশস্যের উপচে পড়া মজুত ভাণ্ডারের চিত্রে। কিন্তু এখনও আমাদের ব্যাংক ব্যবস্থার সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে উঠেনি।

সম্ভবত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্যান্য প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে আমানত জমার সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে পারেনি। যোগ্যব্যক্তির কাছে ঋণ প্রদান এবং কার্যকরী ঋণ আদায়ের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারেনি। লাগাতর কৃষির অনাদায়ী ঋণের হার বেড়ে চলেছে। কৃষকরা কেন ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হয়? এরকম একটা অভিযোগ রয়েছে যে কৃষকরা ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ পরিশোধ করতে চায় না। এর কারণ কী?

এই কারণেই গ্রামীণ ব্যাংকিং-এর বিস্তৃতি এবং প্রসার, সংস্কারের পর কমে গেছে। পরিস্থিতির উন্নতিতে ব্যাঙ্কের কার্য প্রণালীর অভিমুখ পরিবর্তন প্রয়োজন যাতে করে কেবল ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতার মধ্যে এক সেতুবন্ধন রচিত হয়। কৃষকদের মধ্যে ব্যয় সংকোচন অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে যাতে করে তারা আর্থিক সম্পদের কার্যকরী ব্যবহারের প্রয়োগকে উৎসাহিত করতে পারে।

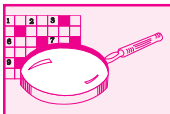

এইগুলো করো

➢ যদি তুমি গ্রামীণ এলাকায় বসবাস কর, তবে সম্ভবত তুমি আশেপাশে এমন কোন দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল অথবা যা তুমি দুরদর্শন বা সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিগত কয়েক বছর ধরে কৃষকদের আত্মহত্যা করার ঘটনার সাথে পরিচিত অবশ্যই হয়েছ। অধিকাংশ কৃষকই কৃষিকাজ বা অন্য প্রয়োজনে ঋণ নিয়েছে। ফসল ভালো না হয়া বা নষ্ট হওয়ার কারণে, আয় স্বল্পতার কারণে এবং বিকল্প রোজগারের সুযোগ না থাকায় সেই ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে। তাই তারা এমন চরম পদক্ষেপ নিয়েছে। এই ধরনের ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করো।

➢ গ্রামীণ এলাকায় পরিষেবা প্রদানকারী ব্যাংকে যাও। এটি প্রাথমিক কৃষি সমবায় ব্যাংক, ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক অথবা জেলা সমবায় ব্যাংকও হতে পারে। তাদের কাছ থেকে কতটি গ্রামীণ পরিবার ঋণ নিয়েছে, কত টাকা ঋণ নিয়েছে, কী ধরনের বন্ধক ব্যবহার হয়েছে, সুদের হার কত এবং এখন পর্যন্ত অনাদায়ী ঋণ কত রয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করো।

➢ যে কৃষক সমবায় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে, যদি সে ফসল নষ্ট হওয়া বা অন্য কারণে ঋণ পরিশোধ করতে না পারে তবে তার ঋণ মুকুব করে দেওয়া উচিত হবে, না হলে কৃষক আত্মহত্যা করার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তুমি কি এর সাথে একমত! আলোচনা করো।

6.4 কৃষি বিপণন ব্যবস্থা

তুমি কি কখনো ভেবেছ, যে খাদ্যশস্য, ফল, সবজি, রোজ খাও তা দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশ হতে কিভাবে নিয়মিত তোমার কাছে এসে পৌঁছায়? তোমার কাছে দ্রব্য সামগ্রী পৌঁছানোর প্রক্রিয়া হচ্ছে বাজার প্রণালী। কৃষি বিপণন হল এক প্রক্রিয়া যেখানে সারা দেশব্যাপী উৎপাদিত কৃষিদ্রব্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন, মোড়ক বাঁধাই, বর্গীকরণ এবং বিতরণ করা হয়ে থাকে। স্বাধীনতার পূর্বে কৃষকরা যখন উৎপাদিত ফসল ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করত তখন ব্যবসায়ীরা দ্রব্যের ওজনে গোলমাল করত এবং দ্রব্যের দামের হিসাবেও কারচুপি করত। ফলশ্রুতিতে ঠকতে হত কৃষকদের। সে সময় কৃষকদের কাছে দ্রব্যের বাজার দরের কোন তথ্য থাকতো না তাই ব্যবসায়ীদের প্রদেয় কম দামেই কৃষকরা কৃষি দ্রব্য বিক্রি করতে বাধ্য হত। কৃষকদের কাছে তাদের মাল মজুত করে রাখার জন্য ভালো সংরক্ষণের সুবিধা না থাকায় পরবর্তী সরময়ে বাজারদাম উঠা পর্যন্ত বিক্রি স্থগিত রাখতে পারে না। তুমি কি জান, আজও 10 শতাংশের অধিক কৃষি উৎপাদন সংরক্ষণ করে রাখার সুবিধার অভাবের কারণে অপচয় হচ্ছে? এই কারণে বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়েছে।

চলো, কৃষি বিপণনের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উন্নতির জন্য নেওয়া চারটি এই ধরনের পদক্ষেপের বিস্তারিত আলোচনা করি। প্রথম পদক্ষেপ হল সুবিন্যস্ত ও স্বচ্ছ বাজার ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করতে বাজারগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ লাগু করা। এই নীতি চালু হলে কৃষক ও ভোক্তা উভয়ই কম বেশি লাভবান হবে। যদিও এখন 27000 গ্রামীণ সাময়িককালীন বাজারকে নিয়ন্ত্রিত বাজার রূপে বিকাশ ঘটানোর প্রয়োজন রয়েছে যার মধ্য দিয়ে গ্রামীণ বাজারের বাস্তবিক ক্ষমতার লাভ উঠানো সম্ভব হয়। দ্বিতীয় ধাপে সড়ক, রেল ব্যবস্থা, মজুতঘর, গুদামঘর, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সংরক্ষণাগার এবং প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটগুলোর মাধ্যমে ভৌতিক পরিকাঠামোর সুযোগ সুবিধা বাড়ানো। কিন্তু এখনো পর্যন্ত পরিকাঠামোর সুবিধা, বর্ধিত চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। এর উন্নতি প্রয়োজন। তৃতীয় ধাপে সরকারি বিপননের মাধ্যমে কৃষককে তাদের উৎপাদনের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা করা। গুজরাত তথা দেশের অন্য কোন অংশে দুগ্ধ

চিত্র 6.1 : *নিয়ন্ত্রিত সব্জী বাজারে কৃষক এবং উপভোক্তার মধ্যে লাভ পৌঁছে যায়।*

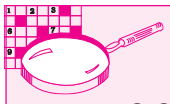

এইগুলো করো

➢ তুমি নিকবর্তী ফল-সবজির বাজার পরিদর্শন করো। সেই বাজারের বিভিন্ন বিশেষত্ব খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করে চিহ্নিত করো। কমপক্ষে 10টি ভিন্ন ভিন্ন ফল এবং সবজি কোথায় উৎপাদন হয়েছে এবং উৎপাদন স্থল থেকে বাজারে পৌঁছাতে কতটা দূরত্ব অতিক্রান্ত করেছে তা জানার চেষ্টা করো। এটাও জানার চেষ্টা করো দ্রব্যগুলো কী প্রকারের পরিবহণের মাধ্যমে বাজারে এসে পৌঁছেছে এবং সব্জীর মূল্যের উপর পরিবহন খরচ কী প্রভাব ফেলে।

➢ প্রায় সব ছোটো শহরে নিয়ন্ত্রিত বাজারের সন্নিহিত ফাঁকা জায়গা থাকে। কৃষক সেখানে তাদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করতে পারে। তারা তাদের দ্রব্য সামগ্রী ঐ স্থানে জমা করে রাখতে পারে। এখন এক বাজারে যাও এবং এর কার্যপ্রণালীর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে জানার চেষ্টা করো বাজারের ফাঁকা জায়গায় আসা দ্রব্যের প্রকৃতি এবং কীভাবে তাদের দাম নির্ধারিত হয়।

উৎপাদক সরকারি সমিতিই গ্রামীণ অঞ্চলের সামাজিক তথা আর্থিক চালচিত্র বদল করে দিয়েছে। যদিও ইদানিংকালে কিছু কিছু স্থানে সমবায়গুলিতে দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে সব কৃষককে সমবায়ের মধ্যে সামিল করতে না পারা, বিপণন এবং প্রক্রিয়াকরণ সমিতির মধ্যে সমন্বসূত্র না হওয়া এবং অকুশলী অর্থ ব্যবস্থাপনা। চতুর্থ ধাপে রয়েছে সরকারি নীতি রূপায়ণের বিষয় সমূহ যথা- ক) কৃষি উৎপাদনের জন্য ন্যূনতম সহায়ক দাম সুনিশ্চিত করা খ) ভারতীয় খাদ্য নিগম দ্বারা গম এবং চাউলের বাফার স্টক পরিচালনা করা এবং গ) সর্বজনীন বিতরণ প্রণালী (রেশন ব্যবস্থা)র মাধ্যমে খাদ্যশস্য এবং চিনির বিতরণ।

এই হাতিয়ার প্রয়োগের লক্ষ্য হল কৃষকের উৎপাদিত দ্রব্যের ন্যায্য দাম দেওয়া এবং গরিবদের ভর্তূকিতে খাদ্য দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করা। তথাপি সরকারের এইসব প্রয়োগের পরও আজ পর্যন্ত কৃষি বাণিজ্যের উপর ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা (মহাজন, গ্রামীণ অভিজাত রাজনীতিজ্ঞ, বড় ব্যবসায়ী এবং ধনী কৃষক) ছড়ি ঘোরাচ্ছে। এই কারণে প্রয়োজন সরকারের হস্তক্ষেপ বিশেষ করে যেহেতু কৃষি উৎপাদনের বড়ো অংশের বাজার ব্যক্তিগতভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সরকারের মধ্যস্থতায় কৃষি বিপনন নানাভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। কোনো কোনো গবেষকদের মতে কৃষির বাণিজ্যকরণের ফলে কৃষকরা উচ্চহারে আয় করার সুযোগ পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারি হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত হলেই কৃষকরা এই উচ্চ আয়ের সুবিধা পায়। এই বিষয়ে তোমার ভাবনা কী?

সম্ভাবনাময় বৈকল্পিক বিপণন প্রণালী (Emerging Alternate Marketing Channels)

এ ব্যাপারটি সবাই বুঝতে পেরেছে যে, কৃষকরা যদি নিজেরাই তাদের উৎপাদন ভোক্তাদের কাছে সরাসরি বিক্রি করতে পারে তবে তাদের আয় বৃদ্ধি পায়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, এবং রাজস্থানে আপনি মন্ডি, পুনেতে হাড়পসার মন্ডি, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার রায়থু বাজার নামে ফল এবং সব্জি বাজার এবং তামিলনাড়ুর ওঝাবর বাজারে কৃষক বাজার প্রভৃতি বিকশিত বিকল্প বিপণন মাধ্যমের কিছু উদাহরণ। এছাড়াও অনেক দেশীয়/বহুজাতি ফাস্ট ফুড চেইনে যুক্ত কোম্পানিগুলি এখন কৃষকের সাথে কৃষি উৎপাদন (ফল-সবজি ফলানোর জন্য চুক্তি করছে। এরা কৃষককে উপযুক্ত বীজসহ অন্যান্য উপাদান যোগান দিয়ে থাকে এবং

পূর্ব নির্ধারিত দামে পরবর্তী বছরে ফসল ক্রয় করার আশ্বাস দিয়ে থাকে। তাই বলা হয়, এই ব্যবস্থা কৃষকের দাম বিষয়ক আশঙ্কা এবং ঝুঁকি নিবারণ করে। সাথে সাথে কৃষি পণ্যের বাজারের বিস্তার ঘটবে। তুমি কি মনে করো এই ধরনের ব্যবস্থাতে ছোটো কৃষকের আয় বৃদ্ধি হবে?

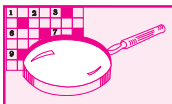

এইগুলো করো

➢ তুমি তোমার এলাকায় বা আশ-পাশে কোনো একটি বিকল্প বিপণন ব্যবস্থা দেখো যা তোমার এলাকার কৃষকরা বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কৃষকেরা ব্যবহার করে। নিয়ন্ত্রিত বাজারের চৌহদ্দির থেকে এর পার্থক্য কি? তাদের সরাসরি সহায়তা এবং উৎসাহ প্রদানের দরকার ছিল কি? এটি কেন এবং কীভাবে করা যায় ব্যাখ্যা করো।

6.5 উৎপাদনশীল ক্রিয়াকর্মের বৈচিত্র্যকরণ

বৈচিত্র্যকরণের দুটি দিক রয়েছে — একদিকে আছে ফসলের উৎপাদন প্রণালীতে পরিবর্তন এবং অন্যদিকে শ্রম শক্তির কৃষি থেকে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যে (যেমন পশুপালন, হাস-মুরগী এবং মৎস্য পালন প্রভৃতি) এবং অকৃষি ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির স্থানান্তর। এই বিবিধকরণের প্রয়োজনীয়তার কারণ হলো শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় আয় উপার্জন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। নয়া ক্ষেত্রে বিচিত্রকরণ শুধুমাত্র আয় উপার্জনের ঝুঁকি হ্রাস করতেই সফল হবে না, তাছাড়াও গ্রামীণ জনসাধারণের উৎপাদনশীল এবং বিকল্প পথে জীবন ধারনের সুযোগ সৃষ্টি করে। দেশের অধিকাংশ কৃষি রোজগার খারিফ ফসল কেন্দ্রিক। কিন্তু রবি ফসলের মরসুমে যেখানে সেচের সুবিধা অপর্যাপ্ত সেখানে লাভদায়ক রোজগার সৃষ্টির সুবিধা খুবই সীমিত। এই কারণে, বিকল্প লাভজনক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে এবং আয়ের নতুন পথের হদিশ দিতে গ্রামাঞ্চলের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির বিকাশ প্রয়োজন। এই পথে আয় বৃদ্ধি করে গ্রামের মানুষ দরিদ্র ও অসম পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারবে। এই জন্য আনুষঙ্গিক কাজকর্ম, অকৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থান এবং বিকল্প জীবন জিবীকার সুযোগ বৃদ্ধির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়াও আরো অনেক সহজলভ্য উপায় রয়েছে যা গ্রামীণ জনসাধারণকে স্থিতিশীল জীবিকা উপার্জনের সুযোগ করে দিতে পারে।

কৃষিক্ষেত্রে জনাধিক্য রয়েছে। কৃষিতে ক্রমবর্ধমান শ্রম শক্তির একটি বিরাট অংশের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য অ-কৃষি ক্ষেত্রগুলিকে চাঙ্গা করে তোলা প্রয়োজন। অকৃষিতে অনেক বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে কিছু বিভাগে পর্যাপ্ত গতিশীল যোগসূত্র রয়েছে যার জন্য এই ক্ষেত্রগুলোতে স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু

চিত্র 6.2 : কৃষি ক্ষেত্রের একটি সহায়ক কার্য হল গুড় প্রস্তুতিকরণ

বাক্স 6.2 : (TANWA) তামিলনাড়ুর কৃষিকাজে যুক্ত মহিলারা

তামিলনাড়ুতে মহিলাদের সাম্প্রতিককালে উদ্ভাবিত কৃষি কৌশলের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য তানয়া (TANWA) নামে প্রকল্প শুরু হয়েছে। এটি মহিলাদের কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং পারিবারিক আয় বৃদ্ধির জন্য সক্রিয়ভাবে ভাগিদার হতে উৎসাহিত করে। থিরুচিরাপল্লীই এনথোনিয়ামেল দ্বারা পরিচালিত প্রশিক্ষিত মহিলা গোষ্ঠী কেঁচো সার বানিয়ে বিক্রি করছে এবং এই উদ্যোগ থেকে আয় উপার্জন করছে। অনেক কৃষক মহিলা গোষ্ঠী অতি ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার সহায়তায় নিজেদের গোষ্ঠীর সঞ্চয় বাড়িয়ে নিতে সক্রিয় রয়েছে। এই ধরনের পুঞ্জীভূত সঞ্চয়ের ব্যবহার করে তারা পারিবারিক ক্ষুদ্রায়ত কার্য যেমন মাশরুমের চাষ, সাবান তৈরি, পুতুল বানানো ইত্যাদি অনেক প্রকারে আয় বৃদ্ধি করছে।

অন্যদিকে অনেক বিভাগে নিম্ন উৎপাদনশীলতা ও অসচ্ছল জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে থাকে। গতিশীল উপবিভাগে কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, চর্ম শিল্প, পর্যটন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। কিছু এমন ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু এতে পরিকাঠামোর সুবিধা এবং অন্যান্য সহায়ক কার্যের নিতান্ত অভাব রয়েছে। যারমধ্যে আছে গৃহভিত্তিক শিল্প যেমন মৃৎ শিল্প, শিল্পকলা, হস্ততাঁত প্রভৃতি। এখানে অধিকাংশ গ্রামীণ মহিলা কৃষিতে কাজের সুযোগ পায় অন্যদিকে পুরুষরা সাধারণত অ-কৃষি রোজগারের চেষ্টা করে। বর্তমান সময়ে গ্রামীণ মহিলারাও অ-কৃষি কার্যে কর্মসংস্থানের খোঁজ শুরু করেছে। (বাক্স 6.2 এ দেখো)।

পশু পালন (Animal Husbandary)

ভারতের কৃষক সমাজ মিশ্র ফসল-প্রাণী সম্পদ কৃষি ব্যবস্থার অনুসরণ করে। প্রাণী সম্পদের মধ্যে গরু-মহিষ, ছাগল, হাঁস-মুরগী ইত্যাদি প্রজাতি বহুল পাওয়া যায়। পশুপালন থেকে পারিবারিক আয় স্থিতিশীল হয়। সাথে সাথে পরিবারের জন্য খাদ্য সুরক্ষা, পরিবহণ, জ্বালানি, পুষ্টি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যায় খাদ্য উৎপাদন কার্যে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে। আজ পশুপালন ক্ষেত্রে একাই দেশের 7 কোটি

চার্ট 6.1 : ভারতে হাঁস-মুরগী পালন এবং প্রাণী সম্পদের বন্টন, 2012

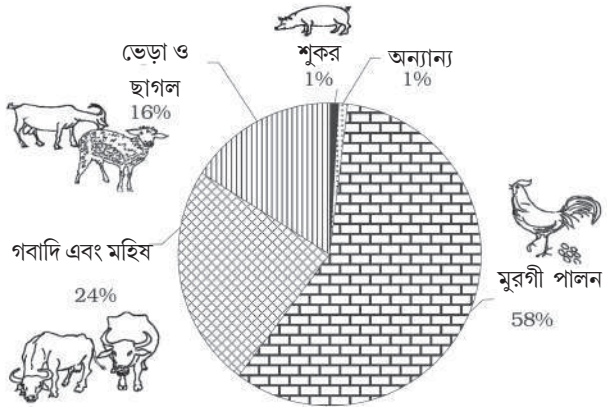

চিত্র 6.3 *: গ্রামীণ ক্ষেত্রে ভেড়া পালন — আয় বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম*

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং ভূমিহীন শ্রমিকের বিকল্প জীবনধারনের সুযোগ করে দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে মহিলারাও অনেক ভালো অংকের রোজগার পাচ্ছে।

চার্ট 6.1-এ ভারতের প্রাণী সম্পদের বন্টন দেখানো হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বড়ো অংশ 58 শতাংশই হাঁস-মুরগি পালন করছে। অন্য পশগুলোর মধ্যে রয়েছে উট, গাধা, ঘোড়া। সবার নিম্ন স্তরে রয়েছে খচ্চর এবং টাট্টু ঘোড়া। 2012 সালে ভারতে 300 মিলিয়ন গবাদী পশু ছিল। যারমধ্যে ছিল 108 মিলিয়ন মহিষ। গত তিন দশকে ভারতের ডায়েরি ক্ষেত্র খুব ভালো অগ্রগতির ছাপ রেখেছে। 1951-2014 সময়কালে দেশে দুগ্ধ উৎপাদন আট গুণের অধিক বেড়েছে। এর প্রধান কৃতিত্ব 'অপারেশন ফ্লাড'এর সফল রূপায়ণকে দেওয়া হয়েছে। এটি এমন এক পদ্ধতি যার অন্তর্গত সকল কৃষক নিজেদের বিক্রয়যোগ্য দুধ একত্র করে মিশিয়ে সেটির বিভিন্ন গুণাগুণ অনুসারে প্রক্রিয়াকরণ করে এবং আবার সেটি শহরকেন্দ্রিক সমবায়ের মাধ্যমে বাজারজাত করে। এটি পূর্বেই বলা হয়েছে, গুজরাত রাজ্যে রয়েছে দুগ্ধ সমবায় রূপায়ণে সফলতার গল্প যা দেশের অনেক রাজ্য এর অনুকরণ করছে। এখন মাংস, ডিম, পশম ইত্যাদি অন্য সহজাত পদার্থ উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে বিবিধকরণ এর দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ।

মৎস্যচাষ (Fisheries)

জেলে সমাজ জলাধারকে 'মা' বা 'দাতা' হিসাবে মানে। সাগর, মহাসাগর, নদী, ঝিল, প্রাকৃতিক পুকুর, ঝরণা ইত্যাদি সব জলাধার জেলে সমাজের নিশ্চিত ও অপরিহার্য জীবন ধারন করার উৎস হয়ে যায়। ভারতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির এবং মৎস্যচাষ ও জল কৃষিতে নতুন প্রযুক্তি প্রবেশের পর থেকে মৎস্য চাষ উন্নয়ন দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছে। বর্তমানে দেশের সমস্ত মৎস্য উৎপাদনের 64 শতাংশ অন্তর্দেশীয় ক্ষেত্র থেকে এবং 36 শতাংশ মহাসাগরীয় ও সামুদ্রিক ক্ষেত্র থেকে আসে। বর্তমানে মোট মৎস্য উৎপাদন মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের 0.4 শতাংশ। ভারতে মৎস্য উৎপাদনকারী প্রধান রাজ্যগুলি হল পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ু। মৎস্যজীবী পরিবারের এক বড় অংশই গরীব। ব্যাপক কর্মহীনতা, স্বল্প রোজগার, নিম্ন মাথাপিছু আয়, অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রম স্থানান্তরের অভাব নিরক্ষরতার উচ্চ হার এবং ঋণ গ্রস্থতা— এই প্রধান কয়েকটি সমস্যায় জেলে সমাজ বর্তমানে সম্মুখীন হচ্ছে। যদিও মহিলারা সক্রিয়ভাবে মৎস্য চাষের সাথে যুক্ত নয়, তারপরও প্রায় 60 শতাংশ শ্রমশক্তি রপ্তানি বাণিজ্যে এবং 40 শতাংশ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অংশীদার হল মহিলারা। বিপণন করার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহে এবং ঋণপ্রদানের ক্ষেত্রে মহিলা জেলেদের সহায়তার জন্য সমবায় এবং জেলেদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অধিকতর ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

উদ্যান বিদ্যা (Horticulture)

প্রকৃতিই ভারতকে জলবায়ু এবং মাটির ধরনের ভিন্নতায় ধন্য করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারত উদ্যান বিদ্যা সংক্রান্ত বিবিধ শস্য উৎপাদন করছে। এর মধ্যে রয়েছে — ফল, সবজি, কন্দ, শস্য, ফুল, ঔষধি এবং সুগন্ধি উদ্ভিদ, মশলা, বাগিচা শস্য (চা, কফি ইত্যাদি)। এইসব ফসল রোজগারের পাশাপাশি খাদ্য এবং পুষ্টির ব্যবস্থা করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভারতে উদ্যান ক্ষেত্রের অবদান সমস্ত কৃষি উৎপাদনের মূল্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ এবং মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের 6 শতাংশ। ভারত আম, কলা, নারিকেল, কাজুবাদাম এবং অনেক ধরনের মশলার উৎপাদনে আজ বিশ্বের এক অগ্রণী দেশ এবং ফল ও সবজির উৎপাদনে বিশ্বে এর স্থান দ্বিতীয়। শষ্য উৎপাদনে অনেক কৃষক যুক্ত থাকার ফলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং এটি দুঃস্থ শ্রেণির জীবন ধারণের মান উন্নত করার মাধ্যম হয়েছে। ফুলগাছ রোপণ, ফুল উৎপাদন, নার্সারি দেখাশোনা, শঙ্কর বীজ-এর উৎপাদন, কোশকলাবিদ্যা চর্চা,

চিত্র ঃ 6.5 *: গ্রামীণ পরিবারে মহিলারা মৌমাছি পালন একটি উদ্যোগ কার্য হিসাবে নেয়।*

ফলফুলের প্রসারণ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ গ্রামীণ মহিলাদের অত্যন্ত লাভদায়ক রোজগার হয়েছে।

যদিও সংখ্যার দিক থেকে, আমাদের প্রাণী সম্পদ উৎসাহব্যঞ্জক অন্য দেশের তুলনায় এর উৎপাদনশীলতা অনেকটাই নিচে। এতে দরকার উন্নত প্রযুক্তি এবং উন্নত মানের ও জাতের পশু যা বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করে উৎপাদনশীলতাকে সুনিশ্চিত করে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং ভূমিহীন শ্রমিকদের উন্নত পশু চিকিৎসাবিধি এবং ঋমদানের সুবিধা প্রদান করে প্রাণী সম্পদ উৎপাদনের মাধ্যমে স্থিতিশীল জীবিকা ধারণের বিকল্প রোজগারের প্রসার ঘটানো যায়। মৎস্য পালন ইতোমধ্যে পর্যাপ্ত বৃদ্ধি হয়েছে।

চিত্র ঃ 6.4 *: ভারতের মোট প্রাণী সম্পদের সবচেয়ে বেশি অংশ রয়েছে মুরগী পালনে ।*

তথাপি অতিরিক্ত মৎস্য শিকার এবং দূষণ সম্পর্কিত সমস্যার নিয়মিত এবং নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। মৎস্যজীবী সমাজকে কল্যাণকর কর্মসূচিতে খাপ খাওয়াতে হবে যা দীর্ঘকালীন লাভ এবং ধারণক্ষম স্থিতিশীল জীবিকা নির্ধারনে সহায়তা করবে। উদ্যানবিদ্যা এক স্থিতিশীল রোজগারের সফল উপায় হয়ে উঠেছে এবং এর খুব উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। একে আরও উৎসাহ দিতে পরিকাঠামো ক্ষেত্র যেমন বিদ্যুৎ, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গুদাম ব্যবস্থা, বিপনন মাধ্যমের বিকাশ, ক্ষুদ্রায়তন প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপন এবং কারিগরি উন্নয়ন ও প্রসারের সংস্থান করতে বিনিয়োগ দরকার।

অন্যান্য বিকল্প জীবিকার সুযোগ (Other alternative livelihood options)

তথ্য প্রযুক্তি ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেছে। মোটামুটি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে একবিংশ শতাব্দীতে দেশে খাদ্য সুরক্ষা এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন তথ্য প্রযুক্তি নির্ণায়ক হয়ে উঠতে পারে। তথ্য প্রযুক্তি এবং উপযুক্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে সরকার খুব সহজেই খাদ্য সুরক্ষাহীনতা এবং ঝুঁকি এবং আশঙ্কাযুক্ত ক্ষেত্রগুলির পূর্বাভাস দিতে পারে। যাতে এইভাবে সমাজ এই বিপত্তির সম্ভাবনা হ্রাস বা তা প্রতিরোধ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কৃষিক্ষেত্রে তো এর ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। যেহেতু এটি সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি এবং এর প্রয়োগে, মূল্য, আবহাওয়া এবং মাটির অবস্থা ও পরিবেশের উপর ভিত্তি করে ফসল নির্বাচনে উপযুক্ততা সবার কাছে ছড়িয়ে দিতে পারে। যদিও তথ্য প্রযুক্তি নিজ বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তনের অনুঘটক হয় না, কিন্তু এটি সমাজে সৃজনাত্মক সম্ভাব্যতা এবং জ্ঞান উন্মোচনের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করতে পারে। এর গ্রামাঞ্চলে কর্মসৃজনের সম্ভাবনাও রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন অংশে তথ্য প্রযুক্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গ্রামোন্নয়নে প্রয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। (বাক্স 6.3-এ দেখো)

6.6 স্থিতিশীল উন্নয়ন এবং জৈব কৃষি

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের আমাদের স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। ভারতের প্রচলিত কৃষি ভীষণভাবে রাসায়নিক সার এবং বিষাক্ত কীটনাশক প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল যা আমাদের খাদ্য ও জল উৎসে প্রবেশ করে এবং পশুসম্পদের ক্ষতি করে, ভূমির উর্বরতা হ্রাস অর্থাৎ মাটির উর্বরতা ক্ষীণ করে এবং প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রকে বিপর্য্যস্ত করে। তাই স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য পরিবেশ

বাক্স 6.3 : সাংসদের দ্বারা গ্রামের দত্তক গ্রহণ

অক্টোবর, 2014 সালে, ভারত সরকার সাংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনা (SAGY)নামে এক নতুন পরিকল্পনা চালু করেছে। এই প্রকল্পেতে ভারতের সংসদ সদস্যদের নিজ নির্বাচনী ক্ষেত্রে একটি গ্রাম চিহ্নিত করে তার উন্নতি সাধন করতে হবে। শুরুতে, সাংসদরা 2016 সাল পর্যন্ত একটি গ্রামকে আদর্শ গ্রাম হিসাবে উন্নত করতে পারে এবং 2019 সাল পর্যন্ত আরও দুটি গ্রাম উন্নত করতে হবে। এইভাবে ভারতের 2500 এর অধিক গ্রাম শামিল করার প্রয়াস রয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে, গ্রামটির জনসংখ্যা হতে হবে 3000-5000 এবং পাহাড়ি এলাকাতে হতে হবে 1000-3000 এবং গ্রামটি সাংসদের নিজের গ্রাম কিংবা তার পত্নীর গ্রাম হতে পারবে না। সাংসদরা প্রত্যাশিতভাবেই গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবেন কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করতে ও স্বাস্থ্য পুষ্টি এবং শিক্ষাগত ক্ষেত্রে পরিকাঠামো তৈরি করতে গ্রামবাসীদের অনুপ্রেরণা দেবেন।

বাক্স 6.4 : জৈব খাদ্য

বিশ্বব্যাপী জৈব খাদ্যের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। অনেক দেশ 10 শতাংশের মতো তাদের খাদ্য জৈব কৃষির মাধ্যমে উৎপন্ন করছে। অনেক খুচরো ব্যবসায়ী চেইন এবং সুপার মার্কেট স্বেচ্ছায় জৈব খাদ্য দ্রব্য বিক্রি করে 'সবুজ স্থিতি' প্রমাণ চিহ্ন পেয়েছে। আরও কী, জৈব খাদ্য দ্রব্যের দাম প্রচলিত খাদ্য দ্রব্যের চাইতে প্রায় 10-100 শতাংশ পর্যন্ত অধিক হয়।

বান্ধব বিবিধ প্রযুক্তির প্রয়োগ অনিবার্য এবং এমনই এক ধরনের প্রযুক্তি হল জৈব কৃষি। সংক্ষেপে জৈব কৃষি হল সম্পূর্ণ এক কৃষি পদ্ধতি যা বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যকে বজায় রাখতে একে পুণস্থাপিত এবং প্রসারিত করবে। সারা বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে জৈবিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত খাদ্য পদার্থের চাহিদা বেড়ে গেছে। (বাক্স 6.4-এ দেখো)

জৈব কৃষির সুবিধা (Benefits of Organic Farming)

জৈব কৃষি ব্যয় বহুল কৃষি উৎপাদন (যেমন উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদির) বিকল্প সংস্থান করে, স্থায়ীভাবে উৎপন্ন জৈব উপকরণের সাহায্যে যা সস্তা হয় এবং তার ফলে বিনিয়োগ থেকে প্রতিদান অধিক মেলে। জৈব কৃষি রপ্তানির মধ্য দিয়ে অধিক আয় সৃষ্টি হয়, কারণ হল জৈবভাবে উৎপন্ন শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন দেশ অধ্যয়ণ করে এটা লক্ষ করা গিয়েছে যে রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্যের তুলনায় জৈবভাবে উৎপাদিত খাদ্য পদার্থের পুষ্টিগুণ অধিক হয়। এইভাবে স্বাস্থ্যকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা যায়। জৈব কৃষিতে, যেহেতু শ্রম উপকরণের ব্যবহার চিরাচরিত কৃষি অপেক্ষা অধিক হয় সে কারণে ভারতে জৈব কৃষি অধিক আকর্ষণীয় হবে। পরিশেষে উৎপাদন কীটনাশক মুক্ত এবং পরিবেশের দৃষ্টিকোন থেকে স্থিতিশীল পদ্ধতিতে উৎপাদন হয়। (বাক্স 6.5-এ দেখো)

বাক্স 6.5 : মহারাষ্ট্রে জৈবিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত তুলা

1995 সালে 'প্রাকৃতি' (Prakruti) নামের বেসরকারি সংগঠন (NGO) এর কিশান মেহেতা যখন সর্বপ্রথম সুপারিশ করেন তুলার রাসায়নিক কীটনাশক এর সর্বাধিক ব্যবহার করার পরিবর্তে জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদন হতে পারে, এর পরই তখনকার নাগপুরের কেন্দ্রীয় তুলা গবেষণা কেন্দ্রের নির্দেশক বিখ্যাত উক্তি করেন "আপনারা কি সমগ্র ভারতকে বস্ত্রহীন করতে চাইছেন"? এখনো পর্যন্ত 130-এর অধিক কৃষক 1200 হেক্টর জমিতে আন্তর্জাতিক জৈব কৃষি আন্দোলন সংঘের মানদন্ড অনুযায়ী জৈব পদ্ধতিতে তুলা উৎপাদনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। এর উৎপাদন জার্মানির মান্যতা প্রাপ্ত সংস্থা এগ্রিকো (AGRECO) দ্বারা পরীক্ষার পর উচ্চ গুণমান সম্পন্ন তকমা পেয়েছে। কিশান মেহতা মনে করেন যে ভারতের প্রায় 78 শতাংশ কৃষক হলো প্রান্তিক কৃষক। এদের মালিকানায় রয়েছে ০.৪ হেক্টরের কম জমি যা দেশের মোট চাষযোগ্য জমি 20 শতাংশ। তাই দীর্ঘমেয়াদীভাবে এইসব কৃষকদের জন্যে ভূমি সংরক্ষণে এবং আর্থিক দিক দিয়ে জৈব কৃষি অধিক লাভদায়ক।

উৎস : *ফ্রন্টলাইন 29 জুলাই, 2005-এ প্রকাশিত লায়লা বাভাদম ঃ এ গ্রিণ অল্টার নেটিভ থেকে উদ্ধৃত।*

জৈব কৃষি জনপ্রিয় করতে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে কৃষকের ইচ্ছা শক্তি এবং সচেতনতা আবশ্যক। অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো এবং পণ্যের বিপণনের প্রধান সমস্যাগুলোই উদ্বেগের কারণ যার দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এছাড়াও উপযুক্ত কৃষিনীতি প্রয়োজন জৈব কৃষির উন্নয়নে।

এটি লক্ষ্য করা গেছে প্রারম্ভিক বছরগুলোতে জৈব কৃষি থেকে উৎপাদন আধুনিক কৃষির তুলনায় কম হয়। সেইজন্য ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের বৃহদায়তন উৎপাদনে উপযোগী হতে কঠিন হবে। রাসায়নিক পদার্থে জাড়িত উৎপাদন অপেক্ষা জৈব উৎপাদনের কিছু ত্রুটি রয়েছে এবং দ্রুত পচনশীল হওয়ায় তাড়াতাড়ি খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উপরন্তু জৈব কৃষিতে মরসুম বহির্ভূত শষ্য ফলনের বিকল্প একেবারেই সীমিত হয়। তা সত্ত্বেও জৈব কৃষি স্থিতিশীল কৃষির উন্নয়নে সহায়ক হয় এবং ভারতের জৈব কৃষিজাত পদার্থ উৎপাদনে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে সুনিশ্চিত সুবিধা রয়েছে। তুমি কি মনে করো খাদ্য এবং খাদ্য বহির্ভূত সামগ্রী জৈব কৃষি পদ্ধতি ব্যবহার করে চাষ করলে সস্তা হবে?

6.7 উপসংহার

এটি স্পষ্ট যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো তাক লাগানো বা চমৎকার পরিবর্তন ঘটবে ততক্ষণ পর্যন্তগ্রামীণ ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার অন্ধকার ছেয়ে থাকবে। আজ ডায়েরি উদ্যোগ, পোলট্রি, মৎস্য পালন, ফল সবজি উৎপাদন ইত্যাদি বিবিধ কার্যের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বৈচিত্রকরণের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ ক্ষেত্রকে প্রাণবন্ত করে তোলা জরুরি হয়ে পড়েছে। সাথে সাথে গ্রামীণ উৎপাদন কেন্দ্র ও শহরের বাজার ও বিদেশি (রপ্তানি) বাজারের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যাতে কৃষি উৎপাদনে নিয়োজিত বিনিয়োগ থেকে অধিক প্রতিদান পাওয়া সম্ভব হয়। সেইসঙ্গে পরিকাঠামো গত উপাদান সমূহ যেমন ঋণ এবং বিপণন, কৃষকবান্ধব কৃষি নীতি এবং কৃষক সমাজ এবং রাজ্য কৃষি বিভাগের মধ্যে নিরন্তন সংবাদ আদান-প্রদান এবং সমীক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলো গ্রাম বিকাশের পূর্ণ সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে সহায়ক হবে।

এখন পরিবেশ ও গ্রামোন্নয়নকে দুইটি আলাদ বিষয় হিসেবে দেখা হয় না। আজকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থিতিশীল

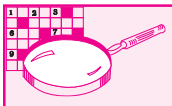

এইগুলো করো

- ভারতে জৈবভাবে উৎপাদিত পাঁচটি বহুল প্রচলিত বস্তুর একটি সূচি প্রস্তুত করো।
- তুমি আশেপাশের কোনো সুপার মার্কেট, সবজির দোকান এবং বড় খুচরো বিপণিতে যাও। কিছু পণ্য সনাক্ত করো। দাম, স্থায়িত্বকাল, গুণমান এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এগুলো জনপ্রিয় হয়েছে তার ভিত্তিতে জৈবভাবে উৎপাদিত এবং সাধারণভাবে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর তুলনা করে একটি চার্ট প্রস্তুত করো।
- তুমি আশেপাশের কোন স্থানীয় উদ্যানবিদ্যাগত ফার্মে যাও ফার্মে যে দ্রব্যগুলি উৎপাদিত হয় তার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করো। তারা কৃষি ফলানোর ধাঁচের বিচিত্রকরণ করতে পারো। তাদের সাথে বৈচিত্র করণের সুবিধা এবং অসুবিধা আলোচনা করো।

উন্নয়নের জন্য বিকল্প পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি সম্ভার আবিষ্কার করা ও সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই প্রযুক্তি সম্ভার থেকে প্রতিটি গ্রামীণ সম্প্রদায় নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী প্রযুক্তি বেছে নিতে পারবে। সেরা প্রয়োগের উদাহরণগুলো থেকে যেগুলো প্রাসঙ্গিক সেগুলোকে আয়ত্ত করে প্রয়োগের চেষ্টা করতে হবে। সেরা সম্ভারের উদাহরণ সমূহ হিসেবে বোঝানো হচ্ছে গ্রামীণ উন্নয়ন পরীক্ষার সাফল্যজনক ঘটনাগুলি। যেগুলো ভারতে বিভিন্ন প্রান্তে একইরকম পরিবেশে সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এর ফলেই করার মধ্য দিয়ে শেখার প্রক্রিয়া গতি পাবে।

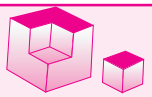

সংক্ষিপ্ত বৃত্তি

- গ্রামোন্নয়ন শব্দটি ব্যাপক অর্থবহ হলেও এখানে এটি মূলত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষেত্রের পিছিয়ে পড়াদের উন্নয়নে এক কার্য পরিকল্পনা বোঝায়।
- গ্রামীণ ক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যাংকিং, বিপনন, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি পরিমানগত ও গুণগত পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রয়োজন।
- পশুপালন মৎস্যচাষ এবং অন্যান্য অ-কৃষি কার্য প্রভৃতি নতুন ক্ষেত্রগুলোতে গুরুত্ব আরোপের মধ্য দিয়ে, এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র কৃষি ক্ষেত্র থেকে ঝুঁকি হ্রাস করতেই নয় বরং তার পাশাপাশি আমাদের গ্রামীণ জনসাধারণের উৎপাদনশীল স্থিতিশীল জীবিকার সুযোগ সহজলভ্য করা যাবে।
- পরিবেশ স্থিতিশীল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জৈব কৃষির গুরুত্ব ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তাই জৈব চাষাবাদের অগ্রগতি জরুরি।

অনুশীলনী

1. 'গ্রামোন্নয়ন' বলতে কী বোঝ? গ্রামোন্নয়নের প্রধান বিচার্য বিষয়গুলো চিহ্নিত করো।
2. গ্রামোন্নয়নে ঋণের গুরুত্ব আলোচনা করো।
3. গরিব মানুষের ঋণের প্রয়োজনীয়তা পূরণে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।
4. গ্রামীণ বাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলি ব্যাখ্যা করো।
5. সুসংহত আয় উপার্জনের জন্য কৃষির বৈচিত্র্যকরণ আবশ্যক কেন ব্যাখ্যা করো।

6. গ্রাম ভারতে উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংক ব্যবস্থার ভূমিকার আলোচনামূলক মূল্যায়ণ করো।

7. কৃষি বিপণন বলতে কী বোঝ?

8. কৃষি বিপণন প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতাগুলো উল্লেখ করো।

9. কৃষি বিপণনের জন্য লভ্য বিকল্পমাধ্যমগুলো কী কী? কয়েকটি উদাহরণ দাও।

10. 'সবুজ বিপ্লব' এবং 'স্বর্ণ বিপ্লব' এরমধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করো।

11. কৃষি বিপণনের উন্নতি সাধনে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থাগুলি কি পর্যাপ্ত বলে তুমি মনে করো। ব্যাখ্যা করো।

12. গ্রামীণ বৈচিত্র্য করণের প্রসারে অ-কৃষি কর্মোনিয়োগের ভূমিকা আলোচনা করো।

13. বৈচিত্রকরনের অগ্রগতি সাধনে পশুপালন, মৎস্য চাষ এবং উদ্যানবিদ্যার গুরুত্ব আলোচনা করো।

14. তথ্য প্রযুক্তি সুসংহত উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে"— তোমার মতামত প্রকাশ করো।

15. জৈব কৃষি কী এবং স্থিতিশীল উন্নয়নে এটি কীভাবে প্রসার করে।

16. জৈব কৃষির সুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা নিরূপণ করো।

17. জৈব কৃষির প্রারম্ভিক বছরগুলোতে কৃষক যে কতগুলো সমস্যার সম্মুখীন হয় সেইগুলোর তালিকা তৈরি করো।

REFERENCES

ACHARYA, S.S. 2004. *Agricultural Marketing, State of the Indian Farmer, a Millennium Study*. Academic Foundation, New Delhi.

ALAGH, Y.K. 2004. *State of the Indian Farmer, a Millennium Study — an Overview.* Academic Foundation, New Delhi.

CHAWLA, N.K., M.P.G. KURUP and V. P. SHARMA. 2004. *Animal Husbandry, State of the Indian Farmer, a Millennium Study.* Academic Foundation, New Delhi.

DEHADRAI, P.V. and Y.S. YADAV. 2004. *Fisheries Development, State of the Indian Farmer, a Millennium Study.* Academic Foundation, New Delhi.

JALAN, BIMAL. (Ed.). 1992. *The Indian Economy: Problems and Perspectives*. Penguin

Publication, New Delhi.

Narayanan, S. 2005. *Organic Farming in India.* NABARD Occasional Paper No: 38, Department of Agriculture and Rural Development, Mumbai.

Singh, H.P., P.P. Dutta and M. Sudha. 2004. *Horticulture Development, State of the Indian Farmer, a Millennium Study.* Academic Foundation, New Delhi.

Singh, Surjit and Vidya Sagar. 2004. *Agricultural Credit in India: State of the Indian Farmer, a Millennium Study.* Academic Foundation, New Delhi.

Sinha, V.K. 1998. *Challenges in Rural Development.* Discovery Publishing House, New Delhi.

Todaro, Michael P. 1987. *Economic Development in the Third World.* Orient Longman Ltd, Hyderabad.

Toppo, E. 2004. *Organic Vegetable Gardening: Grow Your Own Vegetables.* Unit for Labour Studies, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai.

Government Reports

Successful Governance Initiatives and Best Practices: Experiences from Indian States, Government of India in Coordination with Human Resource Development Centre and UNDP, Planning Commission, Delhi, 2002.

Annual Reports, Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi.

Basic Animal Husbandry and Fisheries Statistics (for various years), Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India.

Website

www.dahd.nic.in

7

কর্মসংস্থান ঃ প্রবৃদ্ধি, বিধি-বহির্ভূতকরণ এবং অন্যান্য বিষয় সমূহ

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থীরা সক্ষম হবে —

- কর্মসংস্থান সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা যেমন — অর্থনৈতিক কাজকর্ম, শ্রমিক, শ্রমশক্তি এবং বেকারত্ব সম্পর্কে বুঝতে।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্ম পুরুষ ও নারীর অংশগ্রহণের প্রকৃতি অনুধাবন করতে।
- বেকারত্বের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি উপলব্ধি করতে।
- দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকার যে উদ্যোগগুলি গ্রহণ করেছে, তার মূল্যায়ন করতে।

যন্ত্র মাত্রেই আমার আপত্তি নয়। আমার বিরোধিতা যন্ত্রের প্রতি হুজুগেপনাতে। তারা একে বলে শ্রম-সাশ্রয়কারী যন্ত্রের প্রতি আগ্রহ। যখন মানুষ শ্রম বাঁচাতে তৎপর, তখন হাজার হাজার মানুষ কর্মহীন হয়ে সড়কে পতিত হচ্ছে অনাহারে মরার জন্য।

— মহাত্মা গান্ধি

7.1 ভূমিকা

মানুষ বিবিধ কাজকর্ম করে। কেউ ফার্মে কাজ করে। কেউ কারখানায়, ব্যাঙ্কে, দোকানে এবং অন্যান্য অনেক কর্মস্থলে কাজ করে। অনেকে আবার ঘরে কাজ করে। ঘরে বসে কাজের মধ্যে শুধু চিরাচরিত কাজ যেমন — তাঁত বোনা, কারুকার্যময় ফিতা তৈরি করা অথবা বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্পের কাজ করা। কিন্তু আজকাল ঘরে বসে বিভিন্ন আধুনিক কাজও অনেকে করেন। যেমন তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের প্রোগ্রামিং-এর কাজ। পূর্বে কারখানার কাজ বলতে বোঝাত শহরের কোন কারখানাতে কাজ করাকে। এখন কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে এই সকল কারখানাজাত দ্রব্য গ্রামের বাড়িতেও উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

চিত্র ঃ- 7.1 *: পাঞ্জাবের জলন্ধরে গৃহে তৈরি ফুটবল বহুজাতিক সংস্থাগুলো বাজারে বিক্রি করছে।*

মানুষ কেন কাজ করে? ব্যক্তি হিসেবে এবং সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষ জীবন ধারণের জন্য রোজগার করে। কিছু মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থ পায়। এই অর্থ লাভের জন্য কাজ করতে হয় না। এভাবে অর্থ লাভ কাউকে সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্তি দিতে পারে না। কর্মে নিযুক্তি আমাদের স্বনির্ভর করে এবং অন্যের সাথে অর্থবহভাবে মেলামেশা করতেও সাহায্য করে। প্রত্যেক কর্মরত ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে জাতীয় আয়ে অবদান রাখে এবং এভাবে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে দেশের উন্নয়ন ঘটে। এটা হল প্রকৃত অর্থে জীবন ধারণের জন্য উপার্জন। আমরা শুধু আমাদের জন্যই কাজ করিনা। আমাদের উপর যারা নির্ভরশীল তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্যও কাজ করি। কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরে, মহাত্মা গান্ধি শিক্ষা এবং বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ হস্তশিল্প। কর্মে নিযুক্ত রয়েছে এমন ব্যক্তিদের পর্যালোচনা করে আমরা দেশে রোজগারের প্রকৃতি এবং রোজগারের গুণমান সম্পর্কে ধারণা পাই এবং মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের পরিকল্পনা করতে পারি। এটা আমাদের দেশের জাতীয় আয়ে বিভিন্ন শিল্পগুলোর এবং অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোর অবদানকে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। অনেক সামাজিক সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করতে এছাড়াও সাহায্য করে যেমন সমাজের প্রান্তিক অংশের মানুষেরা এবং শিশু শ্রমিকেরা, কীভাবে শোষণের শিকার হয়।

7.2 কর্মী এবং কর্মসংস্থান

কর্মসংস্থান কী? কর্মীই বা কে? যখন একজন কৃষক মাঠে কাজ করে তখন সে খাদ্যশস্য উৎপাদন করে, শিল্পের জন্য কাঁচামালও উৎপাদন করে। সূতা-কাপড় কারখানায় কাপড়ে রূপান্তরিত হয়। লরি বা ট্রাক এক স্থান থেকে অন্যস্থানে দ্রব্য পরিবহণ করে। আমরা জানি যে কোন একটি দেশে কোন এক বছরে যে সমস্ত দ্রব্য এবং সেবার উৎপাদন হয় তার অর্থমূল্য হচ্ছে ঐ দেশের ঐ বছরের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন। এরসাথে আমাদের বিবেচনা করতে হবে যে, বিদেশ থেকে আমদানির জন্য আমাদের অর্থ প্রদান করতে হয় এবং বিদেশে রপ্তানি থেকে আমরা অর্থ পাই। এই অর্থপ্রদান ও অর্থপ্রাপ্তি থেকে দেশের যে নিট আয়-উপার্জন হয় সেটা ধনাত্মক হয় (যদি আমরা মূল্যের নিরিখে আমদানির চাইতে রপ্তানি বেশি করি) অথবা ঋণাত্মক হয় (যদি মূল্যের নিরিখে আমদানি রপ্তানিকে ছাড়িয়ে যায়) অথবা শূন্য হয় (যদি আমদানি ও রপ্তানি সমমূল্যের হয়)। যখন আমরা এই উপার্জনকে যোগ করি (যোগ অথবা বিয়োগ), যা আমরা বৈদেশিক লেনদেন থেকে পেয়েছি, তখন আমরা কী পাব? আমরা পাব দেশের এক বছরের মোট জাতীয় উৎপাদন। একে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে।

এই সমস্ত কার্যকলাপ যা আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনে অবদান রাখে তাদেরকে বলে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ। বেশি দক্ষ অথবা কম দক্ষ ব্যক্তি যারা অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত তারাই হল কর্মী। এদেরকে শ্রমিকও বলে। এমনকি কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ যারা অসুস্থতার কারণে আহত হয় বা অন্যান্য শারীরিক অক্ষমতার জন্য, প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য, উৎসব, সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য সাময়িকভাবে কাজে অনুপস্থিত থাকে তাদেরকেও শ্রমিক বলা হবে। এই সমস্ত কাজকর্মের প্রধান কর্মীকে যারা সাহায্য করে তাদেরকেও কর্মী হিসাবে ধরা হয়। আমাদের মধ্যে এমন একটি ধারণা রয়েছে যে, নিয়োগকর্তা কাজের জন্য যাদেরকে অর্থ প্রদান করেন তারাই কেবল কর্মী। ব্যাপারটা এরূপ নয়। যারা স্ব-রোজগার করেন তারাও কর্মী। ভারতের কর্মসংস্থানের প্রকৃতি বহু বিচিত্র। কেউ কেউ বছর ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়, আবার অন্য কেউ কেউ মাত্র বছরের কিছু মাসের জন্য কাজ পায়। অনেক কর্মীই তাদের কাজে চলনসই মজুরিও পায় না। শ্রমিকের সংখ্যা হিসাব করার সময় যে সমস্ত ব্যক্তি আর্থিক কাজকর্মের সাথে যুক্ত, তাদের সবাইকে কর্মরত শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তোমরা বিভিন্ন আর্থিক কাজকর্মের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা জানতে আগ্রহী হবে। 2011-12 সালে ভারতে প্রায় 478 মিলিয়নের শক্তিশালী শ্রমশক্তি

কাজগুলো করো

➢ তোমার বাড়িতে অথবা তোমার আশে-পাশে এমন অনেক মহিলা আছে যাদের প্রযুক্তিগত ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা আছে এবং তাদের অবসর সময়ও আছে কাজে যাওয়ার জন্য কিন্তু তারা কাজে যায় না। তাদের জিজ্ঞাসা কর কেন তারা কাজ করেনা। কাজে না যাওয়ার কারণগুলো তালিকাবদ্ধ করো এবং শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো যে, কেন তাদের কাজে যাওয়া উচিত এবং কীভাবে তাদের কাজে পাঠানো যায়। কিছু সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে গৃহিনীরা গৃহে বিনামূল্যে যে কাজকর্ম করে থাকেন তাও মোট জাতীয় উৎপাদনে যোগ করা উচিত। কারণ তারাও অর্থনৈতিক কাজকর্মের সাথে যুক্ত। তুমি কি এর সাথে সহমত পোষণ করো?

ছিল। যেহেতু অধিকাংশ জনগণ গ্রামে বাস করে তাই সেখানের আনুপাতিক শ্রমশক্তির অনুপাতও অধিক হয়। এই 473 মিলিয়ন শ্রমশক্তির তিন-চতুর্থাংশই হল গ্রামীণ শ্রমিক। ভারতের শ্রমশক্তির অধিকাংশই পুরুষ। প্রায় 70 শতাংশই পুরুষ-শ্রমিক এবং বাকী অংশ মহিলা-শ্রমিক (শিশু-শ্রমিককেও লিঙ্গের ভিত্তিতে পুরুষ এবং মহিলা শ্রমিকের শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে)। গ্রামের শ্রমশক্তির এক-তৃতীয়াংশ মহিলা-শ্রমিক যেখানে শহরাঞ্চলের শ্রমশক্তির মাত্র এক-পঞ্চমাংশ মহিলা-শ্রমিক। মহিলারা রান্না করা, জল সংগ্রহ, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ এবং এর সাথে সাথে ক্ষেতের কাজেও হাত লাগায়। তাদেরকে নগদে অথবা শস্য প্রদানের মাধ্যমেও মজুরি দেওয়া হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের কিছুই দেওয়া হয়না। এই কারণেই এই সকল মহিলাদের শ্রমিক শ্রেণিতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। অর্থনীতিবিদদের মতে, ঐ সমস্ত মহিলাদেরও শ্রমিক হিসবে গণ্য করা বাঞ্ছনীয়।

7.3 কর্মসংস্থানে জনগণের অংশগ্রহণ

দেশের কর্মসংস্থানের অবস্থা যাচাই করতে শ্রমিক-জনগণের অনুপাতকে একটি পরিমাপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই অনুপাতটি জনসংখ্যার কত শতাংশ সক্রিয়ভাবে কোন দেশের দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করছে, তা জানতে সাহায্য করে। যদি এই অনুপাতটি বড় হয়, তবে বুঝা যাবে যে জনগণের নিযুক্তির পরিমাণ বেশি। যদি কোন দেশের এই অনুপাতটি মাঝারি বা নিম্ন হয় তার অর্থ এই যে জনসংখ্যার একটা খুব বড় অংশ অর্থনৈতিক কাজকর্মের সাথে সরাসরি যুক্ত নয়।

তোমরা হয়তো নিচের বা পূর্ববর্তী শ্রেণিগুলোতে পড়েছ 'জনসংখ্যা' শব্দের অর্থ। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে মোট যে সংখ্যক লোক বসবাস করে, তাকেই জনসংখ্যা বলে। যদি তুমি ভারতের শ্রমিক-জনসংখ্যার অনুপাত জানতে চাও তাহলে ভারতের মোট শ্রমিক সংখ্যাকে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করো এবং ভাগফলকে 100 দিয়ে গুণ করো।

যদি তোমরা সারণি 7.1-এর দিকে তাকাও, তোমরা লক্ষ্য করবে যে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিভিন্ন স্তরে জনগণের অংশ গ্রহণ মাত্রা। ভারতে প্রতি 100 জন ব্যক্তির মধ্যে প্রায় 39 (38.6 কে পরবর্তী পূর্ণসংখ্যা নেওয়া হয়েছে) জন শ্রমিক। শহরাঞ্চলে এর অনুপাত 36 যেখানে গ্রামীণ ভারতে এর অনুপাত প্রায় 40। গ্রামাঞ্চলের মানুষের সম্পদের স্বল্পতা রয়েছে। ফলে তাদের আয়ও সামান্য। এই কারণে শ্রমের বাজারে তাদের উপস্থিতি বেশি। তাদের মধ্যে অনেকেরই বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং অন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। এমনকি তাদের মধ্যে যারা গিয়েই থাকে, মাঝপথেই তাদের পাঠে ছেদ পড়ে কারণ তারা কর্মীবাহিনীতে এসে সামিল হয়ে পড়ে। অপরদিকে, শহরাঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়া শেষ করতে পারে। ফলশ্রুতিতে শহরাঞ্চলের মানুষেরা বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারে। তারা তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কাজের পারদর্শিতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কর্মসংস্থানের খোঁজ করতে পারে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের মানুষের ঘরে বসে থাকার সুযোগ নেই। কারণ তাদের অবস্থাটা দিন-আনি দিন-খাই প্রকৃতির।

সারণি 7.1

ভারতে শ্রমিক-জনসংখ্যার অনুপাত

2011-2012

লিঙ্গ	শ্রমিক-জনসংখ্যা অনুপাত		
	মোট	গ্রাম	শহর
পুরুষ	54.4	54.3	54.6
মহিলা	21.9	24.8	14.7
মোট	**38.6**	**39.9**	**35.5**

কাজগুলো করো

- কর্মসংস্থান সম্পর্কিত যে-কোন অনুসন্ধান শ্রমিক-জনসংখ্যা অনুপাতের পর্যালোচনা থেকে শুরু করা উচিত— কেন?
- তোমরা হয়তো দেখে থাকবে কিছু কিছু সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীতে পুরুষদের আয় পর্যাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের ঘরের মহিলাদের কাজ করতে পাঠায়না কেন?

মহিলাদের সাথে তুলনায় দেখা যায় বেশী সংখ্যক পুরুষরা কাজ করে। শহরাঞ্চলে নারী-পুরুষভেদে অংশ গ্রহণের হারের পার্থক্য খুব বেশি। যেমন প্রতি 100 জন শহুরে মহিলাদের মধ্যে মাত্র প্রায় 15 জন কোন না কোন অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত রয়েছে। অপরদিকে গ্রামাঞ্চলের শ্রমের বাজারে প্রতি 100 জন গ্রামীণ মহিলার মধ্যে প্রায় 25 জনই শ্রমিক। সামগ্রিকভাবে নারীরা এবং বিশেষত শহরাঞ্চলের নারীরা কেন কম কাজ করেন? এটি সাধারণত দেখা যায় যে, যেখানে পুরুষরা অধিক উপার্জন করছেন সেখানে পরিবারের পক্ষ থেকে মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে যোগদান করতে নিরুৎসাহিত করা হয়।

উপরের আলোচনার দিকে ফিরে তাকালে দেখব যে, পরিবারের মহিলারা যে সকল গৃহস্থালীর কাজকর্ম করে, তাকে উৎপাদনশীল কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়না। কাজের সংকীর্ণ সংজ্ঞাই নারীদের গৃহকাজকে উৎপাদনশীল কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কারণেই দেশে নারী শ্রমিকের সংখ্যা এত কম দেখায়। কিন্তু একটু গভীরে গিয়ে চিন্তা করলেই দেখা যায়, নারীরা গৃহকাজে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং পারিবারিক ক্ষেত-কর্মেও বিনা পয়সায় কাজ করে। তুমি কী মনে করো? তাদের সংখ্যাটা কি দেশের মোট নারী-শ্রমিকের সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত?

7.4 স্বনিযুক্তি এবং ভাড়া করা শ্রমিক

শ্রমিক-জনসংখ্যার অনুপাত কি সমাজের শ্রমিকের অবস্থা সম্পর্কে বা কাজের পরিবেশ সম্পর্কে কিছু নির্দেশ করে? একটি উদ্যোগে শ্রমিকের কাজের অবস্থা জানার মধ্য দিয়ে দেশে কর্মসংস্থানের গুণমান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। সাথে সাথে এটাও জানা যায়, শ্রমিকটি কিভাবে কাজে নিয়োজিত (স্থায়ীভাবে নাকি অস্থায়ীভাবে) এবং কর্তৃপক্ষও কর্মরত অন্য শ্রমিকদের সাথে তার সম্পর্কের একাত্মতা কিরূপ।

চিত্র 7.2 *: ইট তৈরি ঃ অস্থায়ী শ্রমিকের ধরন।*

চার্ট 7.1 ঃ কর্মসংস্থানে লিঙ্গগত বিভাজন

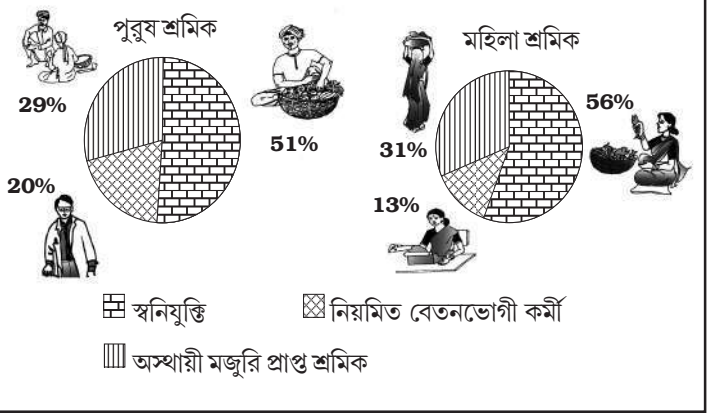

ধরা যাক, নির্মাণ শিল্পে তিনজন কর্মী রয়েছেন। একজন সিমেন্টের দোকানের মালিক, একজন নির্মাণকারী শ্রমিক এবং একজন নির্মাণ কোম্পানির প্রকৌশলী। যেহেতু তাদের পেশাগত অবস্থান ভিন্ন তাই তাদের বিভিন্ন নামে সম্বোধন করা হয়। কর্মীরা যখন কোন একটি উদ্যোগের মালিক হন এবং জীবন নির্বাহের জন্য রোজগার করতে উদ্যোগটি চালান, তাদেরকে স্ব-উদ্যোগী বা স্বনিযুক্ত বলে। যেখানে সিমেন্টের দোকানের মালিক হচ্ছেন স্বনিযুক্ত। ভারতের প্রায় 52 শতাংশ শ্রমশক্তি এই শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত। নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকরা অস্থায়ী মজুরি প্রাপ্ত শ্রমিক বলে পরিচিত। তারা ভারতের শ্রমশক্তির প্রায় 30 শতাংশ। এই ধরনের শ্রমিকরা অস্থায়ীভাবে অন্যের জমিতে নিযুক্ত থাকে এবং তাদের কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। ভারতের শ্রমশক্তির 18 শতাংশ নির্মাণ প্রকৌশলী যারা নির্মাণ কোম্পানির সাথে যুক্ত। যখন একজন কর্মী কারোর দ্বারা বা কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে নিয়মিত তার মজুরি পান তাদেরকে নিয়মিত বেতনভোগী কর্মী বলে।

চার্ট 7.1 এর দিকে তাকালে তোমরা লক্ষ করবে যে, স্বনিযুক্তিই জীবনধারণের একটি মুখ্য উৎস নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই। চিত্রে দেখা যাচ্ছে শ্রমশক্তির 50 শতাংশের বেশি পুরুষ ও নারী কাজের এই শ্রেণিতে রয়েছে। অস্থায়ী মজুরিভিত্তিক কাজ পুরুষ ও নারীদের উপার্জনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এক্ষেত্রে প্রায় 31 শতাংশের মত নিযুক্তি রয়েছে। যখন নিয়মিত বেতনভোগী কর্মীদের দিকে লক্ষ করি, তখন দেখা যায় পুরুষরা অধিক অনুপাতে এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত। 20 শতাংশ পুরুষ নিয়মিত বেতনভোগী কর্মী

চার্ট 7.2 : অঙ্কন ভিত্তিক কর্মনিযুক্তির বিভাজন

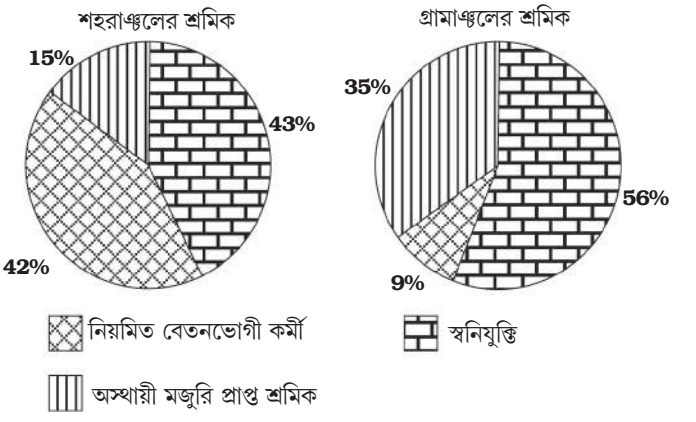

যেখানে মহিলা কর্মী কেবলমাত্র 13 শতাংশ। তার পেছনে পারদর্শিতার প্রয়োজনীয়তা একটি কারণ হতে পারে। নিয়মিত বেতনভোগী কাজের জন্য পারদর্শিতা ও উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন হয়। নারীদের মধ্যে এই দুইয়ের অভাব থাকায় নারীরা বেতনভোগ কাজ বেশি পান না।

চার্ট 7.2তে যখন আমরা গ্রাম ও শহরের শ্রমশক্তির বিভাজনের তুলনা করি, তখন লক্ষ করবো যে স্বনিযুক্ত এবং অস্থায়ী মজুরিপ্রাপ্ত শ্রমিকদের পরিমাণ শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে বেশি। শহরাঞ্চলে স্বনিযুক্তি ও নিয়মিত বেতনভোগী উভয় ধরনের কর্মসংস্থানের সংখ্যা অধিক। গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ লোক কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। তাদের মধ্যে অনেকেই নিজের জমিতে এককভাবে চাষবাসের কাজ করেন। এই কারণে গ্রামাঞ্চলে স্বনিযুক্তির অংশীদারিত্ব বেশি হয়।

শহরাঞ্চলে কাজের প্রকৃতি ভিন্ন। এখানে প্রত্যেকেই কারখানা, দোকান এবং বিভিন্ন ধরনের অফিস নিজেরা চালাতে পারেন না। তদুপরি শহরাঞ্চলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য নিয়মিতভাবে শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

শহরাঞ্চলে কাজের প্রকৃতি ভিন্ন। এখানে প্রত্যেকেই কারখানা, দোকান এবং বিভিন্ন ধরনের অফিস

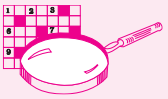

কাজগুলো করো

➢ সাধারণত আমরা এটা মনে করি যে, যারা নিয়মিত বা অস্থায়ীভাবে মজুরির ভিত্তিতে কাজ করে যেমন — কৃষি শ্রমিক, কারখানার শ্রমিক অথবা কোন ব্যাঙ্কে বা অফিসের করনিক হিসাবে কাজ করে, তাদের শ্রমিক বলে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে তোমরা বুঝেছ যে, যারা স্বনিযুক্ত যেমন ফুটপাতের সবজি বিক্রেতা, পেশাদারি যেমন আইনজীবী, চিকিৎসক, বাস্তুকার তারাও শ্রমিক। নিচের উদ্ধৃতিগুলোকে স্বনিযুক্তি, নিয়মিত বেতনভোগী কর্মচারী এবং অস্থায়ী মজুরিপ্রাপ্ত-শ্রমিকের ভিত্তিতে যথাক্রমে 'ক', 'খ', এবং 'গ', দ্বারা চিহ্নিত করো ঃ-

1. সেলুন দোকানের মালিক
2. চাউল কারখানার একজন শ্রমিক যাকে দৈনিক পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, কিন্তু সে নিয়মিত কর্মী।
3. ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ।
4. রাজ্য সরকারের অফিসে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে টাইপ করার কাজে নিযুক্ত, কিন্তু মাস শেষে মজুরি পান।
5. হস্তচালিত তাঁত শিল্পের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি।
6. পাইকারি সবজির দোকানে মাল ওঠা-নামার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি।
7. ঠান্ডা পানীয় দোকানের মালিক যেখানে পেপসি, কোকাকোলা, মিরান্ডা বিক্রি করা হয়।
8. বেসরকারি হাসপাতালের সেবিকা যিনি 5 বছর ধরে নিয়মিত কাজ করছেন এবং মাসিক বেতন পান।

➢ অর্থনীতির বিশেষজ্ঞদের মতে অস্থায়ী মজুরি প্রাপ্ত শ্রমিকরা এই তিন শ্রেণির শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে অসুরক্ষিত। তোমরা কি জান এই শ্রমিকরা কারা, তাদের কোথায় পাওয়া যায় এবং কেন পাওয়া যায়?

➢ আমরা কি বলতে পারি স্বনিযুক্তরা অস্থায়ী মজুরি-প্রাপ্ত শ্রমিক অথবা নিয়মিত বেতনভোগী কর্মচারীদের থেকে বেশি উপার্জন করে? নিয়োগের গুণগতমানের কিছু নির্দেশক চিহ্নিত করো।

নিজেরা চালাতে পারেন না। তদুপরি শহরাঞ্চলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য নিয়মিতভাবে শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

7.5 ফার্ম, কারখানা এবং অফিসে কর্মসংস্থান

একটি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের সাথে সাথে কৃষিক্ষেত্র এবং অন্যান্য কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম থেকে শ্রমিকদের শিল্প ও সেবা ক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হতে দেখা যায়। এই প্রক্রিয়ায় শ্রমিকরা গ্রামাঞ্চল থেকে শহরমুখী হয়। পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে শিল্পক্ষেত্রে মোট শ্রমশক্তির অংশিদারিত্ব হ্রাস পায়। সেবা ক্ষেত্রের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে বলে শিল্প থেকে শ্রমিক সেবা ক্ষেত্রে পাড়ি দেয়। এই স্থানান্তর শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির বন্টনের চিত্র লক্ষ করলেই বুঝা যায়। সাধারণত, আমরা সমস্ত অর্থনৈতিক কাজকর্মকে আটটি বিভিন্ন শিল্পের বিভাগে ভাগ করে থাকি। এগুলো হল — (ক) কৃষি, (খ) খনন এবং উত্তোলন, (গ) উৎপাদন, (ঘ) বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং জল সরবরাহ, (ঙ) নির্মাণ কার্য, (চ) বাণিজ্য, (ছ) পরিবহন এবং সংরক্ষণ, (জ) সেবা। আরো সরলিকৃত করতে, এই সকল বিভাগগুলোতে কর্মরত শ্রমিক বাহিনীকে মূলত তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়। এগুলো হল — (ক) প্রাথমিক ক্ষেত্র (যাতে কৃষি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে), (খ) মাধ্যমিক ক্ষেত্র (যেখানে রয়েছে খনন ও উত্তোলন, উৎপাদন, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জল সরবরাহ, নির্মাণ কার্য) এবং (গ) সেবা

চিত্র ঃ 7.3 : *পোশাক প্রস্তুতকারক শ্রমিক: কারখানাতে আগমনরত মহিলাদের জন্য কর্মের সংস্থান ।*

সারণি 7.2

শিল্পে শ্রমশক্তির বন্টন, 2011-12

শিল্প বিভাগ	বাসস্থান		লিঙ্গ		মোট
	গ্রাম	শহর	পুরুষ	নারী	
প্রাথমিক ক্ষেত্র	64.1	6.7	43.6	62.8	48.9
মাধ্যমিক ক্ষেত্র	20.4	35.0	25.9	20.0	24.3
তৃতীয় বা সেবা ক্ষেত্র	15.5	58.3	30.5	17.2	26.8
মোট	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

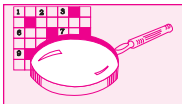

কাজগুলো করো

➢ কাজের বাজারের খবর বা কর্মসংস্থানের খবরা খবর দিতে সকল খবরের কাগজে একটি কলাম বরাদ্দ করা থাকে। কোন কোন কাগজ সপ্তাহে একদিন একটি সম্পূর্ণ পৃষ্ঠাজুড়ে কর্মখালির খবর পরিবেশন করে। যেমন 'দ্যা হিন্দু পত্রিকা'য় '**Opportunites**' বা 'দ্যা টাইমস অব ইন্ডিয়া'তে '**Accent**' নামক পাতায় কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অনেক কোম্পানি বিভিন্ন পদে কর্মখালির বিজ্ঞাপন ছাপায়। পত্রিকার এই অংশগুলো কেটে নাও। এবার একটি সারণি তৈরি কর যেখানে চারটি স্তম্ভে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকবে; সরকারি নাকি বেসরকারি কোম্পানি, পদের নাম, শূন্য পদের সংখ্যা, কোন্ ক্ষেত্র (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও সেবাক্ষেত্র) এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা। কর্মসংস্থানের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রসঙ্গে প্রস্তুত সারণিটি শ্রেণিকক্ষে বিশ্লেষণ করো।

ক্ষেত্র (যেখানে রয়েছে বাণিজ্য ও পরিবহণ এবং সেবাকার্য)। সারণি 7.2 2011-12 সাল সময়কার বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিকের বন্টন দেখায়।

ভারতে কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস হল প্রাথমিক ক্ষেত্র। মাধ্যমিক ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির 24 শতাংশ কাজ করছে। প্রায় 27 শতাংশ শ্রমিক সেবা ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত। সারণি 7.2-এ দেখা যায় যে গ্রামীণ ভারতের 64 শতাংশ শ্রমশক্তি কৃষি ও মৎস্য চাষের উপর নির্ভরশীল। গ্রামীণ শ্রমিকের প্রায় 20 শতাংশ উৎপাদন শিল্প, নির্মাণকার্য এবং অন্যান্য শিল্পের সাথে যুক্ত। প্রায় 16 শতাংশ গ্রামীণ শ্রমিক সেবা ক্ষেত্রে নিয়োজিত, শহরের শ্রমশক্তির প্রায় 35 শতাংশ মাধ্যমিক ক্ষেত্রে নিয়োজিত। কর্মভিত্তিক বিভাজন থেকে দেখা যায়, প্রাথমিক ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী উভয় অংশের শ্রমিকরা বেশি মাত্রায় উপস্থিত রয়েছে। তবে এখানে নারীদের উপস্থিতি পুরুষদের চাইতে বেশি। প্রায় 63 শতাংশ নারী প্রাথমিক ক্ষেত্রে কাজ করছে। পক্ষান্তরে অর্ধেকের কম পুরুষ-শ্রমিক এই ক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছে। পুরুষরা মাধ্যমিক ও সেবা উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করার সুযোগ পায়।

7.6 বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের পরিবর্তনশীল কাঠামো

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে তোমরা পরিকল্পনা-কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত পড়েছ। এখন আমরা কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি ও জিডিপি-র বৃদ্ধি এই দুইটি উন্নয়নমূলক সূচক লক্ষ করব। পরিকল্পিত উন্নয়নের ষাট বছরের পথচলার ক্ষেত্রে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ছিল জাতীয় উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি ঘটিয়ে অর্থনীতির সম্প্রসারণকে সুনিশ্চিত করা।

1950 থেকে 2010 পর্যন্ত সময়কালে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ধনাত্মক বৃদ্ধি ঘটেছিল এবং সেটা কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির চাইতে বেশি ছিল। তবে জিডিপি-র বৃদ্ধিরক্ষেত্রে সবসময়েই উঠা-নামা পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এই সময়সীমায় কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি ২ শতাংশের বেশি ছিল না।

চার্ট 7.3 আমাদের দৃষ্টি টেনে নেয় অপর একটি হতাশজনক উন্নয়ন চিত্রের দিকে। এখানে দেখা যায়, 1990-এর পর কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি ক্রমাগত কমতে থাকে এবং তা ভারতের পরিকল্পনার গোড়ার দিকের বৃদ্ধির

হারের কাছাকাছি নেমে আসে। এই সময়ে আমরা জিডিপি-র বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মধ্যেও বিশাল পার্থক্য দেখতে পাই। এর অর্থ হল, ভারতের অর্থনীতি কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি না করেই অধিক পরিমাণে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করতে সক্ষম। পণ্ডিতগণ এই ঘটনাকে কর্মহীন বৃদ্ধি বলে অভিহিত করছেন।

এখন পর্যন্ত আমরা, জিডিপি-র বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র দেখেছি। এখন আমরা জানব কর্মসংস্থান ও জিডিপি-র বৃদ্ধির এই গতি -প্রকৃতি বিভিন্ন অংশের শ্রমবাহিনীর উপর কী প্রভাব ফেলছে। এর সাথে আমরা এও বুঝতে পারব যে আমাদের দেশে কী ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

চলো, এখন আমরা পূর্ববর্তী অংশে আলোচিত দুইটি সূচকের দিকে ফিরে তাকাই। এই সূচক দুটি হল— বিভিন্ন শিল্প-সংস্থায় মানুষের কর্মসংস্থান এবং কর্মরত মানুষের অবস্থা। আমরা জানি যে, ভারত একটি কৃষি নির্ভর দেশ যার জনসংখ্যার একটি বড় অংশ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে এবং তারা জীবনযাপনের জন্য প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল। ভারত সহ অনেক দেশের উন্নয়নের কৌশল হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে জনগণের নির্ভরশীলতাকে কমিয়ে আনা।

শিল্পক্ষেত্র দ্বারা শ্রমশক্তির যে বন্টন হচ্ছে তা থেকে স্পষ্ট হয় যে, কৃষি কাজ থেকে শ্রমবাহিনীর অকৃষিকাজে স্থানান্তর ঘটেছে। 1972-73 সালে প্রায় 74 শতাংশ লোক প্রাথমিক ক্ষেত্রে কাজ করতেন। 2011-12 সালেতে সংখ্যাটা অনেক কমে 50 শতাংশের আশেপাশে চলে আসে। তবে মাধ্যমিক ও সেবাক্ষেত্র ভারতীয় শ্রমশক্তির সামনে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের হাতছানি দিচ্ছিল। তোমরা হয়তো লক্ষ্য করছ যে, এই ক্ষেত্রগুলোতে কর্মসংস্থানের

চার্ট 7.3 : কর্মসংস্থান ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বৃদ্ধি, 1951-2012 (%)

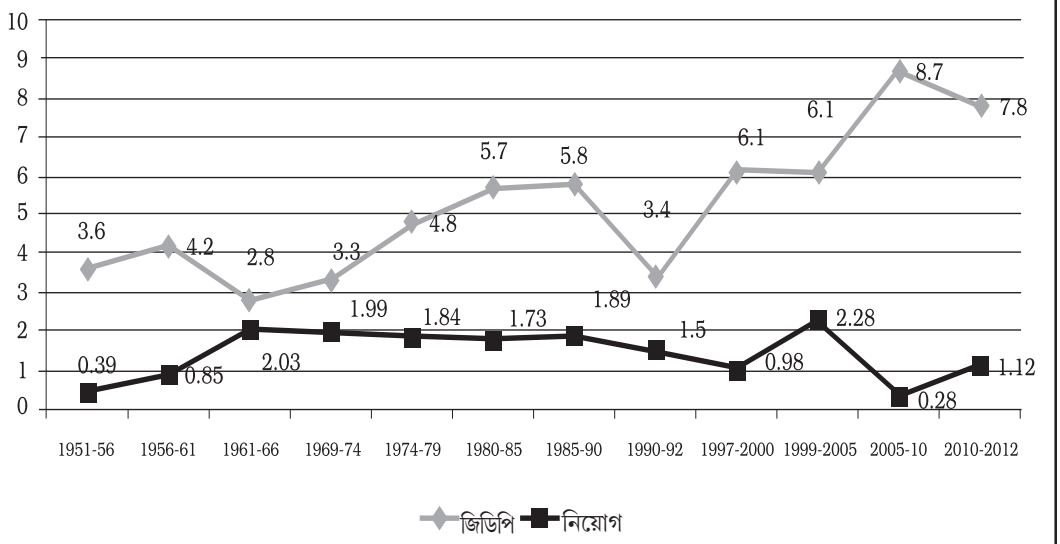

সারনি 7.3

কর্মসংস্থানের ধরনের প্রকৃতি (ক্ষেত্র অনুসারে এবং পেশাগত অবস্থান অনুসারে), 1972-2012 (শতাংশ)

পদ	*1972-73*	*1983*	*1993-94*	*1999-2000*	*2011-2012*
			ক্ষেত্র		
প্রাথমিক	74.3	68.6	64	60.4	48.9
মাধ্যমিক	10.9	11.5	16	15.8	24.3
সেবা	14.8	16.9	20	23.8	26.8
মোট	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
			পেশাগত অবস্থা		
স্বনিযুক্তি	61.4	57.3	54.6	52.6	52.0
নিয়মিত বেতনভোগী কর্মচারী	15.4	13.8	13.6	14.6	18.0
অস্থায়ী মজুরি প্রাপ্ত শ্রমিক	23.2	28.9	31.8	32.8	30.0
মোট	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

অংশীদারিত্ব যথাক্রমে 11 থেকে 24 শতাংশ এবং 15 থেকে 27 শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

শেষ চার দশক (1972-2012) ধরে মানুষ স্বনিযুক্তি এবং নিয়মিত বেতনভোগী কর্মচারী থেকে অস্থায়ী মজুরিপ্রাপ্ত কাজকর্মের দিকে ধাবিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ স্বনিযুক্তি এবং নিয়মিত বেতনভোগী অর্থাৎ বিধিবদ্ধ ক্ষেত্র থেকে অস্থায়ী মজুরির ভিত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে শ্রমশক্তির বিধিবহির্ভূতকরণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এরফলে শ্রমিকরা খুব অসুরক্ষিত হয়ে পড়ে। কীভাবে? পূর্ববর্তী অংশের আমেদাবাদের ঘটনার দিকে লক্ষ করো।

কাজগুলো করো

- তোমরা কি জানো ভারতের মত একটি দেশে কর্মনিযুক্তির হার 2 শতাংশে বজায় রাখা সহজ কাজ নয়? কেন?
- অর্থব্যবস্থায় দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও যদি অর্থব্যবস্থায় কোন অতিরিক্ত নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি না হয় তখন কী হবে? কীভাবে কর্মহীনতার বৃদ্ধি ঘটে?
- অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে যদি বিধিবহির্ভূতকরণ জনগণের উপার্জন বৃদ্ধি করে, তবে এই ধরনের সম্ভাবনাকে সাদরে গ্রহণ করা উচিত। ধরো, কোন এক প্রান্তিক চাষি সম্পূর্ণ সময়ের জন্য কৃষি-শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন, তুমি কি মনে করো যে দৈনিক শ্রমিক হিসাবে কাজ করে সে অধিক মজুরি পেয়ে খুশি? অথবা ঔষধ কোম্পানির একজন স্থায়ী ও নিয়মিত শ্রমিক যদি দৈনিক মজুরি-ভিত্তিক শ্রমিকে পরিণত হয় এবং তার মোট উপার্জনও বাড়ছে, তাহলে কি সে তার এখনকার কাজের প্রকৃতিতে খুশি হবে? বিষয়টা লিখে শ্রেণিকক্ষে মত বিনিময় করো।

7.7 ভারতের শ্রমশক্তির অসংগঠিতকরণ বা বিধিবহির্ভূতকরণ

পূর্ববর্তী বিভাগে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, অস্থায়ী শ্রমিকের আনুপাতিক হার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। স্বাধীন ভারতের উন্নয়ন-পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা যাতে সকল ভারতবাসী মর্যাদা নিয়ে বাঁচার সুযোগ পায়। উন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের গতিধারা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে উন্নত দেশগুলোতে শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে কৃষি ক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের শিল্পের কাজে সুযোগ করে দেয় এবং ফলশ্রুতিতে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানেরও উন্নতি হয়। আমরা পূর্ববর্তী অংশে লক্ষ করেছি যে উন্নয়ন-পরিকল্পনা রূপায়ণের 55 বছর পরেও ভারতের অর্ধেকের বেশি শ্রমশক্তি কৃষির উপর নির্ভরশীল।

অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে অনেক বছর ধরে শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের গুণমান তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। 10-20 বছরের বেশি কাজ করার পরেও কেন কিছু মাতৃত্বকালীন সুযোগ সুবিধা, ভবিষ্যনিধি, গ্রেচুইটি এবং পেনশনের মুখ দেখেন না। কেন সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োজিত একজন কর্মীর তুলনায় বেসরকারি ক্ষেত্রে নিয়োজিত একজন কর্মী সমকাজের জন্য তুলনামূলক কম বেতন পান?

তোমরা হয়তো লক্ষ করবে, ভারতের শ্রমশক্তির একটি ক্ষুদ্র অংশ নিয়মিত উপার্জন করেন। সরকার শ্রম-আইন অনুসারে তাদের অধিকারকে নানাভাবে সংরক্ষিত রাখে। শ্রমশক্তির এই অংশ শ্রমিক-সংঘের গঠন করে তাদের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা রক্ষা কবচগুলোকে কার্যকর করতে এবং নিয়োগ কর্তার কাছ থেকে অধিক মজুরি আদায়ের জন্য দর কষাকষি করতে পারে, তারা কে? তা জানতে আমরা শ্রমশক্তিকে দুটি বিভাগে শ্রেণিবিভক্ত করব। যেসব শ্রমিকরা বিধিবদ্ধ এবং বিধিবহির্ভূত ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত তাদের যথাক্রমে সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্র হিসাবেও অভিহিত করা হয়। সমস্ত সরকারি ক্ষেত্র ও বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানে যেখানে 10 জন বা তার বেশি ভাড়াটে শ্রমিক নিযুক্ত আছে, তাকে সংগঠিত ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান বলে এবং কর্মরত শ্রমিকদের সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক বলে। অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানগুলো এবং ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত শ্রমিকদের নিয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্র গঠিত। এইভাবে অসংগঠিত ক্ষেত্রে লক্ষাধিক কৃষক, কৃষি শ্রমিক, ছোটো প্রতিষ্ঠানের মালিক অন্তর্ভুক্ত। ছোটো প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করে তারা স্বনিযুক্ত কারণ এরা ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগ করে না। এই অসংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে সমস্ত অ-কৃষি কাজে নিযুক্ত অস্থায়ী মজুরিপ্রাপ্ত শ্রমিকরা অন্তর্ভুক্ত যারা একাধিক মালিকের জন্য কাজ করে থাকেন। যেমন — নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত শ্রমিক এবং মাথায় ভারী বোঝা বহনকারী শ্রমিকরা। যেসমস্ত শ্রমিক সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে, তারা সামাজিক সুরক্ষার

বাক্স 7.1 : সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োগ

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য-সংগ্রহকারী সংস্থা থেকে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রক সংগঠিত ক্ষেত্রের বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে। তোমরা কি জানো, ভারতে সংগঠিত ক্ষেত্রের কে প্রধান নিয়োগকর্তা? 2012 সালে প্রায় 30 লক্ষাধিক সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় 18 লক্ষাধিক শ্রমিক সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োজিত। এখানে পুরুষরাই সংখ্যাধিক্য। মহিলারা সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমশক্তির মাত্র প্রায় এক ষষ্ঠাংশ। অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে 1990 সালের প্রথমদিকে আর্থিক সংস্কার কর্মসূচি চালু হওয়ার পর থেকে ভারতে সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগের সংখ্যা নিম্নগামী হতে থাকে।

চিত্র ঃ 7.4 *: রাস্তার পাশে বিক্রি : অসংগটিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির একটি রূপ।*

সুবিধাগুলো ভোগ করে। অসংগটিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের তুলনায় সংগটিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা অধিক উপার্জন করে। সাধারণত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দেখা যায় যে অর্থনীতির সমৃদ্ধির সাথে সাথে অধিক থেকে অধিকতর অংশের শ্রমিক সংগটিত ক্ষেত্রে কাজ পায় এবং অসংগটিত ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত শ্রমিকের অনুপাত হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু ভারতে কী হচ্ছে? নিম্নের চিত্র লক্ষ করো যা শ্রমশক্তির সংগটিত ও অসংগটিত ক্ষেত্রের বণ্টন দেখায়।

7.2 অনুচ্ছেদে আমরা জেনেছিলাম যে, এদেশে প্রায় 473 মিলিয়ন শ্রমিক রয়েছে। বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রে রয়েছে প্রায় 30 মিলিয়ন শ্রমিক। তোমরা কি বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রে নিযুক্ত লোকের শতাংশ হিসাব বের করতে পারবে? তা হবে মাত্র ছয় শতাংশ (30/473×100)! তাই বাকি 94 শতাংশ রয়েছে বিধিবহির্ভূত ক্ষেত্রে। আর 30 মিলিয়ন বিধিবদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের থেকে মাত্র 6 মিলিয়ন অর্থাৎ প্রায় 20 শতাংশ (30/6×100) মহিলা। আর বিধিবহির্ভূত ক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিক হল মোট শ্রমশক্তির 69 শতাংশ।

চার্ট 7.4 : বিধিবদ্ধ/ বিধিবহির্ভূত ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিক (2009-2012)

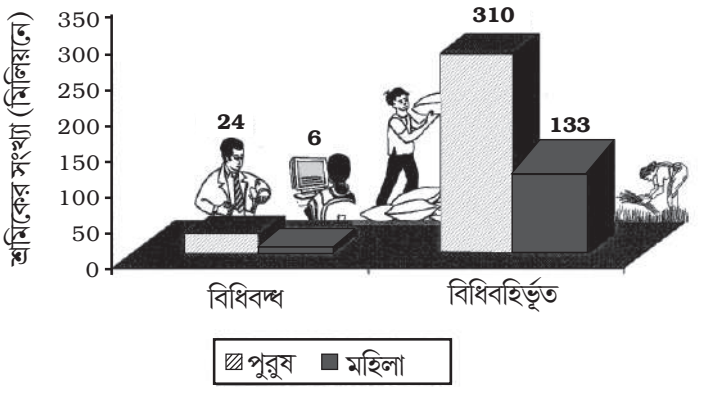

বাক্স 7.2 : আমেদাবাদে বিধিবহির্ভূতকরণ

আমেদাবাদ একটি সমৃদ্ধশালী নগর। এখানকার সমৃদ্ধির উৎস 60টিরও বেশি বস্ত্রবয়ন শিল্পের উপস্থিতি, যেখানে 1,50,000 শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে। এই শ্রমিকরা বিগত শতাব্দী ধরে একটা নিশ্চিত পরিমাণে আয় অর্জন করেছিল। তাদের সুরক্ষিত কাজ ছিল এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত মজুরি ছিল। একইসাথে তারা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ছিল যা তাদের স্বাস্থ্য ও বার্দ্ধক্যকালীন জীবনকে সুরক্ষিত রেখেছে। তাদের একটা শক্তিশালী শ্রমিক-সংঘ ছিল যা কেবল শ্রম-বিবাদেই তাদের প্রতিনিধিত্ব করত না বরং শ্রমিকদের এবং তাদের পরিবারের উন্নতিকল্পে ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যেত। 1980 -এর প্রথমদিকে সারা দেশে বস্ত্রবয়ন শিল্পগুলো বন্ধ হতে শুরু করে। কিছুস্থানে যেমন মুম্বাই-এ কারখানাগুলি তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমেদাবাদে, এই বন্ধ হওয়ার প্রক্রিয়াটি 10 বছর দীর্ঘায়িত হয়। এই সময়কালে প্রায় 40,000 এর বেশি স্থায়ী শ্রমিক এবং 50,000 এর বেশি অস্থায়ী শ্রমিক তাদের কাজ হারায় এবং বিধিবহির্ভূত ক্ষেত্রে এসে সামিল হয়। এই নগরটি অর্থনৈতিক মন্দা এবং জন বিক্ষোভ, বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয়। সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে বিধিবহির্ভূত ক্ষেত্রে তথা দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়। এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল ব্যাপক মদ্যপান এবং আত্মহত্যায়; শিশুদের বিদ্যালয় পাঠে ছেদ টানা হয় এবং কাজে পাঠানো হয়।

একটি ঘরে শক্তির ভারসাম্যতার পরিবর্তন : *একজন বেকার শিল্প শ্রমিক রসুনের খোসা ছাড়াচ্ছেন যেখানে তার স্ত্রীর বিড়ি বানানোর নতুন কাজে যোগ দিল।*

উৎস ঃ *রেনানা ঝাববালা, রত্না এম সুদর্শন এবং জীমোল উন্নী (Ed.) ইনফরমাল ইকোনমি এট সেন্ট্রাল স্টেজঃ নিউ স্ট্রাকচার্স অব এমপ্লয়মেন্ট, সেজ পাবলিকেশন্স, নিউ দিল্লি, 2003 পৃষ্ঠা 265*

1970 এর দশকের শেষদিক থেকে ভারত সহ অনেক উন্নয়নশীল দেশ উদ্যোগ ও বিধিবহির্ভূত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের উপর মনোযোগ দেয় যেহেতু বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়োগ থমকে পড়েছিল। বিধিবহির্ভূত ক্ষেত্রে, শ্রমিকরা এবং উদ্যোক্তারা নিয়মিত আয় পায় না; সরকারের পক্ষ থেকেও তাদের জন্য কোন সুরক্ষা বা নিয়মকানুন নেই। শ্রমিকদের কোন ক্ষতিপূরণ ছাড়াই বরখাস্ত করা হয়। আবার বিহির্ভূত উদ্যোগ ক্ষেত্রে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, তা সেকেলে। উদ্যোক্তারা কোন হিসাবও রক্ষা করে না। এসমস্ত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা বস্তি অঞ্চলে বসবাস করে থাকে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন (ILO) এর প্রচেষ্টায় ভারত সরকার বিধিবহির্ভূত ক্ষেত্রের

কাজগুলো করো

নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে যেগুলি বিধিবহির্ভূত ক্ষেত্রের অন্তর্গত, সেগুলিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও

- একটি হোটেলের শ্রমিক, যেখানে সাতজন ভাড়াটে শ্রমিক ও তিনজন পরিবারের সদস্য।
- একজন বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক যেখানে 25 জন শিক্ষক কর্মরত।
- একজন পুলিশ কনস্টেবল
- একটি সরকারি হাসপাতালের নার্স
- একজন রিক্সা-চালক
- একটি কাপড়ের দোকানের মালিক যেখানে নয়জন শ্রমিক কর্মরত।
- এমন একটি বাস কোম্পানির চালক যেখানে 10টি বাস, 20 জন চালক, কন্ডাক্টর ও অন্যান্য শ্রমিক রয়েছে।
- এমন একটি নির্মাণ-কোম্পানিতে কর্মরত নির্মাণ-প্রকৌশলী যেখানে 10 জন শ্রমিক রয়েছে।
- রাজ্য সরকারের দপ্তরের অস্থায়ীরূপে কর্মরত কম্পিউটার অপারেটর।
- বিদ্যুৎ দপ্তরের একজন করণিক ।

আধুনিকীকরণের এবং এই ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রদানে উদ্যোগী হয়েছে।

7.8 বেকারত্ব

তোমরা অনেক লোককে দেখে থাকবে সংবাদপত্রে চাকরির খোঁজ করতে। কেউ কেউ চাকরি বা কাজের খোঁজ করেন তাদের বন্ধু বা আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে। বিভিন্ন শহরে, তোমরা দেখে থাকবে কিছু লোক ঐ দিনের জন্য কাজের প্রত্যাশায় একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কারখানায় যায় এবং দপ্তরে যায়। তারা সেখানে তাদের বায়োডাটা দিয়ে জানতে চায় তাদের যোগ্য কোন শূন্যপদ রয়েছে কিনা। গ্রামীণ এলাকায় অনেকেই কাজের খোঁজে বাইরে যায় না এবং

চিত্র 7.5 : *বেকার কারখানার শ্রমিক অনিয়মিত কাজের অপেক্ষায়।*

চিত্র 7.6 *: আখ কাটাইকারী শ্রমিক : কৃক্ষিক্ষেত্রে ছদ্ম বেকারত্ব সাধারণ চিত্র।*

যখন কাজ না থাকে, তারা বাড়িতেই থাকে। কেউ কর্মসংস্থান বিনিময় কেন্দ্রে যান এবং কর্মসংস্থান বিনিময় কেন্দ্রের মাধ্যমে শূন্যপদ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির জন্য নিজেদের নাম নথিভুক্ত করে। NSSO বেকারত্বকে এমন একটা পরিস্থিতি হিসেবে সূচিত করে, যেখানে ব্যক্তি কাজের অভাবে কাজ করতে পারছে না — কিন্তু কর্ম-বিনিময় সংস্থা, মধ্যস্থতাকারি অথবা বন্ধু বা আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে কাজ খুঁজছে। আবার দরখাস্ত করার মাধ্যমে বর্তমান কাজের পরিস্থিতিতে ও পারিশ্রমিকে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। একজন বেকার ব্যক্তিকে বিভিন্ন উপায়ে চিহ্নিত করা যায়। অর্থনীতিবিদ্‌রা বেকার ব্যক্তি বলতে এমন একজনকে বোঝায় যে অর্ধেক দিনে এক ঘণ্টার রোজগারও অর্জন করতে পারে না।

ভারতবর্ষে বেকারত্ব সম্পর্কিত তথ্যের জন্য তিনটি উৎস রয়েছে। ভারতে জনগণনার প্রতিবেদন, চাকরি ও বেকারত্ব অবস্থা সম্পর্কিত জাতীয় নমুনা -সমীক্ষা সংস্থার প্রতিবেদন এবং নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সাধারণ পরিচালকমণ্ডলীর কর্মসংস্থান বিনিময় কেন্দ্রের সাথে নথিকরণের তথ্য। যদিও এই উৎসগুলো বেকারত্ব সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন অনুমান সরবরাহ করে, তবুও এগুলো ভারতে বেকারত্বের লক্ষণ ও বেকারত্বের প্রকারভেদ সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করে।

আমাদের অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব রয়েছে কি? এই খণ্ডের প্রথম অনুচ্ছেদে একটি পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাকে বলা হয় উন্মুক্ত বেকারত্ব। ভারতের কৃষিক্ষেত্রে যে বেকারত্ব রয়েছে, অর্থনীতিবিদ্‌রা তাকে ছদ্ম-বেকারত্ব বলে। ছদ্ম-বেকারত্ব আসলে কী? ধরা যাক, একজন কৃষকের চার একর জমি আছে এবং বছরে বিভিন্ন কৃষিজ কাজগুলো সম্পাদনের জন্য তার নিজেকে সহ আরও দু'জন মাত্র শ্রমিকের প্রয়োজন। কিন্তু সে যদি পাঁচজন শ্রমিককে নিয়োগ করে এবং সাথে তার পরিবারের সদস্য যেমন তার স্ত্রী ও শিশুকে নিয়োগ করে, এই পরিস্থিতিটা ছদ্ম-বেকারত্ব হিসেবে পরিচিত। একটা সমীক্ষা যা 1950 এর দশকের শেষদিকে করা হয়েছিল তা দেখিয়েছিল যে, ভারতে কৃষিজ শ্রমিকের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছদ্ম-বেকার।

তোমরা হয়তো দেখে থাকবে যে অনেক লোক শহরাঞ্চলে চলে আসে, সেখানে কাজ বেছে নেয় এবং কিছু সময়ের জন্য ঐখানে থাকে। কিন্তু, যখনই বর্ষা ঋতু শুরু হয়, তারা তাদের নিজ গ্রামে ফিরে আসে। তারা কেন এমন করে? এটা এজন্য যে কৃষিক্ষেত্রে কাজ মরশুমি প্রকৃতির। বছরের সবগুলো মাসের জন্য সেখানে কাজের সুযোগ থাকে না। যখন কৃষিক্ষেত্রে করার মত কোন কাজ না থাকে, লোকেরা শহরাঞ্চলে যায় এবং

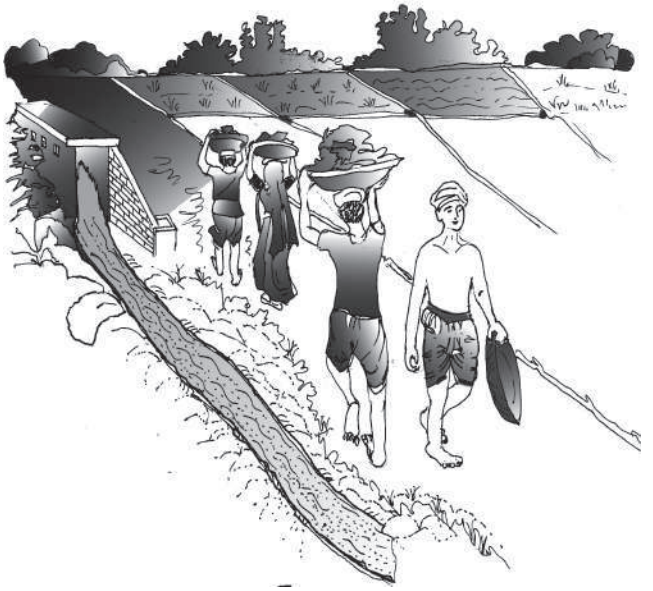

চিত্র 7.7 *: বাঁধ নির্মাণ, সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নিয়োগ সৃজন।*

কাজের খোঁজ করে। এই ধরনের বেকারত্বকে মরশুমি বেকারত্ব বলে। এটা ভারতে প্রচলিত বেকারত্বের একটি সাধারণ রূপ।

যদিও আমরা নিয়োগের ধীর অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করি। তথাপি তোমরা কি দেখেছ খুব দীর্ঘ সময় ধরে লোক বেকার রয়েছে? বিশেষজ্ঞরা বলেন, ভারতে লোকেরা দীর্ঘ সময় ধরে সম্পূর্ণভাবে বেকার থাকতে পারে না, কারণ তাদের সঙ্গিন আর্থিক অবস্থা তাদেরকে এমন থাকতে দেবে না। তোমরা বরং তাদেরকে দেখতে পাবে কষ্টকর কাজ গ্রহণ করতে যা আর অন্য কেউ করবে না। ঐ কাজ নিরানন্দের অথবা ঝুঁকিপূর্ণও হতে পারে। এমনকি পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপরিষ্কার অথবা অস্বাস্থ্যকরও হতে পারে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার অনেক উদ্যোগ নেয় এবং নিম্ন আয়ভুক্ত পরিবারগুলোকে, উপযুক্ত জীবিকার সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য নিয়োগ সৃষ্টি করে। এটা পরবর্তী খণ্ডে আলোচনা করা হবে।

7.9 সরকার এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি

তোমরা মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন 2005 এর কথা মনে করতে পার। এই আইনে গ্রামীণ গরিব পরিবারের যেসকল প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা অদক্ষ কায়িক শ্রম করতে ইচ্ছুক, সেরকম প্রত্যেক পরিবারকে নির্ধারিত হারে মজুরির ভিত্তিতে বছরে অন্তত 100 দিনের কাজ দেওয়া। গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, গ্রামের হতদরিদ্র মানুষের কাছে আয় রোজগারের রাস্তা খুলে দিতে স্বাধীনতার পর থেকে সরকার অনেক কর্মসূচি নিয়েছে। কিন্তু এই প্রথম কোন প্রকল্প গ্রামের মানুষদের ন্যূনতম মজুরিতে কাজের নিশ্চয়তা দিল।

স্বাধীনতার সময়কাল থেকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি নিয়োগ সৃষ্টি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাদের প্রচেষ্টাকে ব্যাপকভাবে দু'ভাবে শ্রেণিবিভক্ত করা যায় — প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। যেমন তোমরা পূর্ববর্তী খণ্ডে দেখেছ, প্রথম শ্রেণির ক্ষেত্রে, সরকার বিভিন্ন বিভাগে প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে লোক নিয়োগ করে। সরকার অনেক কারখানা, হোটেল এবং পরিবহণ কোম্পানিও চালায় এবং সরাসরি শ্রমিকদের রোজগার সরবরাহ করে। যখন সরকারি উদ্যোগ থেকে পণ্য ও সেবার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তখন বেসরকারি

উদ্যোগগুলো যারা সরকারি উদ্যোগ থেকে কাঁচামাল গ্রহণ করে, তারাও তাই অর্থব্যবস্থায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন সরকারি মালিকানাসম্পন্ন একটি স্টিল কোম্পানি তার উৎপাদন বৃদ্ধি করে, তা সরাসরিভাবে ঐ সরকারি কোম্পানিতে নিয়োগ বাড়াবে। একইসাথে বেসরকারি কোম্পানিগুলো যারা ঐ সরকারি কোম্পানি থেকে স্টিল ক্রয় করে, তারাও তাদের উৎপাদন ও নিয়োগবৃদ্ধি করবে। এটা হল অর্থনীতিতে সরকারি উদ্যোগ দ্বারা পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

চতুর্থ অধ্যায়ে তোমরা লক্ষ করে থাকবে যে, অনেক কার্যক্রম যা সরকার বাস্তবায়ন করে, তার লক্ষ্য নিয়োগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ। এগুলিও নিয়োগ সৃষ্টির কার্যক্রম হিসেবে পরিচিত। এই সমস্ত কার্যক্রমগুলোর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র নিয়োগ সরবরাহ করা নয়। এরা বিভিন্নক্ষেত্রে সেবাও সরবরাহ করে। যেমন — প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা, গ্রামে পানীয় জল, পুষ্টি আয় ও নিয়োগ সৃষ্টির সম্পদ ক্রয়ের জন্য জনগণকে সাহায্য করা, মজুরিযুক্ত নিয়োগ সৃষ্টির মাধ্যমে সম্পত্তির বিকাশ বা উন্নতি, গৃহ ও স্বচ্ছতা সুবিধার নির্মাণ, গৃহ নির্মাণের জন্য সাহায্য, গ্রামীণ এলাকায় রাস্তা নির্মাণ, পতিত জমি বা অধঃপতিত জমির উন্নতিসাধন।

7.10 উপসংহার

ভারতের কর্মশক্তির কাঠামোর একটা পরিবর্তন হয়েছে। সেবা ক্ষেত্রে দেখা গেছে নতুন উদীয়মান কাজের সূর্যোদয় সেবাক্ষেত্রের বিস্তার এবং উন্নত প্রযুক্তির আবির্ভাবের কারণে এখন ছোট উদ্যোগ তথা কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগ অথবা বিশিষ্ট শ্রমিক বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সাথে প্রতিস্পর্ধায় টিকে থাকতে পারে। কাজের আউটসোর্সিং এখন একটি সাধারণ প্রথা হয়ে যাচ্ছে। এর অর্থ হল— একটি বড় কারখানা তার নিজের বিশেষ বিভাগ বা ক্ষেত্র (যেমন— বৈধ কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বা গ্রাহক সেবা অনুবিভাগ)-কে বন্ধ করে ছোটো উদ্যোগ অথবা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের যারা অনেকসময় অন্যান্য দেশেরও হতে পারে তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে ছোটো ছোটো খণ্ডে বিভক্ত করে কাজ হস্তান্তর করলে লাভপ্রদ হবে বলে মনে করা হয়। ফলে, আধুনিক কারখানা বা দপ্তরের পরম্পরাগত ধারণা এমনভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে যে অনেকের জন্য ঘরই কার্যক্ষেত্রে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই সমস্ত কিছু পরিবর্তন ব্যক্তিগত শ্রমিকদের পক্ষে যায়নি। বরং শ্রমিকদের সীমিত সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্যতার মধ্য দিয়ে নিয়োগ প্রকৃতি আরও অপ্রথাগত হয়ে গেছে।

গত দুটি দশকে, দেশের মোট দেশীয় উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু, একইসাথে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়নি। এটা বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সরকারকে উদ্যোগ নিতে বাধ্য করেছে।

সংক্ষিপ্ত বৃত্তি

- যেসকল ব্যক্তিরা বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকে এবং স্থূল জাতীয় উৎপাদনে অবদান রাখে, তারাই হল শ্রমিক।
- দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত।
- পুরুষরা বিশেষতঃ গ্রামীণ পুরুষেরাই হল ভারতের শ্রমশক্তির মূল অংশ।
- ভারতে কর্মরত শ্রমিকদের অধিকাংশই হল স্বনির্ভর, সাময়িক মজুরির শ্রমিক এবং নিয়মিত বেতনভুক কর্মচারীদের সম্মিলিত সংখ্যা।
- ভারতের মোট শ্রমশক্তির প্রায় তিন-পঞ্চমাংশেরই জীবন-জীবিকার প্রধান উৎস হল কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম।
- ইদানিংকালে কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি নিম্নগামী হয়ে পড়েছে।
- সংস্কার পরবর্তী সময়কালে ভারতে সেবাক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মূলত অপ্রথাগত ক্ষেত্রে কাজের এই সুযোগ বেড়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থানের প্রকৃতি হল অস্থায়ী।
- বিধিবদ্ধ বা প্রথাগত ক্ষেত্রের মুখ্য নিয়োগকর্তা হল সরকার।
- গ্রামীণ ভারতে বেকারত্বের একটি সাধারণ রূপ হল ছদ্ম-বেকারত্ব।
- ভারতে শ্রমশক্তির কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে।
- বিভিন্ন ধরনের নীতি এবং প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

অনুশীলনী

1. শ্রমিক কে?
2. 'শ্রমিক জনসংখ্যার অনুপাত'-এর সজ্ঞা দাও।
3. নিম্নলিখিতরা কি কর্মী — একজন ভিক্ষুক, একজন চোর, চোরাকারবারি, জুয়াড়ি? কেন?
4. অসদৃশ ব্যক্তিটি বের করো i) সেলুনের মালিক, ii) একজন মুচি, iii) মাদার ডেয়ারির একজন

কোষাধ্যক্ষ, iv) একজন গৃহশিক্ষক, v) পরিবহন নিয়ন্ত্রক, vi) নির্মাণ কর্মী।

5. নতুনভাবে সৃষ্টি হওয়া কাজগুলোর অধিকাংশই দেখা দিয়েছিল ——— ক্ষেত্রে (সেবা/পণ্য উৎপাদন)
6. চারজন ভাড়াটে শ্রমিক নিয়ে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় ——— (বিধিবদ্ধ/বিধিবহির্ভূত) ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান।
7. রাজ বিদ্যালয়ে যায়। যখন সে বিদ্যালয়ে থাকে না, তুমি তাকে দেখতে পাবে খামারে কাজ করছে। তুমি কি তাকে কর্মী হিসেবে গণ্য করতে পারো? কেন?
8. শহরাঞ্চলের নারীদের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে বেশি কর্মরত নারী দেখা যায়। কেন এমনটা হয়?
9. মিনা হল একজন গৃহিনী। গৃহস্থালীর কাজকর্ম সামলানোর পাশাপাশি সে একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করে। দোকানটির মালিক এবং পরিচালক হল তার স্বামী। এক্ষেত্রে তাকে কি একজন কর্মী হিসেবে গণ্য করা যায়? কেন?
10. অসদৃশ ব্যক্তিটিকে বের কর ঃ-

    i) রিক্সাচালক যিনি একজন রিক্সা মালিকের রিক্সা চালান। ii) রাজমিস্ত্রি

    iii) ঔষুধের দোকানের কর্মী iv) জুতো পালিসকারী বালক
11. নিম্নোক্ত সারণিটিতে 1972-73 সালে ভারতের শ্রমশক্তির বিন্যাসের তথ্য রয়েছে। সারণিটি পর্যালোচনা করো এবং শ্রমশক্তির এরূপ বিন্যাসের কারণ ব্যাখ্যা করো। তোমরা লক্ষ্য করবে যে, তথ্যগুলো 30 বছর আগে ভারতের পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

বসবাসের স্থান	শ্রমশক্তি (দশলক্ষের হিসেবে)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
গ্রামীণ	125	69	195
শহর	32	7	39

12. নিম্নোক্ত সারণিটি 1999-2000 সালের ভারতের মোট জনসংখ্যার এবং কর্মী-জনসংখ্যার অনুপাতকে দেখায়। তোমরা কি এই সারণি থেকে ভারতের শ্রমশক্তির পরিমাণ (শহর এবং মোট শ্রমশক্তি) গণনা করতে পারবে?

অঞ্চল	জনসংখ্যার আনুমানিক পরিমাণ (কোটি)	আনুমানিক কর্মী-জনসংখ্যার অনুপাত	আনুমানিক কর্মী সংখ্যা (কোটি)
গ্রামীণ	71.88	41.9	$71.88 \times 41.9 = 30.12$
শহর	28.52	33.7	?
মোট	100.40	39.5	?

13. গ্রামীণ এলাকার তুলনায় শহরে নিয়মিত বেতনের কর্মচারীর সংখ্যা বেশি কেন?
14. নিয়মিত বেতনের কর্মসংস্থানে মহিলাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম কেন?
15. ভারতের সাম্প্রতিককালের শ্রমশক্তির ক্ষেত্রগত বিন্যাসের ধারণাটি বিশ্লেষণ করো।
16. 1970-এর দশকের তুলনায় বিভিন্ন শিল্পগুলোতে শ্রমশক্তির বিন্যাসের ক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এই বিষয়ে মন্তব্য করো।
17. তোমরা কি মনে কর যে, বিগত 50 বছরে ভারতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ধারাটি দেশের জিডিপি বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? কিভাবে?
18. বিধিবহির্ভূত ক্ষেত্রের পরিবর্তে বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা কি প্রয়োজনীয়? কেন?
19. ভিক্টর দিনে কেবল দুই ঘণ্টার জন্য কাজ পায়। বাকি সময় সে কেবল কাজের খোঁজে ঘুরে। সে কি বেকার?
20. তুমি একটি গ্রামে বসবাস করছ। যদি তোমাকে বলা হয় গ্রাম পঞ্চায়েতকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য। তবে গ্রামের উন্নতি এমনকি কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য তুমি কী ধরনের কর্মসূচি গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করবে?
21. অস্থায়ী মজুরি-শ্রমিক কারা?
22. একজন শ্রমিক বিধিবহির্ভূত ক্ষেত্রে কর্মরত কিনা তা তুমি কীভাবে জানতে পারবে?

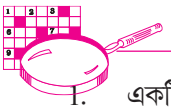

প্রস্তাবিত অতিরিক্ত কাজ

1. একটি অঞ্চলকে বেছে নাও, যেমন কোনো সরণি বা কোন বসতি এলাকা এবং একে 3-4টি উপ অঞ্চলে ভাগ করো। একটি সমীক্ষা করো যার মাধ্যমে সেখানে বসবাসরত প্রত্যেকটি মানুষের কাজকর্ম সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে পারবে। প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য কর্মক্ষম মানুষ-জনসংখ্যার অনুপাত বের করো। বিভিন্ন উপঅঞ্চলের এই অনুপাতের হেরফেরকে ব্যাখ্যা করো।
2. ধরো, 3-4টি ছাত্র দলকে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলগুলো ভাগ করে দেওয়া হলো। এদের মধ্যে একটি অঞ্চলে বিশেষত ধান চাষ করা হয়। অন্য একটি অঞ্চলের প্রধান বাগিচা চাষ হল নারিকেল। তৃতীয় অঞ্চলটি হল উপকূলবর্তী অঞ্চল যেখানে মাছ ধরাই হল প্রধান কর্মকাণ্ড। চতুর্থ অঞ্চলটির পাশেই একটি নদী রয়েছে, এই অঞ্চলটিতে পশুপালনের কাজকর্ম করা হয়। এই চারটি অঞ্চলে কি ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায় সেই সম্পর্কে চারটি ছাত্র দলকেই প্রতিবেদন তৈরি করতে বলো।
3. একটি স্থানীয় পাঠাগারে যাও এবং সেখানে ভারত সরকার দ্বারা সাপ্তাহিকভাবে প্রকাশিত 'এমপ্লয়মেন্ট নিউজ'টি দেখ। বিগত দুইমাসে প্রকাশিত প্রত্যেকটি সংখ্যা পড়ো। সেখানে সাতটি সংখ্যা হবে। এদের থেকে 25টি বিজ্ঞপ্তি চয়ন করো এবং নিম্নোক্ত সারণিটি পূরণ করো। (প্রয়োজনে সারণিটি সম্প্রসারণ করো)। শ্রেণিকক্ষে কাজগুলোর প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

বিষয়	1 নং বিজ্ঞপ্তি	2 নং বিজ্ঞপ্তি
1. অফিসের নাম 2. দপ্তর / কোম্পানি 3. সরকারি / বেসরকারি /যৌথ উদ্যোগ সংস্থা 4. পদের নাম 5. ক্ষেত্র : প্রাথমিক/ মাধ্যমিক / সেবাক্ষেত্র 6. পদের সংখ্যা / শূন্য পদের সংখ্যা 7. প্রয়োজনীয় যোগ্যতা		

4. তোমার এলাকাতে চালু বিভিন্ন সরকারি কাজকর্ম হয়তো তোমার নজরে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ রাস্তা নির্মাণ করা, পুকুর সংস্কার করা, বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, হাসপাতাল এবং অন্যান্য সরকারি অফিস নির্মাণ, জল প্রতিরোধক বাঁধ এবং গরিবদের জন্য বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি কাজগুলো। এধরনের একটি কর্মকাণ্ডের উপর একটি সমালোচনামূলক মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি করো। মূল্যায়নের বিষয়বস্তুতে যা থাকতে পারে তা হল — (ক) কাজটা কীভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, (খ) কাজের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (গ) বরাদ্দকৃত অর্থে স্থানীয় মানুষের অবদান যদি কিছু থাকে, (ঘ) কাজে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা - পুরুষ এবং নারী উভয়ই, (ঙ) মজুরির হার, (চ) ঐ অঞ্চলে এই ধরনের কাজের প্রয়োজনীয়তা কি প্রকৃতপক্ষেই ছিল এবং যে প্রকল্পের আওতায় এই কাজ হচ্ছে সে প্রকল্পের রূপায়ণের যথার্থতা সম্পর্কে সমালোচনামূলক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করো।
5. সাম্প্রতিককালে, তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছো যে, পাহাড়ি এবং খরাপ্রবণ অঞ্চলে অনেক স্বেচ্ছাসেবক সংস্থাও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। তোমরা যদি তোমাদের অঞ্চলে এধরনের কোন পদক্ষেপ লক্ষ করে থাকো, তবে এগুলো পর্যবেক্ষণ করো এবং একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

REFERENCES

CHADHA, G.K. and P.P. SAHU, 2002. 'Post-reform Setbacks in Rural Employment: Issues that need further scrutiny.' *Economic and Political Weekly*, May 25, pp.1998-2026.

DESAI, S and M.B.DAS. 2004. 'Is Employment Driving India's Growth Surge', *Economic and Political Weekly*, July 3, pp. 3045-3051.

GHOSE, AJIT K. 1999. 'Current Issues of Employment Policy in India.' *Economic and Political Weekly*, September 4, pp. 2592-2608.

HIRWAY, INDIRA. 2002. 'Employment and Unemployment Situation in 1990s: How Good are NSS Data.' *Economic and Political Weekly*, May 25, pp. 2027-2036.

JACOB, PAUL. 1986. 'Concept of 'work' and estimates of 'workforce' — An appraisal of the treatment of activities relating to non-marketed output,' *Sarvekshana*, Vol.IX, No.4, April.

KULSHRESHTHA, A.C., GULAB SINGH, ALOK KAR and R.L. MISHRA. 2000. 'Workforce in the Indian National Accounts Statistics,' *The Journal of Income and Wealth*, Vol.22, No.2, July, pp. 3-39.

PRADHAN, B.K. and M.R.SALUJA. 1996. 'Labour Statistics in India: A Review.' *Margin*, July-September, Vol.28, Number 4, pp. 319-347.

RATH, NILAKANTHA. 2001. 'Data on Employment, Unemployment and Education: Where to go from here?' *Economic and Political Weekly*, June 9, pp. 2081-2087.

SUNDARAM, K. 2001. 'Employment-Unemployment Situation in the Nineties: Some Results from NSS 55th Round Survey', *Economic and Political Weekly*, March 17, pp. 931-940.

SUNDARAM, K. 2001. 'Employment and Poverty in 1990s: Further Results from NSS 55th Round Employment-Unemployment Survey, 1999-2000,' *Economic and Political Weekly*, August 11, pp. 3039-3049.

VISARIA, PRAVIN. 1996. 'Structure of the Indian Workforce, 1961-1994,' *The Indian Journal of Labour Economics*, Vol.39, No.4, pp. 725-740.

Government Reports

Annual Reports, Ministry of Labour, Government of India, Delhi.

Census of India 2011, Primary Census Abstract, Registrar General of Census Operations, Ministry of Home Affairs, Government of India, Delhi.

Economic Survey, Ministry of Finance, Government of India.

Reports on Employment and Unemployment Situation in India, Ministry of Statistics and Planning, Government of India.

Websites

www.censusofindia.nic.in
www.mospi.nic.in

8

পরিকাঠামো

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থীরা সক্ষম হবে —

- সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে ভারত কী ধরনের প্রধান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে তা বুঝতে।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকাঠামোর ভূমিকা সম্পর্কে জানতে।
- পরিকাঠামোর উপাদান হিসাবে শক্তির ভূমিকা কী তা বুঝতে।
- শক্তি (energy) এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের সমস্যা ও প্রত্যাশাগুলো বুঝতে।
- ভারতের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিকাঠামো সম্বন্ধে বুঝতে।

"আমাদের প্রয়োজনীয় অনেক কিছুর জন্য আমরা অপেক্ষা করতে পারি, শিশু পারে না। তাকে আমরা 'আগামীকাল' বলতে পারি না। তার নাম হল আজ"। পরিকাঠামো এমনই।

— Gabrriella Mistral - Chilean Poet

8.1 ভূমিকা

তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছ, কেন ভারতের কিছু রাজ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ভালো প্রদর্শন করছে? কেন ভারতের পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং হিমাচলপ্রদেশ কৃষি ও উদ্যান ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করেছে? কেন গুজরাট ও মহারাষ্ট্র শিল্পের দিক থেকে অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে? কীভাবে কেরালা, যা 'দেবতার নিজস্ব ভূমি' নামে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পয়ঃপ্রণালী ও নিষ্কাশন ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে এবং ভ্রমণ পিপাসুদের অধিক হারে আকৃষ্ট করেছে? কেন কর্ণাটকের তথ্য প্রযুক্তি শিল্পবিশ্বকে আকৃষ্ট করছে?

— এর অন্যতম কারণ হল এইসব রাজ্যগুলো ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পরিকাঠামো ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি সাধন করেছে। কিছু রাজ্যের জলসেচ ব্যবস্থা উন্নত, আবার অন্য রাজ্যগুলোর পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত অথবা বন্দরের সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ায় খুব সহজেই নির্মাণজাত শিল্পের জন্য কাঁচামাল আহরণ করতে পারে। কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালুরু শহর অধিক সংখ্যক বহুজাতিক সংস্থাকে আকৃষ্ট করতে পেরেছে কারণ সেটি বিশ্বমানের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রদান করেছে। এই সকল কাঠামোগত সুবিধাই দেশের উন্নতির পথে সহায়ক হয়েছে এবং দেশের পরিকাঠামো হয়ে উঠেছে। তাহলে কীভাবে পরিকাঠামোগত সুবিধা উন্নয়নের পথকে সুগম করে?

8.2 পরিকাঠামো কী?

শিল্প সংক্রান্ত এবং কৃষিজাত উৎপাদন, দেশীয় এবং বৈদেশিক ব্যবসাবাণিজ্য--- এইসব প্রধান ক্ষেত্রগুলোতে পরিকাঠামো একটি সহায়ক পরিসেবা প্রদান করছে। এই পরিসেবার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হল — রাস্তাঘাট, রেল ব্যবস্থা, সামুদ্রিক বন্দর, বিমানবন্দর, বাঁধ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, তৈল ও গ্যাসের পাইপলাইন, টেলি যোগাযোগের সুব্যবস্থা, দেশের বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা, হাসপাতাল সহ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্ন পানীয় জলের সুবিধাসহ উন্নত স্বাস্থ্যবিধি, পয়ঃপ্রণালী ও নিষ্কাশণ ব্যবস্থা, ব্যাংক, বিমা ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থা সহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। এইসকল সুবিধাগুলির মধ্যে কয়েকটি পণ্য উৎপাদনে ও পরিসেবার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে

চিত্র 8.1 : *রাস্তা হচ্ছে প্রবৃদ্ধির সাথে হারানো যোগসূত্র।*

চিত্র 8.2 *: বিদ্যালয় দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো।*

বাকিগুলো অর্থনীতির সামাজিক ক্ষেত্র নির্মাণে পরোক্ষভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

কেউ কেউ পরিকাঠামোকে দুটি ভাগে ভাগ করে — অর্থনৈতিক ও সামাজিক। অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে শক্তি, পরিবহণ ও যোগাযোগ অন্যতম। অন্যদিকে সামাজিক পরিকাঠামোর অন্তর্গত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বাসস্থান।

কাজগুলো করো

তুমি পাড়া বা সন্নিহিত অঞ্চলে বিভিন্ন পরিকাঠামোগত সুবিধা ভোগ করে থাকবে। তাদের সবগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করো। তোমার পাড়াতে আরও অনেক ধরনের পরিকাঠামোর আবশ্যিকতা থাকতে পারে। তাদেরও একটি পৃথক তালিকা প্রস্তুত করো।

8.3 পরিকাঠামোর প্রাসঙ্গিকতা

পরিকাঠামো হল এমন একটি সহযোগী প্রণালী যার উপর আধুনিক শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির দক্ষ কার্যপ্রণালী নির্ভর করে। আধুনিক কৃষিও ব্যাপকভাবে পরিকাঠামোর উপর নির্ভর করে, যার মধ্যে রয়েছে আধুনিক রাস্তাঘাট, রেলওয়ে এবং জলপথে যোগাযোগের সুবিধার মতো পরিকাঠামোগুলো যা দ্রুত ও বৃহৎ মাত্রায় বীজের পরিবহণ, কীটনাশক, রাসায়নিক সার এবং কৃষিজ উৎপাদন বিপণনে সাহায্য করে। সাম্প্রতিককালে কৃষিক্ষেত্রকে বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদনের জন্য বিমা এবং ব্যাংকিং সুবিধাগুলোর উপর নির্ভর করতে হয়।

পরিকাঠামো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দুই দিক থেকে সাহায্য করে — উৎপাদনের উপকরণের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে এবং দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটিয়ে। অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো স্বাস্থ্যের উপর একাধিক বিরূপ প্রভাব ফেলে। পানীয় জলের সরবরাহ এবং পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়নের ফলে রোগের সম্ভাবনা হ্রাসের সাথে সাথে প্রধান জলবাহিত রোগের প্রকোপ যেমন কমে, তেমনি সেইসমস্ত রোগের তীব্রতাও হ্রাস পায়। অধিকন্তু এটা স্পষ্ট যে, পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী এবং স্বাস্থ্যের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট যোগাযোগের পাশাপাশি পরিবহণ এবং যোগাযোগ সংক্রান্ত পরিকাঠামোর গুণমান ও স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রটিকে প্রভাবিত করে। বিশেষত ঘনবসতি ক্ষেত্রগুলোতে পরিবহণ সংক্রান্ত দূষণ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকির প্রভাব রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে থাকে।

8.4 ভারতের পরিকাঠামোর অবস্থা

চিরাচরিতভাবে সরকারই দেশের পরিকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্বভার গ্রহণ করে আসছে। কিন্তু এটা লক্ষ করা গেছে যে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ

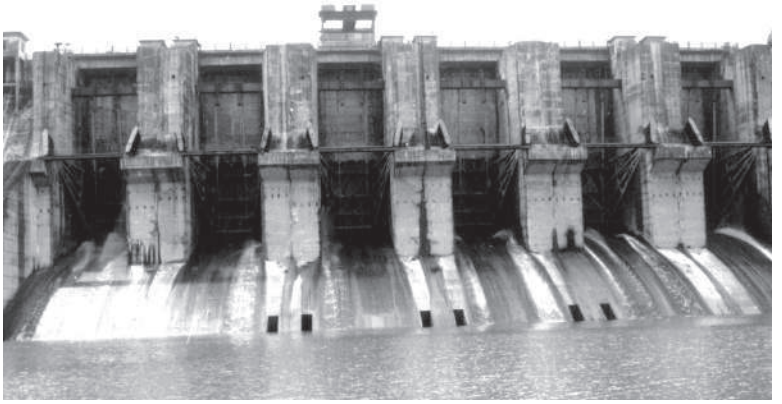

চিত্র 8.3 *: বাঁধ ঃ উন্নয়নের মন্দির।*

অপর্যাপ্ত। বর্তমানে পরিকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি ক্ষেত্রে নিজেই এবং সরকারি ক্ষেত্রের সাথে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামীণ ক্ষেত্রে বসবাস করে। বিশ্বব্যাপী কারিগরি অগ্রগতি সত্ত্বেও গ্রামীণ মহিলারা এখনও জৈব জ্বালানি যেমন — শস্যের অবশিষ্ট্যাংশ, গোবর ও জ্বালানিকাঠ ইত্যাদি ব্যবহার করে তাদের জ্বালানির প্রয়োজন মেটায়। তারা জ্বালানি, জল এবং অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আহরণ করতে দূরদূরান্তে পাড়ি দেয়। 2001 সালের আদমশুমারী দেখায় যে, ভারতের গ্রামীণ এলাকার 56 শতাংশ পরিবারে বিদ্যুতের ব্যবস্থা রয়েছে এবং 43 শতাংশ পরিবারে এখনো কেরোসিন ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রায় 90 শতাংশ গ্রামীণ পরিবার রান্নার কাজে জৈব জ্বালানি ব্যবহার করে। মাত্র 24 শতাংশ গ্রামীণ পরিবারই নল দ্বারা সরবরাহকারী পানীয় জলের সুযোগ ভোগ করছে। প্রায় ৭৬ শতাংশ জনগণ কূয়া, জলাধার, পুকুর, হ্রদ, নদী, খাল ইত্যাদি উন্মুক্ত জলের উৎসকে পানীয় জলের উৎস হিসাবে ব্যবহার করছে। গ্রামীণ এলাকার মাত্র 20 শতাংশ লোকই স্বাস্থ্যবিধিসম্মত উন্নত শৌচালয়ের সুবিধা পাচ্ছে।

সারণি 8.1 লক্ষ করো, যেখানে অন্যান্য কিছু দেশের সঙ্গে ভারতের কিছু পরিকাঠামোগত অবস্থার তুলনা করা হয়েছে। যদিও সকলেই অবগত যে পরিকাঠামোই উন্নয়নের মূল ভিত্তি তথাপি ভারত এখনও এই বিষয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ভারত তার GDP-র মাত্র 34 শতাংশ পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ করছে যা চিন এবং ইন্দোনেশিয়ার তুলনায় খুবই নগণ্য।

চিত্র 8.4 *: পাকা বাড়িসহ নিরাপদ পানীয় জল : এখনও একটি স্বপ্ন।*

সারণি 8.1

ভারত এবং অন্যান্য দেশের কিছু পরিকাঠামো

দেশ	*GDP*-র শতাংশ হিসাবে পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ *(2014)**	সুরক্ষিত পানীয় জলের উৎস প্রাপ্তি *(2015)*	উন্নত শৌচ ব্যবস্থা প্রাপ্তি *(%) (2015)*	মোবাইল ব্যবহারকারী *100* লোক *(2015)*	বিদ্যুৎ উৎপাদন (প্রতিঘণ্টায় বিলিয়ন) কিলোওয়াট *(2016)*
চিন	46	96	77	93	6015
হংকং	24	92	100	229	39
ভারত	34	94	40	79	1423
দক্ষিণ কোরিয়া	29	98	100	119	549
পাকিস্তান	15	91	64	70	105**
সিঙ্গাপুর	29	100	100	146	49**
ইন্দোনেশিয়া	35	87	61	132	249

উৎস : *বিশ্ব উন্নয়ন সূচক 2017 বিশ্বব্যাংকের ওয়েবসাইট www.worldbank.org. (2014 সালের তথ্যানুসারে) স্থূল মূলধন গঠনের তথ্যগুলি দেখো; https://yearbook.enerdate.net.*

কাজগুলো করো

➢ যখন তুমি সংবাদপত্র পড় তখন তুমি ভারত নির্মাণ, বিশেষ প্রয়োজনভিত্তিক বাহন (Special Purpose Vehicle, SPV), বিশেষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, নির্মাণ পরিচালন হস্তান্তর (Build operate Transfer, BOT), সরকারি- বেসরকারি অংশীদারিত্ব— ইত্যাদি শব্দগুলো পড়েছ। একটি স্ক্রেপবুক (Scrapbook)-এ এই সংক্রান্ত শব্দযুক্ত সংবাদগুলো লিপিবদ্ধ করো। এই শব্দগুলো পরিকাঠামোর সাথে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত ?

➢ এই অধ্যায়ের শেষে প্রদত্ত উল্লেখ থেকে আরও অন্যান্য পরিকাঠামোর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করো।

কিছু সংখ্যক অর্থনীতিবিদ্ অনুমান করেছেন যে এখন থেকে আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসাবে পরিগণিত হবে। এইজন্য ভারতকে তার পরিকাঠামোর উপর বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। যে-কোনো দেশে যখন আয় বাড়তে শুরু করে তখন পরিকাঠামোর গঠনের চাহিদারও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসতে শুরু করে। স্বল্প আয় সম্পন্ন দেশগুলোর ক্ষেত্রে জলসেচ, পরিবহণ এবং বিদ্যুৎ— এইসব মৌলিক পরিকাঠামোগুলোই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যখন অর্থ ব্যবস্থা উন্নত হতে শুরু করে এবং তার মৌলিক ভোগের চাহিদাগুলো পরিপূর্ণ হতে শুরু করে, তখন থেকেই অর্থ ব্যবস্থায় কৃষির অবদান কমতে শুরু করে এবং সেবাক্ষেত্র সংক্রান্ত পরিকাঠামো গঠন আবশ্যক হয়ে পড়ে। এ জন্যই উচ্চ আয় সম্পন্ন দেশগুলোতে বিদ্যুৎ এবং টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত পরিকাঠামোগুলোর গুরুত্ব অধিক।

অতএব, পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন হাত ধরাধরি করে চলে। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জলসেচের উন্নয়নের সুবিধা এবং এর পর্যাপ্ত বিস্তারের উপর কৃষি নির্ভর করে। শিল্পের অগ্রগতি, শক্তি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহণ এবং যোগাযোগের উপর নির্ভর করে। স্পষ্টতই, যদি পরিকাঠামোর উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ না করা হয় তাহলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এই অধ্যায়ে শুধুমাত্র দু-ধরনের পরিকাঠামোর

উপর আলোকপাত করা হবে, সেগুলো হল শক্তি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত।

8.5 শক্তি

আমাদের কেন শক্তির প্রয়োজন? কোন্ কোন্ রূপে এটি পাওয়া যায়? একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। শিল্পক্ষেত্রের জন্য এটা অত্যাবশ্যক। বর্তমানে এটা বৃহৎ মাত্রায় কৃষি এবং তৎসংক্রান্ত ক্ষেত্র যেমন উৎপাদন এবং পরিবহণ, সার, কীটনাশক ঔষধ এবং ফার্মে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে কাজে লাগে। বাড়িঘরে এটা রান্না, আলোক এবং উত্তাপের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। তুমি কী এমন কোনো দ্রব্য উৎপাদন ও পরিসেবার কথা ভাবতে পারো যেখানে শক্তির ব্যবহার নেই?

চিত্র 8.6 *: গ্রামীণ পরিবহণের ক্ষেত্রে গরুর গাড়ি এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।*

শক্তির উৎসসমূহ :

শক্তির বাণিজ্যিক এবং অবাণিজ্যিক উৎস আছে। বাণিজ্যিক উৎসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল কয়লা, পেট্রোল এবং বিদ্যুৎ। যেহেতু এগুলো ক্রয়-বিক্রয় হয়। অবাণিজ্যিক শক্তির উৎসগুলো হল — জ্বালানি কাঠ, কৃষি বর্জ্য, শুকনো গোবর বা ঘুঁটে ইত্যাদি। যেহেতু এদের প্রকৃতিতে বা বনজঙ্গলে পাওয়া যায় তাই এদের অবাণিজ্যিক শক্তির উৎস বলা হয়।

যেখানে বাণিজ্যিক শক্তির উৎসগুলো (জলবিদ্যুৎ ব্যতিত) ক্ষয়শীল সেখানে অবাণিজ্যিক শক্তির উৎসগুলো নবীকরণযোগ্য। ভারতের 60 শতাংশেত্র অধিক পরিবার দৈনন্দিন রান্না ও উত্তাপের জন্য এখনও চিরাচরিত শক্তির উৎসগুলোর উপর নির্ভরশীল।

চিত্র 8.5 *: জ্বালানিকাঠ শক্তির প্রধান উৎস।*

অপ্রচলিত শক্তির উৎস :

শক্তির বাণিজ্যিক এবং অবাণিজ্যিক উভয় উৎসগুলি একত্রে প্রচলিত শক্তির উৎস নামে পরিচিত। এছাড়াও শক্তির আরও তিনটি উৎস রয়েছে — সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি এবং জোয়ার-ভাঁটা থেকে প্রাপ্ত শক্তি (tidal power) যাদের সাধারণত অপ্রচলিত শক্তির উৎস বলে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হওয়ার কারণে ভারতে এই তিনধরনের শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সীমাহীন সম্ভাবনা আছে। যদি কিছু যথার্থ ব্যয় সংকোচনমূলক কার্যকরী কৌশল ব্যবহার করা যায়, যা সহজলভ্য। এমনকি আরও সস্তা কৌশল বিকশিত করা যেতে পারে।

চিত্র 8.8 *: সৌরশক্তির বৃহৎ সম্ভাবনা রয়েছে।*

চিত্র 8.7 : *বায়ুকল : শক্তি উৎপাদনের অন্য একটি উৎস ।*

বাণিজ্যিক শক্তির ভোগের ধরন :

ভারতে মোট ব্যবহৃত শক্তির 74 শতাংশ বাণিজ্যিক শক্তির দ্বারা পূরণ করা হয়। এরমধ্যে বৃহৎ অংশ আসে কয়লা থেকে (54 শতাংশ), 32 শতাংশ আসে তেল থেকে, 10 শতাংশ আছে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে, এবং 2 শতাংশ আসে জলশক্তি থেকে। অবাণিজ্যিক শক্তির উৎসের মধ্যে রয়েছে জ্বালানি কাঠ, গবুর গোবর এবং কৃষিজাত বর্জ্য যা মোট ব্যবহৃত শক্তির 26 শতাংশেরও বেশি। ভারতের শক্তিক্ষেত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হল অপরিশোধিত তেল এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের আমদানির উপর নির্ভরশীলতা, যা নিকট ভবিষ্যতে খুবই দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাবে এবং এটা অর্থনীতির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

8.2 সারণিতে বাণিজ্যিক শক্তির ভোগের ক্ষেত্রগত বন্টন দেখানো হয়েছে। 1953-54 সালে পরিবহণ ক্ষেত্র ছিল বণিজ্যিক শক্তির সর্ববৃহৎ উপভোক্তা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পরিবহণ ক্ষেত্রে শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ ক্রমাগত কমতে শুরু করে, অন্যদিকে পরিবার, কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ বাড়তে শুরু করে। সমস্ত বাণিজ্যিক শক্তি ভোগের ক্ষেত্রে তেল এবং গ্যাসের অবদান

সারণি 8.2

বাণিজ্যিক শক্তির ক্ষেত্রগত ভোগের প্রবণতা (শতাংশে)

ক্ষেত্র	*1953-54*	*1970-71*	*1990-91*	*2014-15*
পরিবার	10	12	12	23
কৃষি	01	03	08	18
শিল্প	40	50	45	44
পরিবহণ	44	28	22	2
অন্যান্য	5	07	13	13
মোট	**100**	**100**	**100**	**100**

উৎস : *নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা VOL-II অধ্যায় 6, পরিকল্পনা কমিশন, ভারত সরকার, নিউদিল্লি এন্ড এনার্জি স্ট্যাটিসটিক্স -2016, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, পরিসংখ্যান সংক্রান্ত মন্ত্রক এবং প্রকল্প রূপায়ণ বিভাগ, ভারত সরকার।*

সর্বাধিক। অর্থনৈতিক বিকাশের দ্রুতহারে বৃদ্ধির সাথে সাথে শক্তি ব্যবহারের পরিমাণও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শক্তি/বিদ্যুৎ শক্তি :

শক্তির উৎসগুলোর মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ দৃশ্যমান সেটি হল বিদ্যুৎ শক্তি, যা আধুনিক সভ্যতায় অগ্রগতির সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। এটা পরিকাঠামো ক্ষেত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা যেকোনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নির্ধারণ করে। সাধারণভাবে GDP বৃদ্ধির হারের তুলনায় শক্তির চাহিদা বৃদ্ধির হার অধিক হয়। সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, প্রতি বছরে GDP বৃদ্ধির হার 8 শতাংশ অর্জন করতে হলে শক্তির জোগান বাৎসরিক 12 শতাংশ হারের কাছাকাছি হওয়া আবশ্যক।

2016 সালে, ভারতে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার 67 শতাংশ এসেছিল তাপীয় উৎস থেকে। অন্যদিকে, জলবিদ্যুৎ এবং পারমাণবিক শক্তি থেকে আসত যথাক্রমে 14 শতাংশ এবং 2 শতাংশ । ভারত সরকারের শক্তি সংক্রান্ত নীতি, জল এবং বায়ু এই দুটি শক্তির উৎসকে উৎসাহিত করে যেহেতু এরা জীবাশ্মগত জ্বালানির উপর নির্ভরশীল নয় এবং কার্বন নির্গমন পরিহার করে। তথাপিও, এই দুই উৎস থেকে দ্রুতহারে বিদ্যুৎ উৎপাদন আশানুরূপ হয়নি।

চার্ট 8.1 : ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন উৎস, 2016

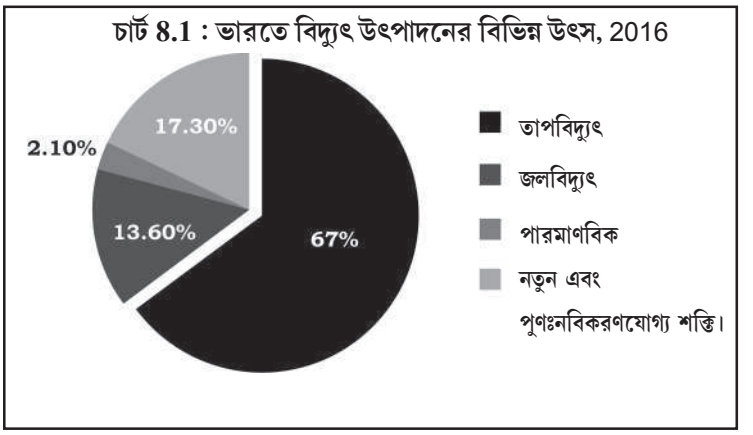

আণবিক শক্তি হল বিদ্যুৎ শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস যার অর্থনৈতিক সুবিধা রয়েছে। বর্তমানে, পারমাণবিক শক্তি মোট শক্তি ভোগের কেবলমাত্র 2 শতাংশ যেখানে বিশ্বে এর গড়মান

কাজগুলো করো

- অন্যান্য শক্তির উৎসগুলোর মধ্যে, তুমি কি লক্ষ্য করছ যে পারমাণবিক শক্তি থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুতের অংশ খুবই সামান্য। কেন?
- সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি এবং জোয়ারভাটা থেকে প্রাপ্ত শক্তিগুলিই নিকট ভবিষ্যতে শক্তির উৎস হয়ে দাঁড়াবে। তাদের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী কী? তোমার শ্রেণিতে তুমি তা নিয়ে আলোচনা করো।

হল 13 শতাংশ। এটা বাকি বিশ্বের তুলনায় অনেক কম। সেজন্য কিছু কিছু বিশেষজ্ঞদের মতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে আণবিক (পারমাণবিক) উৎসের ব্যবহার অধিক করা উচিত, অন্যদিকে কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ পরিবেশগত এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। তুমি কী মনে করো?

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের কিছু চ্যালেঞ্জ :

বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুতের সম্পূর্ণ অংশ চূড়ান্ত ভোক্তাদের দ্বারা ভোগ করা হয় না, এর একটা অংশ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিজস্ব আনুষঙ্গিক কাজে ব্যবহৃত হয়। অপর একটি অংশ বিদ্যুৎ প্রেরণের সময় নষ্ট হয়। বিদ্যুতের বাকি অংশ যা আমরা ঘরবাড়ি, অফিস এবং কলকারখানায় পেয়ে থাকি তা হচ্ছে নিট প্রাপ্তি।

বর্তমানে ভারতের বিদ্যুৎক্ষেত্র যে সমস্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে তার মধ্যে কয়েকটি হল ঃ

(ক) ভারতের বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বাৎসরিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার 7-8 শতাংশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয়। বিদ্যুতের চাহিদার ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা মেটাতে হলে ভারতে বাণিজ্যিক শক্তির যোগান প্রায় 7 শতাংশ হারে বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমানে ভারত প্রতিবছর মাত্র 20,000 মেগাওয়াট নতুন ক্ষমতা যুক্ত করতে পারছে। উপরন্তু যে সমস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো রয়েছে তাদের ক্ষমতারও পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না, কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না।

(খ) রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলো বিদ্যুৎ বন্টনের ক্ষেত্রে

বাক্স 8.1 : একটি পার্থক্য রচনা

পরিবেশ বান্ধব রূপে থানে শহরে একটি নতুন পরিবর্তিত ছবি দেখা যাচ্ছে। সৌরশক্তি, যাকে আগে সুদূরের ধারণা মনে করা হত যাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে অসম্ভব ভাবা হত, বর্তমানে বৃহৎ মাত্রায় ব্যবহৃত হচ্ছে, যা থেকে বাস্তবিক লাভ হচ্ছে এবং এর ফলে ব্যয় সংকোচনের সাথে সাথে শক্তিরও সঞ্চয় হচ্ছে। সৌরশক্তিকে জল গরম করতে, ট্রাফিক লাইট প্রজ্জ্বলনে এবং বিজ্ঞাপন হোর্ডিং-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। সৌরশক্তির এই ধরনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে থানে পৌরনিগম অগ্রণী স্থান দখল করে নিয়েছে। শহরের সকল নবনির্মিত অট্টালিকায় জল গরম করার ক্ষেত্রে সৌরশক্তির প্রয়োগকে অনিবার্য করা হয়েছে, যা 'একটি পার্থক্য রচনা' শীর্ষক, 1 আগস্ট 2005 — কলামে প্রকাশিত হয়েছে।

➢ তুমি কি এই ধরনের অপ্রচলিত শক্তির আরও কার্যকরী ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্য কোনো উদাহরণ দিতে পারো?

বক্স 8.2 : বিদ্যুৎ বণ্টন : দিল্লির ক্ষেত্রে

স্বাধীনতার পরে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে চারবার বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন হয়েছে। 1951 সালে দিল্লি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ (DSEB) গঠিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে 1958 সালে দিল্লি বিদ্যুৎ বণ্টন/যোগান নিগম (DESU) গঠিত হয়। 1997 সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে দিল্লি বিদ্যুৎ পর্ষদ (DVB), রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ (SEB) রূপে আত্মপ্রকাশ করে বর্তমানে বিদ্যুৎ বণ্টনের কাজটি দুটি বেসরকারি সংস্থানের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। যেগুলো হল — Reliance Energy Ltd. (BSES Rajdhani Power Ltd এবং BSES Yamuna Power Ltd) এবং Tata Power Ltd (NDPL)। এরা দিল্লির প্রায় 46 লাখ গ্রাহকের বিদ্যুতের যোগান দিয়ে থাকে। দিল্লি বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন (DERC) দ্বারা বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণগত বিষয়গুলো পরিচালিত হয়। যদিও আশা করা হয়েছিল যে বিদ্যুৎ বণ্টন এবং ভোক্তাদের সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের উন্নতি লক্ষ করা যাবে, কিন্তু অভিজ্ঞতার নিরিখে ফলাফল অসন্তোষজনক।

500 বিলিয়নের অধিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এর কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হল প্রেরণ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে ক্ষতি, বিদ্যুতের সঠিক দাম নির্ধারণ না হওয়া এবং অন্যান্য অদক্ষতা। কিছু কিছু বিশেষজ্ঞদের মতামত হল যে কৃষকদের মধ্যে বণ্টনই ক্ষতির প্রধান কারণ। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যুতের চুরি হওয়াও রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের (SEBs) সমস্যার কারণ হচ্ছে।

(গ) বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণ এবং ভূমিকা এখনও কম। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা।

(ঘ) ভারতের বিভিন্ন অংশে বিদ্যুতের উচ্চমূল্য এবং অধিক সময় ধরে বিদ্যুতের চপলতাই (Powercuts) জনগণের অসন্তোষের কারণ।

(ঙ) ভারতের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো যা ভারতের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের প্রধান অবলম্বন, তা কাঁচামাল ও কয়লার যোগানের অপ্রতুলতায় ভুগছে।

বাক্স 8.3 : শক্তির সঞ্চয় : CFL এবং LED বাল্‌ব ব্যবহারে উৎসাহ প্রদানের ঘটনা

শক্তি কার্যকুশলতা ব্যুরো-র মত অনুসারে সাধারণ বাল্বের তুলনায় CFL বাল্ব 80 শতাংশ বিদ্যুৎ কম খরচ করে। ইন্দো-এশিয়ান নামক CFL নির্মাতার বক্তব্য হল যে, দশ লক্ষ (1 million) 100 ওয়াট বাল্বের পরিবর্ত হিসাবে যদি 20 ওয়াট CFL বাল্‌ব ব্যবহার করা হয় তাহলে 80 মেগাওয়াট বিদ্যুতের সাশ্রয় হয়। এরফলে 400 কোটি টাকা খরচ বাঁচে।

আজকাল বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে LED (Light Emitting Diode) বাতি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। LED বাল্‌ব, Incandescent বাল্বের এক দশমাংশ (1/10) বিদ্যুৎ এবং CFL -এর অর্ধেক পরিমাণ (1/2) বিদ্যুৎ খরচ করে সমপরিমাণ আলো প্রদান করে। শক্তি কার্য্যকুশলতা ব্যুরো-এর মতানুসারে UJALA প্রকল্পের লক্ষ্য হল উজ্জ্বল বাল্‌বের পরিবর্তে LED বাল্‌ব ব্যবহার করা যা 5905 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে। এই পরিবর্তনের ফলে একটি পরিবারের বার্ষিক গড়ে 4000 টাকা সাশ্রয় হতে পারে এবং এটা থেকে স্পষ্টত বলা যায় যে ন্যূনতম প্রতিস্থাপন ব্যয় এবং দক্ষতা বৃদ্ধির কারণে একটি পরিবারের বার্ষিক গড়ে 4000 টাকা সঞ্চয় হতে পারে।

কাজগুলো করো

➢ তুমি কী ধরনের শক্তি তোমার বাড়িতে ব্যবহার কর। তোমার বাবা-মার কাছ থেকে জেনে নাও— বিভিন্ন ধরনের শক্তি ব্যবহারে প্রতি মাসে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে।

➢ কে তোমাদের শক্তির যোগান দেয় এবং তা কোথা থেকে উৎপন্ন হয়? তুমি কি অন্য কোনো সস্তা বিকল্প শক্তির উৎসের নাম বলতে পারো যা তোমাদের ঘরে আলো জ্বালাতে বা খাদ্য তৈরিতে বা একস্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণে সাহায্য করে?

➢ নীচের সারণিটি লক্ষ করো। তুমি কী মনে কর শক্তির ব্যবহার উন্নয়নের একটি কার্যকরী সূচক?

দেশ	*2015* সালে মাথাপিছু *GDP* (ডলারে) *(ppp)*	*2014* সালে শক্তির ব্যবহার (মাথাপিছু সমতুল্য তেল কেজিতে)
ভারত	5730	637
ইন্দোনেশিয়া	10,835	884
ইজিপ্ট	10,250	815
ইউ কে	38,866	2777
জাপান	35,804	3471
ইউ এস এ	52,704	6957

উৎস : *বিশ্ব উন্নয়ন সূচক, 2017, www.worldbank.org*

➢ তোমার এলাকা/রাজ্যে কীভাবে শক্তির বণ্টন হয় তা লক্ষ করো। একইসঙ্গে তোমার শহরের মোট বিদ্যুতের চাহিদা কতটুকু তা বের করো এবং তা কীভাবে পূরণ করা হয় তা যাচাই করো।

➢ তুমি লক্ষ করে থাকবে যে জনগণ বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য শক্তির সাশ্রয়ে অনেক ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, গ্যাস-স্টোভ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্যাস এজেন্সিগুলো গ্যাসের সঠিক এবং পরীক্ষিত ব্যবহারের উপর বিভিন্ন ধরনের উপদেশ দিয়ে থাকে। তুমি এই বিষয়গুলো নিয়ে তোমার বাবা-মা ও বয়ঃজ্যেষ্ঠদের সাথে আলোচনা করো এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করে তোমার শ্রেণিতে আলোচনা করো।

একইভাবে নিরন্তর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে ভারতে বিদ্যুতের চাহিদা বর্তমানের উৎপাদনের তুলনায় অধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিক সরকারি বিনিয়োগ, উন্নত গবেষণা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা, অন্বেষণ, প্রকৌশলগত উদ্ভাবন এবং পুনঃনবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলোই বাড়তি বিদ্যুতের যোগান নিশ্চিত করতে পারে।

স্থাপিত বিদ্যুৎ ক্ষমতার পাশাপাশি বিদ্যুৎক্ষেত্রের বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ না করে সরকার বিদ্যুৎক্ষেত্রের বেসরকারিকরণের পথে হেঁটেছে (বিশেষ করে বিদ্যুতের বন্টনের (8.2 বাক্স দেখো)) এবং বিদ্যুতের উচ্চমূল্য নির্ধারণকে মান্যতা দিয়েছে। ফলে কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের উপর এর খারাপ প্রভাব পড়েছে (3.3 বাক্স দেখো)। তুমি কি মনে কর এটা সঠিক নীতি?

8.6 স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য বলতে শুধুমাত্র রোগমুক্ত হওয়াকেই বোঝায় না, এটা কারোর ভেতরের কর্ম সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করার ক্ষমতাকেও বোঝায়। স্বাস্থ্যই যে-কোন ব্যক্তির সুখ সমৃদ্ধির মানদণ্ড। স্বাস্থ্য একটি জাতির সম্পূর্ণ সমৃদ্ধি এবং বিকাশের সাথে যুক্ত পূর্ণ প্রক্রিয়া। যদিও বিংশ শতাব্দীতে মানব স্বাস্থ্যের বিশ্ব রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়েছে, যেটা ইতিহাসে অতুলনীয় তথাপি ব্যবস্থা পরিমাপের একটি সেটের মাধ্যমে যে-কোনো রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন হবে। সাধারণতঃ বিভিন্ন সূচক যেমন শিশু মৃত্যুর হার, মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার, প্রত্যাশিত আয়ু, পুষ্টি স্তর তৎসঙ্গে সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের ঘটনাগুলোকে বিচার করে বিশেষজ্ঞরা মানুষের স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা মূল্যায়ন করেন।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিকাঠামোর উন্নয়নই একটি দেশের দ্রব্য ও পরিসেবা উৎপাদনে সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন মানবশক্তিকে সুনিশ্চিত করে, বর্তমান সময়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত হল যে জনগণের স্বাস্থ্য সুবিধা প্রাপ্ত করার অধিকার রয়েছে আর নাগরিকদের স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের অধিকার সুনিশ্চিত করা সরকারেরই দায়িত্ব। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পরিকাঠামোর অন্তর্গত বিষয়গুলো হল - হাসপাতাল, ডাক্তার, সেবিকা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী, বিছানা, হাসপাতালের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং এক উন্নত ঔষধ প্রস্তুতকারী ক্ষেত্র। এটাও সত্য যে, এই সমস্ত স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পরিকাঠামোগুলোর উপস্থিতিই কেবলমাত্র জনগণের স্বাস্থ্যবান হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত নয়। সমস্ত জনগণের কাছে এই সুবিধাগুলো পৌঁছাতে হবে। উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রারম্ভিক স্তর থেকে নীতিনির্ধারণ করা জোর দিয়েছিলেন। যাতে অর্থ প্রদানের অক্ষমতার জন্য কেউ চিকিৎসা সুবিধার আরোগ্যকারী ও প্রতিরোধকারী সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত না হয়। কিন্তু আমরা কি এই লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছি? বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পরিকাঠামোগুলো সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমরা ভারতের স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করব।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অবস্থা :

সরকারের সকল স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয়গুলোর পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণে একটি সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা রয়েছে, যার মধ্যে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় শিক্ষা,খাদ্যে ভেজাল,

চিত্র 8.9 : *দেশের অধিকাংশ অংশে এখনও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পরিকাঠামোর অভাব।*

ঔষধ ও বিষাক্ত দ্রব্য, চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পেশা, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, মানসিক প্রতিবন্ধকতা ও উন্মত্ততা অন্তর্ভুক্ত। কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ পরিষদের সহায়তায় বিস্তৃত নীতি এবং পরিকল্পনার উন্নতি সাধন করে। এই সংস্থাটি বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে এবং আর্থিক ও কারিগরি দিক দিয়ে রাজ্য সরকার, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং অন্যান্য সংস্থাকে দেশে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্মসূচি রূপায়ণে সহায়তা করে।

সময়ের সাথে সাথে ভারত বিভিন্ন স্তরে এক বিশাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং জনশক্তি বিকশিত করেছে। গ্রামীণ স্তরে সরকার দ্বারা বিভিন্ন ধরনের হাসপাতাল তৈরি করা হয় যা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নামে পরিচিত (8.5 বক্স দেখো)। ভারতের আরও অধিক সংখ্যক হাসপাতাল আছে যেগুলি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। এইসব হাসপাতালগুলো মেডিকেল কলেজ, ফার্মেসি কলেজ এবং নার্সিং কলেজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক এবং অর্ধচিকিৎসাকর্মী (Professionals and Para-medical professionals) দ্বারা পরিচালিত হয়।

স্বাধীনতার সময় পরবর্তীকালে স্বাস্থ্য পরিষেবায় উল্লেখযোগ্য বিস্তার ঘটেছে। 1951 থেকে 2013 সালের মধ্যে সরকারি হাসপাতাল এবং ঔষধালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে 9300 থেকে 44000 হয়েছে এবং হাসপাতালের বিছানার সংখ্যা বেড়ে 1.2 লক্ষ থেকে 6.3 লক্ষ দাঁড়িয়েছে। একইসঙ্গে নার্সিং কর্মীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়ে 0.18 লক্ষ থেকে 23.44 লক্ষ হয়েছে এবং অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারের সংখ্যা 0.62 লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 9.2 লক্ষ হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর বিস্তারের ফলে গুটিবসন্ত ও গিনিকৃমি রোগের দূরীকরণ সম্ভব হয়েছে এবং পোলিও কুষ্ঠরোগের প্রায় নির্মূলন ঘটেছে।

সারণী 8.3

ভারতে সরকারি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পরিকাঠামো, ১৯৫১-২০১৫

বিষয়	*1951*	*1981*	*2000*	*2014-15*
হাসপাতাল (সরকারি)	2,694	6,805	15,888	19,653
বিছানা (সরকারি)	1,17,000	5,04,538	7,19,861	7,54,724
ঔষধালয়	6,600	16,745	23,065	26,325
প্রাথমিক স্বাস্থকেন্দ্র	725	9,115	22,842	25,308
উপকেন্দ্র	-	84,736	1,37,311	53,655
সংমিশ্রিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র	-	761	3,043	5,396

উৎস : *ন্যাশনাল কমিশন অব ম্যাক্রোইকোনমিক্স এন্ড হেলথ্, স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার, নিউদিল্লি, ২০০৫, বিভিন্ন বছরের জাতীয় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে www.cbhidghs.nic.in*

বেসরকারি ক্ষেত্রের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো :

সাম্প্রতিককালে সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা ক্ষেত্র পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ততটা সফল হয়নি যা আমরা পরবর্তী অংশে অধ্যয়ন করব। অপরদিকে, বেসরকারি ক্ষেত্রের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের মাত্রা প্রতিনিয়ত এবং দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতের 70 শতাংশের বেশি হাসপাতাল বেসরকারি ক্ষেত্র দ্বারা পরিচালিত। এইসব হাসপাতালগুলোতে মোট বিছানার প্রায় দুই পঞ্চমাংশ (2/5) বিদ্যমান। প্রায় 60 শতাংশের কাছাকাছি ঔষধালয় একইভাবে বেসরকারি ক্ষেত্র দ্বারা পরিচালিত। তারা 40 শতাংশ বহির্বিভাগীয় রোগী এবং 46 শতাংশ অন্তর্বিভাগীয় রোগীদের স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদান করে থাকে।

সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারি ক্ষেত্র চিকিৎসা সম্বন্ধীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা সংক্রান্ত কৌশল রোগ নির্ধারণ, ঔষধের প্রস্তুতকরণ ও বিক্রয়, চিকিৎসালয় নির্মাণ এবং স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। 2001-2002 সালে 13 লাখের বেশি চিকিৎসা উদ্যোগ 22 লক্ষ জনগণকে কর্মসংস্থান প্রদান করেছে, এদের মধ্যে 40 শতাংশের বেশি চিকিৎসা উদ্যোগের মালিকানা একজনের হাতেই ন্যস্ত এবং তিনি

বাক্স 8.5 : ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

ভারতের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং স্বাস্থ্য সুবিধাগুলো ত্রিস্তরীয় হয়ে থাকে— প্রাথমিক, মধ্য এবং সর্বোচ্চ বা তৃতীয় গঠন সংক্রান্ত। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে — প্রচলিত স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির জ্ঞান তথা এগুলোকে সনাক্তকর, প্রতিরোধকরণ এবং নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি, খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি ও পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রদান এবং পর্যাপ্ত পানীয় জলের ও মৌলিক পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার যোগান, মাতৃত্বকালীন ও শিশু স্বাস্থ্যের দেখাশোনা, প্রধান প্রধান সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে টিকাকরণ এবং আঘাতের চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় ঔষধের যোগান দেওয়া।

গ্রামীণ ক্ষেত্রগুলোতে সহায়ক সেবিকা ধাত্রী কর্মীরাই হলেন প্রথম স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদানকারী। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার জন্য গ্রামীণ এলাকা এবং ছোটো শহরগুলোতে হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে যেগুলোর প্রত্যেকটি একজন ডাক্তার, একজন নার্স এবং সীমিত পরিমাণ ঔষধ দিয়ে পরিচালিত হয়। এই হাসপাতালগুলো প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং উপকেন্দ্র নামে পরিচিত। যখন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দ্বারা রোগির অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হয় না তখন তাকে মধ্যশ্রেণিভুক্ত এবং তৃতীয় গঠন সংক্রান্ত হাসপাতালগুলোতে পাঠানো হয়। যেসমস্ত হাসপাতালে উন্নত শল্য চিকিৎসা, এক্স-রে, ইসিজি ইত্যাদি উন্নততর সুবিধা প্রদান করা হয় সেই হাসপাতালগুলোকে মধ্যম পর্যায়ের স্বাস্থ্যসুবিধা প্রদানকারী সংস্থা বলা হয়। এরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি উন্নততর স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী হিসাবেও কাজ করে। তারা মুখ্যতঃ জেলা সদর এবং বড়ো শহরগুলোতে অবস্থিত। যে সকল হাসপাতালগুলোতে আধুনিক স্তরের যন্ত্রপাতি ও ঔষধ রয়েছে এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধিয় জটিল সমস্যাগুলোর পর্যালোচনা করা হয় এদের তৃতীয় গঠন সংক্রান্ত হাসপাতাল বলা হয়। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্ষেত্রের হাসপাতাল দ্বারা সমাধান করা সম্ভব হয় না।

একটি স্বাস্থ্য সচেতনতা মিটিং।

একটি শিশুকে পোলিও খাওয়ানো হচ্ছে।

তৃতীয় গঠন সংক্রান্ত হাসপাতালগুলোর মধ্যে এমন প্রমুখ প্রতিষ্ঠানও রয়েছে যেগুলো গুণমান সম্পন্ন চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা প্রদান করে এবং একই সঙ্গে গবেষণামূলক কাজ ও বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কার। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — অল্ ইন্ডিয়া ইন্স্টিটিটিউট অব মেডিকেল সাইন্স, নয়াদিল্লি, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিটিউট, চণ্ডীগড়, জওহর লাল ইনস্টিটিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন এন্ড রিসার্চ, পন্ডিচেরি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিটিউট অব মেন্টাল হেলথ এন্ড নিওরো সাইন্সেস, ব্যাঙ্গালোর এবং অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিটিউটঅব হাইজিন এন্ড পাবলিক হেলথ, কোলকাতা।

উৎস : *সমষ্টিগত অর্থনীতি এবং স্বাস্থ্যের উপর জাতীয় কমিশনের রিপোর্ট, 2005।*

বাক্স 8.6 : চিকিৎসা পর্যটন - একটি বড় সুযোগ

তুমি হয়তো টিভি-র খবর বা সংবাদপত্রে দেখেছ যে শল্য চিকিৎসা, যকৃৎ প্রতিস্থাপন, দাঁত এবং সৌন্দর্যবর্ধক সেবা গ্রহণের জন্য অধিক পরিমাণে বিদেশিরা ভারতে এসে ভীড় জমাচ্ছে। কেন? কেন না, আমাদের স্বাস্থ্য পরিসেবার সঙ্গে আধুনিকতম চিকিৎসা প্রকৌশল এবং গুণমান সম্পন্ন পেশাধারী উভয়ই যুক্ত রয়েছে। বিদেশিদের কাছে আমাদের দেশের এইসব পরিসেবাগুলো তাদের নিজের দেশের তুলনায় অধিক সস্তা। 2016 সালে 2,01,000 বিদেশি চিকিৎসা পরিসেবা নেওয়ার জন্য ভারতে এসেছিল । এই সংখ্যাটি 15 শতাংশ হারে প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন যে, হয়ত 2020 সালে ভারত বিদেশীদের এই পরিসেবা প্রদান বাবদ, 500 বিলিয়ন টাকা উপার্জন করবে। ভারতে বেশি সংখ্যক বিদেশীদের এই ব্যাপারে অধিক আকর্ষিত করতে স্বাস্থ্য পরিসেবার উন্নতি ঘটানো যেতে পারে।

উৎস : *পর্যটন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার এবং www.grantthorntor.in*

বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগটিকে ভাড়াটে কর্মীর দ্বারা পরিচালনা করে থাকেন। বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন যে, ভারতে বেসরকারি ক্ষেত্র দ্বারা পরিচালিত হাসপাতালগুলো স্বাধীনভাবে কোনো বিধিনিষেধ ছাড়াই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিছু কিছু বেসরকারি ব্যবস্থা প্রদানকারি ডাক্তার রয়েছে যারা ডাক্তার হিসাবে এখনও রেজিস্ট্রিকৃত নয় তারা হাতুড়ে ডাক্তার নামে পরিচিত।

1990-এর পরবর্তী সময়ে উদারীকরণের ফলে অনেক প্রবাসী ভারতীয় এবং শিল্প ও ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্তা ভারতে ধনী ও চিকিৎসা পর্যটকদের আকর্ষিত করতে আধুনিক গুণমান সম্মত সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নির্মাণ করেন (বাক্স 8.6 দেখো)। তুমি কি মনে কর যে ভারতের বেশিরভাগ লোক এই প্রকার সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতালের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে? কেন পারে না? এমন কী করা যেতে পারে যাতে ভারতের প্রত্যেক ব্যক্তি উত্তম স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করতে পারে?

ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি

ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে ছয় ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে — আয়ুর্বেদিক, যোগা, ইউনানি, সিদ্ধা, প্রাকৃতিক চিকিৎসা এবং হোমিওপ্যাথি (AYUSH)। বর্তমানে

বাক্স 8.7 : সমুদায় এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার অলাভজনক সংস্থা

ভালো স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সমুদায়ের অংশগ্রহণ। এটা এই ধারণার উপর ভিত্তি করে কাজ করে যেখানে জনগণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়োজিত করা হয়। এই পদ্ধতি আমাদের দেশের কিছু অংশে ইতিমধ্যেই ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতে এই ধরনের কাজ করছে এমন কয়েকটি NGO-র নাম হল আমেদাবাদের SEWA এবং নীলগিরির ACCORD। শ্রমিক সংগঠনগুলো তাদের সদস্যদের জন্য এবং গ্রামীণ এলাকার জনগণকে সস্তা পরিসেবা প্রদানের জন্য বিকল্প কিছু স্বাস্থ্য পরিষেবা নির্মাণ করেছেন। এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন এমন একটি বহুল পরিচিত সংস্থা হল শহিদ হাসপাতাল, যা 1983 সালে মধ্যপ্রদেশের দুর্গ শহরে ছত্তিশগড় খনিশ্রমিক সংঘের কর্মী দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল। কিছু গ্রামীণ সংস্থাও এইধরনের বিকল্প স্বাস্থ্য পরিষেবার উদ্যোগ নির্মাণে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এদের একটির উদাহরণ রয়েছে মহারাষ্ট্রের থানে শহরে যেখানে একটি উপজাতি জনগণের সংস্থা — Kashtakari Sangathan, স্বল্পমূল্যে সাধারণ রোগের চিকিৎসার জন্য গ্রামীণ স্তরে মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

সারণি 8.4

ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের স্বাস্থ্য সূচকের তুলনা, 2014-15

সূচক	ভারত	চিন	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	শ্রীলঙ্কা
শিশুমৃত্যুর হার/1,000 জীবন্ত ভূমিষ্ঠ শিশু	38	9	6	8
5 বৎসরের নীচে শিশু মৃত্যু /1,000 জীবন্ত ভূমিষ্ঠ শিশু	48	11	7	10
দক্ষ ধাত্রীদ্বারা প্রসব (মোটের শতাংশ)	74	100	99	99
টিকাপ্রাপ্ত শিশু (DPT) (শতাংশ)	87	99	95	99
স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ব্যয় (GDP -র শতাংশ হিসাবে)	4.7	5.6	17	3.5
মোট সরকারি ব্যায়ে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ব্যয় (%)	5	10.4	21.3	11.2
স্বাস্থ্যখাতে ব্যক্তিগত ব্যয়ের শতাংশের হিসেবে নিজ পকেটের খরচ (%)	89	72	21.4	95

উৎস : *বিশ্বস্বাস্থ্য পরিসংখ্যা 2017 এবং www.worldbank.org*

ভারতে 3167টি ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে পরিচালিত হাসপাতাল, 26,000 ঔষধালয় এবং ৭ লক্ষ রেজিস্ট্রিকৃত ব্যবস্থাপ্রদানকারী রয়েছেন। কিন্তু এদের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রদানে খুবই সামান্য পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়েছে যাতে করে এই সমস্ত ক্ষেত্রে উন্নত মানের শিক্ষার কাঠামো বা গবেষণায় উৎসাহ প্রদানের মতো বিষয়গুলি স্থান পায়।

ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো কার্যকরী, নিরাপদ এবং সস্তা হওয়ায় আমাদেরস্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অধিকাংশ সমস্যাগুলোর সমাধানে এদের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোরসূচক — একটি আলোচনাধর্মী মূল্যায়ন :

পূর্বের আলোচনাতে বলা হয়েছে, একটি দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা যে সমস্ত নির্ধারকের উপর নির্ভর করে সেগুলো হল — শিশু মৃত্যুর হার ও মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার, প্রত্যাশিত আয়ু ও পুষ্টির স্তর, তৎসঙ্গে সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের ঘটনা। সারণি 8.4-এ কিছু স্বাস্থ্যসূচক এবং এইসব সূচকের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা প্রদত্ত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতামত হল স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারের অধিকতর ভূমিকার সুযোগ রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে, সারণিতে দেখানো হয়েছে যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উপর ব্যয়ের পরিমাণ মোট GDP-র 4.7 শতাংশ। এটা উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশগুলির তুলনায় অত্যন্ত কম।

একটি সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, ভারতে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় 17 শতাংস বসবাস করে কিন্তু এই দেশটি বিশ্বের মোট রোগ দায়ভার (Global Burden of diseases, GBD) 20 শতাংশ বহন করছে। বিশেষজ্ঞরা কোনো বিশেষ রোগের কারণে অসময়ে মৃত্যু মুখে পতিত লোকের সংখ্যা নির্ণয়ে এবং ঐ রোগের কারণে অসমর্থ হয়ে থাকার কারণে নষ্ট হওয়া বৎসরের সংখ্যা নির্ধারণেও GBD নামক সূচকটি ব্যবহার করেন।

ভারতে GBD-র অর্ধেকের বেশি কারণ হল ডাইরিয়া, ম্যালেরিয়া এবং যক্ষা নামক সংক্রামক রোগ। প্রতিবছর প্রায় 5 লক্ষ শিশু জলবাহিত রোগের কারণে মারা যায়। AIDS -এর বিপদও অধিক মাত্রায় রয়েছে। অপুষ্টি এবং টিকাকরণের ঔষধের যোগানের অপর্যাপ্ততাই প্রতিবছর 2.2 মিলিয়ন শিশুর মৃত্যুর কারণ।

বর্তমানে, 20 শতাংশেরও কম সংখ্যক জনগণ সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবার সুযোগ গ্রহণ করছে। একটি

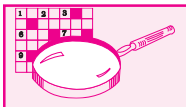

কাজগুলো করো

➢ তোমার এলাকার বা আশেপাশের একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাও। একইসঙ্গে তোমার এলাকার বেসরকারি হাসপাতাল, চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষাগার, (স্কেন) সুক্ষ্ম পরীক্ষা কেন্দ্র, ঔষধের দোকান এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলো সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করো।

➢ "দরিদ্র জনগণ যারা প্রতিবছর পাস করে বেড়ানো হাজারো সংখ্যক মেডিকেল স্নাতকদের পরিসেবা গ্রহণ করতে পারছে না তাদের দেখাশোনার জন্য আমাদের কি ধাত্রীদের একটি সেনা তৈরি করা উচিত? — এই বিষয়ের উপর শ্রেণিতে একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করো।

➢ একটি অধ্যয়ন থেকে এটা নির্ধারিত হয়েছে যে, শুধুমাত্র চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয়ই প্রতিবছর 2.2 শতাংশ জনগণকে দারিদ্র্য রেখার নীচে নিয়ে আসছে কীভাবে?

➢ তোমার এলাকার কয়েকটি হাসপাতালে যাও। ওই সমস্ত হাসপাতাল থেকে টিকাপ্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা বের করো। হাসপাতাল কর্মীকে পাঁচ বছর আগে টিকাপ্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা জিজ্ঞাসা করো। বিষয়টি শ্রেণিতে বিশদভাবে আলোচনা করো।

➢ আসামের দুইজন শিক্ষার্থী — লীনা তালুকদার (16) এবং সুশান্ত মেহেতা (16), তাদের এলাকায় সহজে প্রাপ্ত ঔষধি গাছ- খড়, ধানের খোসা বা ভুসি এবং শুকনো আবর্জনা দিয়ে একটি মশা তাড়ানোর ভেষজ ঔষধ 'Jag' তৈরি করেছে। তাদের পরীক্ষণ সফল হয়েছিল (Shodh Yatra (Innovation), Yojana, September 2005)। যদি তুমি এমন কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে জানো যার কোনো সৃজনাত্মক পদ্ধতি জনগণের স্বাস্থ্যের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে, অথবা যদি এমন কোন ব্যক্তিকে জানো যার চিকিৎসা সংক্রান্ত জড়িবুটি/গাছপালা (Medicine Plants) সম্বন্ধে জ্ঞান রয়েছে ও তিনি যেইগুলোকে জনগণের রোগ মুক্তিতে ব্যবহার করেন— তাহলে তাদের সঙ্গে কথা বলো এবং তাদের শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসো। অথবা তারা কেন ও কিভাবে রোগের চিকিৎসা করেন সেই সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করো। তোমার শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এইসব তথ্যের আদানপ্রদান করো। তুমি স্থানীয় সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনেও এই সম্বন্ধে লিখতে পারো।

➢ তুমি কি মনে করো যে, ভারতের শহরগুলিতে বিশ্বমানের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো প্রদান করা যেতে পারে, যাতে করে এগুলি চিকিৎসা পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হবে? অথবা সরকারের কি গ্রামীণ এলাকার জনগণের জন্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামো প্রদানে মনোনিবেশ করতে হবে? সরকারকে কোনটাতে প্রাধান্য দিতে হবে? বিতর্ক করো।

➢ স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে তোমার এলাকায় কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোকে (NGOs) চিহ্নিত করো। তাদের কর্মকান্ড সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করো এবং তোমার শ্রেণিতে এসে তাদের কর্মকান্ড সম্বন্ধে আলোচনা করতে তাদের আপ্যায়ন করো।

সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, মাত্র 38 শতাংশ PHCগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ডাক্তার রয়েছে এবং মাত্র 30 শতাংশ PHC গুলিতে পর্যাপ্ত ঔষধের মজুত রয়েছে।

শহর-গ্রাম এবং দরিদ্র-ধনী ভেদাভেদ :

যদিও ভারতের 70 শতাংশ জনগণ গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে, তথাপি ভারতের মাত্র এক পঞ্চমাংশ হাসপাতাল (বেসরকারি হাসপাতাল সহ) গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত। গ্রামীণ ভারতে মোট ঔষধালয়ের মাত্র অর্ধেক ঔষধালয় অবস্থিত। সরকারি হাসপাতালের প্রায় 6.3 লাখ বিছানার মধ্যে মোটামুটি 30 শতাংশ বিছানা গ্রামীণ এলাকায় উপস্থিত রয়েছে। অর্থাৎ গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নেই। এরফলে ভারতের জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। হাসপাতালের সংখ্যা নিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, গ্রামীণ এলাকায় প্রতি এক লক্ষ জনগণের জন্য মাত্র 0.36 সংখ্যক হাসপাতাল রয়েছে।

কাজগুলো করো

➢ বিগত বৎসরগুলোতে দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি লক্ষ করা গেছে। প্রত্যাশিত আয়ু বেড়েছে, শিশু মৃত্যুর হার কমেছে, গুটিবসন্ত দূরীকরণ সম্ভব হয়েছে, কুষ্ঠ ও পোলিও রোগ নির্মূলীকরণের লক্ষ্যমাত্রাও অর্জনের মুখে। কিন্তু এই পরিসংখ্যানগুলো আমাদের কাছে ভালো লাগবে তখনই যখন আমরা প্রতিটি রোগকে আলাদাভাবে বিচার করবো। পৃথিবীর বাকি অংশের সঙ্গে এগুলোর তুলনা করো। বিশ্ব স্বাস্থ্য রিপোর্ট থেকে তুমি এই ধরনের বিবরণ পাবে যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রকাশ করে। তুমি কী ধরনের তথ্য পেয়েছ ?

➢ একমাস ধরে তুমি তোমার শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ করো এবং কেন কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী অনুপস্থিত রয়েছে তা বের করো। যদি এই অনুপস্থিতি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অসুবিধার কারণে হয়ে থাকে, তাহলে তাদের কী ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা হয়েছিল তা বের করো। এই সমস্যাটির বিবরণ সংগ্রহ করো — তারা কী ধরনের চিকিৎসার সুযোগ নিয়েছে এবং তাদের মাতাপিতা এই চিকিৎসা বাবদ কী পরিমাণ টাকা খরচ করেছে। শ্রেণিতে এই বিষয়ে চর্চা করো।

যেখানে শহর এলাকায় সমসংখ্যক জনগণের জন্য রয়েছে 3.6 সংখ্যক হাসপাতাল। গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে এক্স-রে বা রক্ত পরীক্ষার সুবিধা নেই যেখানে যেকোনো শহরবাসীর জন্য এটা মৌলিক স্বাস্থ্যবিধির অন্তর্গত। কিছু কিছু রাজ্য যেমন বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশ তুলনামূলকভাবে স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সুবিধার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে গ্রামীণ এলাকায় যে সমস্ত জনগণ পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবিধির সুবিধা পায়না তাদের শতকরা হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ্রামের জনগণেরা শিশু চিকিৎসা, স্ত্রীরোগ, অনুভূতিনাশক এবং ধাত্রী বিদ্যা ইত্যাদি বিশিষ্ট চিকিৎসা পরিষেবাগুলো পাচ্ছে না। যদিও প্রতিবছর 380টি স্বীকৃত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় থেকে প্রায় 44,000 স্নাতক চিকিৎসক পাশ করছে তবুও গ্রামীণ এলাকাগুলিতে চিকিৎসকের ঘাটতি রয়েছে। আবার এই 44,000 স্নাতক চিকিৎসকের মধ্যে থেকে এক পঞ্চমাংশের অধিক আর্থিক সুবিধা পাওয়ার জন্য বিদেশে চলে যাচ্ছে। কিছু অংশ স্নাতক চিকিৎসক শহরে অবস্থিত বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে বেছে নিচ্ছে।

ভারতের শহরে ও গ্রামীণ উভয় এলাকায় বসবাসকারী দারিদ্রতম 20 শতাংশ জনগণ তাদের আয়ের 12 শতাংশ স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যয় করে, যেখানে ঐ এলাকার ধনী জনগণরা তাদের আয়ের মাত্র 2 শতাংশ চিকিৎসা পরিসেবায় ব্যয় করে। দরিদ্ররা যখন অসুস্থ হয় তখন কী ঘটে ? অনেকেই তাদের জমি বিক্রি করে

চিত্র 8.10 : *অনেক ধরনের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুবিধা পাওয়া সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য পরিসেবা একটি চিন্তার বিষয়।*

বা তাদের শিশুদের বন্ধক রেখে চিকিৎসা ব্যয়ভার বহন করে। যেহেতু সরকার পরিচালিত হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ চিকিৎসা পরিসেবার অভাব রয়েছে, তাই দরিদ্র জনগণ বেসরকারি হাসপাতালের দিকে ঝুঁকছে, যা তাদের চিরদিনের জন্য ঋণগ্রস্ত করে রাখে, অথবা তারা মৃত্যুকে বিকল্প হিসাবে বেছে নেয়।

মহিলাদের স্বাস্থ্য :

ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই হল মহিলা। মহিলারা শিক্ষা, অর্থনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্য পরিসেবা গ্রহণে পুরুষদের তুলনায় অধিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। দেশে শিশুলিঙ্গ অনুপাত 2001 সালের 927 থেকে 2011 সালে 914-তে নেমে আসার পেছনে কারণ হিসাবে কন্যা ভ্রূণ হত্যার বৃদ্ধি ঘটনাকে ইঙ্গিত করছে। 15 বছরের কম প্রায় 3,00,000 মেয়েদের শুধু বিয়েই হয়নি, উপরন্তু তারা এক সন্তানের জননীও হয়ে গেছে।

15-49 বয়সের বিবাহিত 50 শতাংশেরও বেশি মহিলাই লৌহের অভাবে রক্তাল্পতা ও অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগছে, যা, 19 শতাংশ মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর জন্য দায়ি। তাছাড়া গর্ভপাত ও ভারতে মাতৃত্বকালীন রোগ ও মৃত্যুর প্রধান কারণ।

স্বাস্থ্য হল একটি গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা যেটা জনগণের মৌলিক মানবাধিকারও বটে। যদি সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবাগুলোকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয় তাহলে সকল নাগরিকরাই উন্নত চিকিৎসা পরিসেবার সুযোগগুলি পেতে পারে। শিক্ষা ও দক্ষ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উপরই রোগের সঙ্গে দীর্ঘকালীন লড়াইয়ের সফলতা নির্ভর করে। এরজন্য স্বাস্থ্য এবং স্বচ্ছতা সহ কার্যকরী ব্যবস্থার প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়ায় দুরসঞ্চার এবং তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রের ভূমিকাকেও অবহেলা করা যায় না। স্বাস্থ্য পরিষেবামূলক কার্যক্রমগুলির কার্যকারিতা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিসেবার উপরও নির্ভর করে। অতএব আমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জনগণকে অধিকতর গুণমান সম্পন্ন জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়া। ভারতে শহর ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার মধ্যে স্পষ্ট বিভেদ রয়েছে। যদি আমরা এই ধরনের বাড়ন্ত বিভাজ্যতাকে অবজ্ঞা করি তাহলে আমাদের দেশের সামাজিক-আর্থিক ব্যবস্থায় অস্থিরতা বজায় থাকবে, আশঙ্কা থাকবে। সকল জনগণকে মৌলিক স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে হলে আমাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো পৌঁছে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাপ্যতা এবং স্বক্ষমতা উভয়ই সম্মিলিত করা প্রয়োজন।

8.7 উপসংহার

একটি দেশের উন্নয়নের জন্য অর্থনতিক এবং সামাজিক উভয় পরিকাঠামোই গুরুত্বপূর্ণ। একটি সহযোগী মাধ্যম হিসাবে পরিকাঠামো, উৎপাদনের উপকরণগুলোর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং জীবনের গুণগতমান উন্নত করে প্রত্যক্ষভাবে সকল অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে। স্বাধীনতার সাত দশকে ভারত পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি লাভ করেছে। যদিও তার বণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে। ভারতের অধিকাংশ গ্রামীণ অংশে এখনও উন্নত রাস্তাঘাট, দূরসঞ্চারের সুযোগ সুবিধা, বিদ্যুৎ, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদির অভাব রয়েছে। যেহেতু ভারত আধুনিকতার দিকে ঝুঁকছে তাই গুণমান সম্পন্ন পরিকাঠামোর চাহিদাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে তার সঙ্গে পরিবেশের উপর যাতে পরিকাঠামো সংক্রান্ত কোনো বিরূপ প্রভাব না পরে তাও লক্ষ রাখতে হবে। বেসরকারি ক্ষেত্র এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের পরিকাঠামো নির্মাণে আকর্ষিত করতে সংস্কারমূলক কর্মসূচিতে বিশেষ সুবিধা এবং উৎসাহদায়ক (Incentive) বিবিধ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। শক্তি এবং স্বাস্থ্য — এই দুই পরিকাঠামো ক্ষেত্র মূল্যায়ন করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, পরিকাঠামোর ক্ষেত্র সকলের কাছে সমানভাবে পৌঁছানোর সুযোগ রয়েছে।

সংক্ষিপ্ত বৃত্তি

- পরিকাঠামো হল ভৌতিক সুবিধা এবং সরকারি সুবিধার একটি নেটওয়ার্ক। পরিকাঠামোর সহযোগিতার ক্ষেত্রে সামাজিক পরিকাঠামোও গুরুত্বপূর্ণ। পরিকাঠামো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।
- সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উচ্চ অর্থনৈতিক হার বজায় রাখার জন্য পরিকাঠামো স্তরের উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। উন্নত পরিকাঠামোগত সুবিধা বর্তমানে বেশি সংখ্যক বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং পর্যটকদের ভারতের দিকে আকৃষ্ট করছে।
- গ্রামীণ পরিকাঠামোগত সুবিধাগুলোর উন্নয়ন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বৃহৎ তহবিলের জন্য সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশীদারিত্বের প্রয়োজন।
- দ্রুততর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য শক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে বিদ্যুতের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে।
- অপ্রচলিত শক্তির উৎসগুলোও বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।
- ভারতের বিদ্যুৎ ক্ষেত্র উৎপাদন, প্রেরণ এবং বণ্টনস্তরে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।
- স্বাস্থ্য, মানবজাতির শারীরিক ও মানসিক কল্যাণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড।
- স্বাধীনতার পরে স্বাস্থ্য পরিসেবাগুলো গঠনগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিস্তার লাভ করেছে এবং স্বাস্থ্য সূচকগুলোরও উন্নয়ন ঘটেছে।
- অধিকাংশ জনগণের জন্য সরকারি স্বাস্থ্য পদ্ধতি ও সুবিধাগুলো পর্যাপ্ত নয়।
- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুবিধাগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ও শহর এলাকার মধ্যে, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে।
- দেশে কন্যাভ্রূণ হত্যার এবং মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর ঘটনা বৃদ্ধির কারণে মহিলাদের স্বাস্থ্য নিয়ে একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।
- স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সুবিধা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত বেসরকারি ক্ষেত্র, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (NGOs) এবং সামুদায়িক অংশগ্রহণ স্বাস্থ্য পরিসেবাগুলোর উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।
- জনস্বাস্থ্যের সহযোগী ক্ষেত্র হিসেবে চিকিৎসার প্রাকৃতিক প্রণালীগুলোর অনুসন্ধান করতে হবে। ভারতে চিকিৎসা পর্যটন বৃদ্ধির অসীম সম্ভাবনা রয়েছে।

অনুশীলনী

1. 'পরিকাঠামো' শব্দটি ব্যাখ্যা করো।
2. পরিকাঠামোকে যে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে তাদের ব্যাখ্যা করো। কীভাবে তারা একে অপরের উপর নির্ভরশীল?
3. পরিকাঠামোগত সুবিধা কীভাবে উৎপাদনকে সাহায্য করে?
4. একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকাঠামোর অবদান রয়েছে। তুমি কি একমত? ব্যাখ্যা করো।
5. ভারতে গ্রামীণ পরিকাঠামোর অবস্থা কীরকম?
6. শক্তির তাৎপর্য কী? বাণিজ্যিক এবং অ-বাণিজ্যিক শক্তির উৎসের মধ্যে পার্থক্য লেখো।
7. বিদ্যুৎ উৎপাদনের তিনটি মৌলিক উৎস কী কী?
8. প্রেরণ এবং বণ্টনজনিত ক্ষতি বলতে তুমি কী বোঝ? তাদের কীভাবে কমানো যায়?
9. বিভিন্ন ধরনের অবাণিজ্যিক শক্তির উৎসগুলি কী কী?
10. পুনঃনবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসের ব্যবহারের মাধ্যমে শক্তির সংকট দূর করা যেতে পারে — সত্যতা যাচাই করো।
11. বিগত বৎসরগুলোতে শক্তির ভোগের ধরন কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে?
12. কীভাবে শক্তির ভোগের হার এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত?
13. ভারতের বিদ্যুৎ ক্ষেত্র কী কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে?
14. ভারতে সাম্প্রতিককালে শক্তি সংকট মেটাতে কী কী সংস্কার কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে — বর্ণনা করো।
15. আমাদের দেশের জনগণের স্বাস্থ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
16. 'বিশ্ব রোগের দায়ভার' (GBD) কী?
17. আমাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার প্রধান অসুবিধাগুলো বর্ণনা করো?
18. কীভাবে মহিলাদের স্বাস্থ্য খুবই উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে?
19. সংক্ষেপে জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে লেখ। বর্তমানকালে জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে — রাজ্য দ্বারা কী ধরনের সরকারি স্বাস্থ্য কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে তা বর্ণনা করো।
20. ছয় ধরনের ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির তুলনা করো।
21. কীভাবে আমরা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিসেবামূলক কার্যক্রমগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে পারি?

প্রস্তাবিত অতিরিক্ত কার্যাবলি

1. তুমি কী জানতে তোমার ঘরে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আনতে 30-40 মিলিয়ন টাকা ব্যয় হয়? একটি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে বহু মিলিয়ন ব্যয় হয়ে থাকে। এই কারণটিই কি যথেষ্ট নয় যার জন্য তুমি তোমার বাড়িতে বিদ্যুৎ সঞ্চয় শুরু করবে? বিদ্যুতের সঞ্চয় করাই হল অর্থের সঞ্চয়। বস্তুত এটা বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকেও অধিক মূল্যবান। প্রত্যেকবার যখন বিদ্যুতের বিল তোমার বাড়ি এসে পৌঁছায়, তুমি অনুভব করে থাকবে যে তোমার চারপাশে এত সংখ্যক বৈদ্যুতিক বাল্ব এবং পাখার প্রয়োজন নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা হল এই বিষয়ে তোমাকে আরও সতর্ক এবং যত্নবান হতে হবে এবং এই প্রয়াসটি এখন থেকেই শুরু করতে হবে। এই কাজে তুমি তোমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও জড়িত করো এবং তফাত দেখো। তোমার বাড়ির মাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করো। বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের কৌশলগুলি প্রয়োগ করার পর বিদ্যুতের বিলে পার্থক্য দেখো।

2. তোমার এলাকায় কী ধরনের পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলির অগ্রগতি হচ্ছে সেগুলো বের করো। তারপর বের করো ঃ-

a) ঐ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ বাজেট।

b) ঐ প্রকল্পের অর্থের উৎস।

c) ঐ প্রকল্পটি কী পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে?

d) প্রকল্পের সমাপ্তির পরে কী ধরনের সার্বিক সুবিধা হবে?

e) প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে?

f) কোন কোম্পানিগুলো এই প্রকল্পের সাথে জড়িত

3. নিকটবর্তী যেকোনও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র/জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র/পরিমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শন করো। কীভাবে এই কেন্দ্রগুলো কাজ করে তা পর্যবেক্ষণ করো।

4. তোমার শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করো এবং তাদের প্রতিবেশীদের দ্বারা ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণের ওপর সমীক্ষা করো। এই সমীক্ষাটির মুখ্য উদ্দেশ্য হল — কোন বিশেষ জ্বালানিটি তোমার প্রতিবেশী অঞ্চলে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃতহচ্ছে এবং কতটা পরিমাণে হচ্ছে তা বের করো। বিভিন্ন গ্রুপের দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে লেখচিত্র তৈরি করতে পারো এবং তুলনা করে বের করো ওই বিশেষ জ্বালানিটির পছন্দের সম্ভাব্য কারণ।

5. আধুনিক ভারতের শক্তি ব্যবস্থার স্থপতি ড. হোমি ভাবা-এর জীবনী এবং কাজ অধ্যয়ন করো।

6. 'যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলো একটি অস্বাস্থ্যকর বিশ্বের সৃষ্টি করে। একইসাথে পক্ষপাতমূলক মনোভাব এবং আবদ্ধ ও সংকীর্ণ মানসিক রোগের সৃষ্টি করে'— এই বিষয়ে তুমি শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো অথবা বিতর্ক সভার আয়োজন করো।

REFERENCES

Books

JALAN, BIMAL (Ed.). *The Indian Economy — Problems and Prospects*. Penguin Books, Delhi, 1993.

KALAM, A.P.J. ABDUL WITH Y.S. RAJAN. 2002. *India 2020: A Vision for the New Millennium.* Penguin Books, Delhi.

PARIKH, KIRIT S. AND RADHAKRISHNA (Eds.). 2005. *India Development Report 2004-05.* Oxford University Press, Delhi.

Government Reports

Energy Statistics 2016, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India.

The World Health Report 2002. Reducing Risks, Promoting Healthy Life, World Health Organisation, Geneva.

Report of the National Commission on Macroeconomics and Health, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, New Delhi, 2005.

Tenth Five Year Plan, Vol.2, Planning Commission, Government of India, New Delhi.

The India Infrastructure Report: Policy Imperatives for Growth and Welfare 1996. Expert Group on the Commercialisaton of Infrastructure Projects. Vols.1, 2 and 3 Ministry of Finance. Government of India, New Delhi.

World Development Report 2004. The World Bank, Washington DC.

India Infrastructure Report 2004. Oxford University Press, New Delhi.

Economic Survey 2004-2005. Ministry of Finance, Government of India.

World Development Indicators, 2013, The World Bank, Washington.

World Health Statistics 2014, World Health Organisation, Geneva.

National Health Profile (NHP) of India for various years, Central Bureau of Health Intelligence, Goverment of India, New Delhi.

Websites

On energy related issues:

www.pcra.org
www.bee-india.com
www.edugreen.teri.res.in
http://powermin.nic.in

On health related issues:

http://www.aiims.edu
http://www.whoindia.org
http://mohfw.nic.in
www.apollohospitalsgroup.com
www.worldbank.org
www.cbhidghs.nic.in

9

পরিবেশ এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন

এই অধ্যায় পাঠ করার পর শিক্ষার্থীরা সক্ষম হবে —

- পরিবেশের ধারণা সম্পর্কে বুঝতে
- ‘পরিবেশগত অবক্ষয়’ এবং ‘সম্পদ নিঃশেষকরণ’ এর কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করতে
- ভারত যে পরিবেশগত সমস্যাগুলোর সম্মুখীন তার প্রকৃতি বুঝতে।
- পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচ্য প্রশ্নগুলোকে স্থিতিশীল উন্নয়নের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে সম্পর্কিত করতে।

আপন খেয়ালে থাকতে দিলে পরিবেশ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জীবনকে বহন করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি অস্থিতিশীল ও ভয়ংকরভাবে বিপজ্জনক কারক হচ্ছে মানব প্রজাতি। আধুনিক প্রযুক্তিতে বলীয়ান মানব প্রজাতি ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে পরিবেশের সুদূরপ্রসারী অপিরবর্তনযোগ্য পরিবর্তন আনার ক্ষমতায় বলীয়ান। — অজ্ঞাতনামা

9.1 ভূমিকা

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমাদের ভারতীয় অর্থনীতি যে সকল গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন আমরা অর্জন করেছি তার বিনিময়ে পরিবেশের ভারী লোকসান হয়েছে। যেই আমরা বিশ্বায়নের যুগে পা রাখলাম, যা উচ্চ প্রবৃদ্ধির হারের প্রতিশ্রুতি দেয়। তখন আমাদের মনে রাখতে হবে অতীতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথের ক্ষতিকারক প্রভাবগুলো এবং আমাদের এমন একটি উন্নয়নের রাস্তা বেছে নিতে হবে যা স্থিতিশীল উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করবে। স্থিতিশীল উন্নয়নের যা রাস্তা আমরা অনুসরণ করছি তাকে বুঝতে এবং এই রাস্তায় যে বাধাগুলো রয়েছে তা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে উন্নয়নের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা পরিবেশ সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন।

এই কথা মনে রেখে, এই অধ্যায়টিকে তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম ভাগে পরিবেশের কার্য এবং ভূমিকার দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে ভারতের পরিবেশের হালচাল এবং তৃতীয় ভাগে স্থিতিশীল উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করতে যে সকল পদক্ষেপ ও রণনীতি নিয়ে এগুতে হবে যেগুলোর দিকে দৃষ্টিদেওয়া হয়েছে।

9.2 পরিবেশ — সংজ্ঞা এবং কাজসমূহ

পরিবেশ হল, আমরা যে জগতে বসবাস করি সেখানে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মোট সম্পদ। এতে সব জৈব এবং অজৈব উপাদান অন্তর্ভুক্ত যা একে অপরের পরিপূরক। সকল সজীব উপাদান — পাখি, পশু, গাছপালা, বন, মৎস্য ইত্যাদি হল পরিবেশের জৈব উপাদান। অজৈব উপাদানের মধ্যে রয়েছে বায়ু, জল, ভূমি ইত্যাদি। এছাড়া শিলা এবং সূর্যালোকও হল পরিবেশের অজৈব উপাদানের উদাহরণ। পরিবেশ চর্চার মূল বিষয় হল, এই জৈব এবং অজৈব উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক দেনা-পাওনাকে অনুধাবন করা।

পরিবেশের কার্য :

পরিবেশ চারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্য করে i) এটি সম্পদের যোগান দেয় : সম্পদের মধ্যে আছে নবীকরণযোগ্য এবং অনবীকরণযোগ্য উভয় সম্পদ। যে সম্পদের ব্যবহারের ফলে ক্ষয় হওয়ার বা নিঃশেষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না তাকে নবীকরণযোগ্য সম্পদ বলে। অর্থাৎ সম্পদের অবিরাম সরবরাহ সহজলভ্য হয়। নবীকরণযোগ্য সম্পদের উদাহরণ হল বনের গাছপালা এবং সমুদ্রের মাছ। অন্যদিকে অনবীকরণযোগ্য সম্পদ হল সেগুলি, যা নিষ্কাশন এবং ব্যবহারে ফুড়িয়ে যায় যেমন জীবাশ্ম জ্বালানী (ii) এটি বর্জ্য সমাহিত করে (iii) এটি জিনগত এবং জৈব বৈচিত্র্য এর মাধ্যমে প্রাণের অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং (iv) এটি নান্দনিক সেবা প্রদান করে, যেমন কোন মনোরম দৃশ্য প্রভৃতি।

পরিবেশ এই কাজগুলো ছেদহীনভাবেই করতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না এই কাজগুলোর চাহিদা পরিবেশের ধারণ ক্ষমতার মধ্যে থাকে। এর অর্থ হল সম্পদ নিষ্কাষণের হার এর পুণরুৎপাদন হারকে যাতে অতিক্রম না করে এবং

চিত্র 9.1 : *জলরাশি : ক্ষুদ্র, হিমালয়ের তুষারে পুষ্ট স্বাদু জলের উৎস যা দূষণমুক্ত থাকে।*

উৎপন্ন বর্জ্যের পরিমাণ যাতে পরিবেশের শোষণ ক্ষমতার ভিতর থাকে। যখন ঘটনা এইরূপ হয় না, তখন পরিবেশ তার তৃতীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে অসমর্থ হয়। পরিবেশের তৃতীয় কাজটি হল প্রাণের অস্তিত্ব রক্ষা করা। পরিবেশ এই কাজটি না করতে পারার অর্থ হল পরিবেশ বিপন্ন হওয়া। সারা বিশ্বে আজ এই পরিস্থিতি। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং উন্নত বিশ্বের ভোগবাদী জীবনচর্চা পরিবেশের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করছে। অনেক সম্পদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ পরিবেশের বিশোষক ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে 'শোষণ ক্ষমতা' বলতে বোঝায় পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি শোষণের সামর্থ্যকে। এর কারণেই আজ আমরা পরিবেশ সংকটের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। উন্নয়ন করতে গিয়ে নদী এবং জলস্রোত দূষিত এবং শুকিয়ে গেছে যা জলকে আর্থিক দ্রব্যে পরিণত করেছে। পাশাপাশি, নবীকরণ এবং অনবীকরণযোগ্য সম্পদের ব্যাপক নিষ্কাষণের ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং আমরা নতুন সম্পদের খোঁজে প্রযুক্তি এবং গবেষণায় অনুসন্ধান করতে বিশাল অর্থ ব্যয়ে বাধ্য হচ্ছি। এর সাথে জুড়ে আছে অধঃপতিত। পরিবেশের সুস্থিতি বিনষ্ট হওয়ার কারণে স্বাস্থ্য

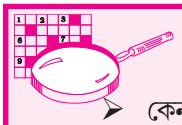

কাজগুলো করো

- কেন জল অর্থনৈতিক পণ্য হয়ে উঠেছে? আলোচনা করো।
- নীচের সারণিটি বায়ু, জল এবং শব্দ দূষণের কারণে সৃষ্ট কিছু সাধারণ রোগ এবং অসুস্থতার নাম লিখে পূরণ করো :

বায়ুদূষণ	জলদূষণ	শব্দদূষণ
হাঁপানি / শ্বাসকষ্ট	কলেরা	

বাক্স 9.1 : বিশ্ব উষ্ণায়ন

বিশ্ব উষ্ণায়ন হল, পৃথিবীর নীচের স্তরের আবহাওয়ার গড় তাপমাত্রার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে গ্রিন হাউস গ্যাসের বৃদ্ধিই বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী। বিশ্ব উষ্ণায়ণের ইদানিংকালের বৈশিষ্ট্য সমূহ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাচ্ছে, সমস্যাটা সম্পূর্ণভাবে মনুষ্য সৃষ্টি। জীবাশ্ম জ্বালানির দহন ও অরণ্য নিধন মানুষের হাত ধরেই হচ্ছে যা বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর নিঃসরণ বাড়িয়ে বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড মিথেন এবং এরকম অন্যান্য গ্যাস (যাদের তাপ শোষণের ক্ষমতা রয়েছে) বায়ুমণ্ডলে মিশে, অন্য কোনো পরিবর্তন না করে আমাদের ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগকে উষ্ণ করে প্রাক্-শিল্পায়নের সময় 1750 সালের পর থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং CH_4 এর বায়ুমণ্ডলে কেন্দ্রীভবন যথাক্রমে 31 শতাংশ এবং 149 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত শতাব্দীতে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা 1.1^0F (0.6^0C) বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সমুদ্রতল কয়েক ইঞ্চি উপরে ওঠে গেছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের কিছু দীর্ঘকালীন ফল হল, মেরু প্রদেশের বরফ গলবে যার পরিণতি হল সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং সমুদ্রতটবর্তী এলাকাগুলোতে বন্যা হবে, হিমবাহ গলা জলে পুষ্ট পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে নির্ভরতা বিনষ্ট হবে জৈব বৈচিত্র্য হ্রাস পাবে, খুব ঘন ঘন ক্রান্তীয় ঝড়ের উৎপত্তি হবে এবং ক্রান্তিয় রোগ ব্যাধির দাপট বৃদ্ধি পাবে।

বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে কয়লা এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের দহন (কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ওজোন প্রভৃতির উৎস) বন ধ্বংস, যা বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর পরিমাণ বাড়ায়, প্রাণী বর্জ্য থেকে মিথেন গ্যাস নির্গমন, গবাদি পশুর উৎপাদন বৃদ্ধি যা বন ধ্বংসে অবদান রাখে। ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এর সম্মেলন জাপানের কিয়োটো তে 1997 সালে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এই চুক্তিতে বলা হয় বিশ্ব উষ্ণায়নকে মোকাবেলা করতে গ্রিণ হাউস গ্যাসের নিরসরণ কমাবে শিল্পোন্নত দেশগুলো।

উৎস : *www.wikipedia.org*

ব্যয় — জল এবং বায়ুর নিম্নমুখী গুণমানের (ভারতে 70 শতাংশ জল দূষিত) ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস ঘটিত এবং জল বাহিত রোগের দাপাদাপি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে স্বাস্থ্য ব্যয়ও বৃদ্ধি পিয়েছে। বিশ্ব পরিবেশগত বিপর্যয় যেমন বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং ওজোন স্তরে ক্ষয় আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সরকারের বাড়তি আর্থিক দায়ভার বহন করতে অনেক ব্যয় করতে হচ্ছে। এর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, পরিবেশ দূষণের নেতিবাচক প্রভাবের জন্য সরকারের সুযোগ ব্যয় বাড়ছে।

এখন সবচাইতে বড়ো প্রশ্নটি হল : পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা কি এই শতাব্দীর নতুন ঘটনা? যদি হয়, তবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে কিছু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। সভ্যতার উষাকালে অথবা পরিবেশ দূষণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বৃদ্ধির পূর্বে এবং পৃথিবীর দেশগুলোতে

বাক্স 9.2 : ওজোন স্তরে ক্ষয়

ওজোন স্তরে ক্ষয় হল স্ট্র্যাটোসফিয়ারে ও ওজোনের স্তরে ক্ষয়ে যাবার ঘটনা। ওজোন স্তরে ক্ষয়ের কারণ স্ট্র্যাটোসফিয়ারের উচ্চ স্তরে ক্লোরিন এবং ব্রোমিন যৌগের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি। এই দুই যৌগের উৎস হল ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFC)। আর এই ক্লোরোফ্লুরোকার্বন সৃষ্টি হয় মূলত ফ্রিজ বা এয়ারকন্ডিশনারের মতো ঠান্ডা করার যন্ত্র, স্প্রে করার যন্ত্র এবং অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে ব্যবহৃত এরোসেল প্রোপেলেন্টস ও ব্রোমোফ্লুরোকার্বন (হ্যালনস) থেকে। ওজোন স্তরের ক্ষয়ের পরিমাণ স্বরূপ অতিবেগুনি বিকিরণ (UV) পৃথিবীতে অর্ধেক আসে এবং সজীব বস্তুর ক্ষতিসাধন করে। অতি বেগুনি বিকিরণ মানুষের ত্বক-ক্যান্সারের কারণ বলে মনে করা হয়, এটি ফাইটোপ্লাংটনের উৎপাদন হ্রাস করে এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীদের উপর প্রভাব ফেলে। এটি স্থলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। 1979 থেকে 1990 যেহেতু ওজোন স্তর সর্বাধিক ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মিকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আছড়ে পড়তে বাধা দেয়, এই কারণে ওজোন স্তরে ক্ষয় বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তরের ক্ষয় বন্ধ করতে মন্ট্রিল চুক্তি অনুসারে, ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের নিরসরণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ সহ ওজোন স্তরে ক্ষয়ের জন্য দায়ী রাসায়নিক সমূহ যেমন, কার্বনটেট্রাক্লোরাইড, ট্রাইক্লোরোইথেন (যা ক্লোরোফর্ম নামেও পরিচিত) এবং ব্রোমাইন যৌগ যা হ্যালন্স নামে পরিচিত, তাদের নিঃসরণের উপরও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

উৎস : *www.ceu.hu*

শিল্পায়নের পর্ব শুরু হওয়ার আগে, প্রাকৃতিক সম্পদের যোগানকে ছাপিয়ে যায়নি সম্পদের চাহিদা। এর অর্থ হল, সে সময় দূষণ ছিল পরিবেশের শোষণ করার ক্ষমতার মধ্যে এবং যে সময় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের হার ছিল সম্পদের পুনঃ উৎপাদনের হারের চাইতে কম। এই কারণে সেই সময় পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্ট হয়নি। কিন্তু জনবিস্ফোরণ এবং বর্ধনশীল জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে পরিস্থিতি বদলে গেছে। ফলস্বরূপ উৎপাদন এবং ভোগ উভয়ক্ষেত্রেই সম্পদের চাহিদা সম্পদের পুনরুৎপাদন হারের চাইতে বেড়ে গেছে। পরিবেশের শোষণ ক্ষমতার উপর চাপ ভীষণভাবে বেড়ে গেছে — এই ধারা আজও চলছে। এইভাবে, পরিবেশের সুস্থিতির ক্ষেত্রে চাহিদা - যোগান সম্পর্ক সম্পূর্ণবাবে অদল বদল হয়ে গেছে এখন আমাদের সামনে

চিত্র 9.2 *: দামোদর উপত্যকা ভারতের শিল্পোন্নত অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম। ভারি শিল্প থেকে দূষণকারী পদার্থ দামোদর নদীর তীরে জমা হয়ে পরিবেশ সংকট সৃষ্টি করছে।*

পরিবেশগত সম্পদ এবং সেবার চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এর যোগান অতিরিক্ত ব্যবহার ও অপব্যবহারের কারণে সীমিত হয়ে পড়েছে। এই কারণে আজ পরিবেশ সমস্যা বর্জ্য উৎপাদন জনিত দূষণ জটিল হয়ে পড়েছে।

চিত্র 9.3 : *বনধ্বংসের মাধ্যমে জমির উর্বরতা হ্রাস, জৈব বৈচিত্র নষ্ট এবং বায়ুদূষণ।*

9.3 ভারতের পরিবেশগত অবস্থা

গুণগতভাবে উন্নত মৃত্তিকা, শতাধিক নদী এবং উপনদী, ঘন সবুজ বন, মাটির নীচে সঞ্চিত প্রচুর খনিজ পদার্থ, ভারত মহাসাগরের বিস্তৃত পর্বতমালা প্রভৃতির ভিত্তিতে ভারত অফুরান প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর রয়েছে। দক্ষিণের মালভূমির কৃষ্ণমৃত্তিকা তুলা চাষের জন্য খুবই উপযোগী। এই কারণে বস্ত্রবয়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবন এই অঞ্চলে হয়েছে। গাঙ্গেয় সমতলভূমি যা আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশ্বের অত্যন্ত উর্বর ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম, সবচেয়ে নিবিড় চাষযুক্ত অঞ্চল এবং জনঘনত্বও বেশি। ভারতীয় বন অসমভাবে বণ্টিত হলেও বনভূমি অধিকাংশ জনসংখ্যাকে সবুজ আচ্ছাদন এবং বন্যপ্রাণীদের প্রাকৃতিক আচ্ছাদন দিয়ে রেখেছে। দেশে লৌহ আকরিক কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাস প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রয়েছে। কেবল ভারতেই বিশ্বের মোট লৌহ-আকরিক সঞ্চিত ভাণ্ডারের ২০ শতাংশ রয়েছে। দেশের বিভিন্ন অংশ বক্সাইট, তামা, ক্রোমেট, হিরা, স্বর্ণ, সিসা, লিগনাইট, ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি পাওয়া যায়। তবে ভারতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের জন্য তার সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ পড়ছে, পাশাপাশি দেশবাসীর স্বাস্থ্য ও কল্যাণের উপর প্রভাব ফেলছে। ভারতের পরিবেশ দুইটি দিক দিয়ে বিপত্তির মুখে — একটি হল দারিদ্র্যতার কারণে পরিবেশর অবনমন এবং দ্বিতীয় বিপত্তি হল সমৃদ্ধ এবং খুব দ্রুত বাড়তে থাকা শিল্পক্ষেত্র থেকে দূষণ। ভারতে পরিবেশগত দুশ্চিন্তার কারণগুলোর মধ্যে কয়েকটি হল বায়ুদূষণ, জলদূষণ, ভূমিক্ষয়, বনধ্বংস এবং বন্য প্রাণীর বিলুপ্তি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (i) ভূমির উর্বরতা হ্রাস (ii) জৈব বৈচিত্র হ্রাস (iii) শহর এলাকায় বিশেষভাবে যানবাহন থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণ (iv) স্বাদু জলের ব্যবস্থাপনা (v) কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা ভারতে ভূমির বিভিন্ন মাত্রায় এবং রূপে ক্ষতি হচ্ছে যা মুখ্যত অস্থিতিশীল ব্যবহার এবং অনুপযুক্ত ব্যবস্থাপনার ফলে হচ্ছে।

ভূমির স্বাভাবিকতা নষ্টের জন্য দায়ী উপাদানগুলো হল — (i) বনধ্বংসের ফলে সবুজের আচ্ছাদন হ্রাস (ii) অস্থিতিশীল জ্বালানি কাঠ এবং পশুখাদ্যের নিষ্কাশন (iii) স্থানান্তর চাষ (iv) বনাঞ্চল অধিগ্রহণ (v) বনে আগুন লাগা এবং মাত্রাতিরিক্ত পশুচারণ (vi) পর্যাপ্ত ভূ-সংরক্ষণ

বাক্স 9.3 : চিপকো বা আপ্পিকো — নামে কি হয়?

তুমি হয়তো চিপকো আন্দোলনের কথা শুনেছ, যার উদ্দেশ্য ছিল হিমালয় পর্বতের বনগুলোকে বাঁচানোর এক অভিনব আন্দোলন। কর্ণাটকে একই ধরনের আরেকটি আন্দোলন 'আপ্পিকো' নামে সংগঠিত হয়েছিল। আপ্পিকো-র অর্থ হল আলিঙ্গান। 8 সেপ্টেম্বর 1983, যখন সিরসী জেলার সালকানী বনে গাছ কাটা শুরু হয়েছিল তখন 160 জন নারী, পুরুষ ও শিশুরা গাছগুলোকে আলিঙ্গান করে রাখল এবং কাঠুরিয়াদের এই জায়গা ছাড়তে বাধ্য করল। তারা পরবর্তী ছয় সপ্তাহ বনটিকে পাহাড়া দিয়েছিল। ঐ স্বয়ংসেবকরা গাছগুলোকে তখনই ছাড়ল, যখন বনদপ্তরের আধিকারিকরা এই আশ্বাস দিল যে, গাছগুলোকে এখন থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এবং জেলা অফিসের বন সম্বন্ধীয় কর্ম পরিকল্পনার সাথে সাযুজ্য রেখে কাটা হবে।

যখন ঠিকাদাররা বিরাট এলাকার প্রাকৃতিক বনগুলোকে বাণিজ্যিক ভাবে কাটছিল, তখন বৃক্ষগুলোকে আলিঙ্গান করে রাখার ধারণা আসল, যা লোকদের মনে এই আশা এবং বিশ্বাস জাগাল যে তারা গাছগুলোকে রক্ষা করতে পারবে। এই বিশেষ পদ্ধতিতে গাছকাটা আটকে দিয়ে 12000 টি গাছকে রক্ষা করেছিল। কিছু মাসের মধ্যে এই আন্দোলন পাশ্ববর্তী জেলাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ল।

জ্বালানির কাঠ এবং শিল্পের ব্যবহারের জন্য নির্বিচারে গাছগুলো কাটায় পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। উত্তর কানারা অঞ্চলে একটি কাগজের মিল প্রতিষ্ঠার 12 বছর পর ঐ অঞ্চল থেকে বাঁশ হারিয়ে গেছে। একজন কৃষকের বক্তব্য হল। 'বড়ো বড়ো পাতা যুক্ত গাছগুলো, যা ভূমিকে বর্ষার সরাসরি প্রচণ্ড আঘাত থেকে রক্ষা করে, তাদের ধ্বংস করা হয়েছে, এর ফলে উপরের স্তরের মাটি বর্ষার জলের সঙ্গে ধুয়ে চলে যায় এবং এখন শুধু কাকঁরই রয়ে গেছে। এখানে এখন ঘাস ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না। কৃষকের এটাও অভিযোগ যে, নদী এবং উপ-নদীগুলোর জল তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাচ্ছে এবং বর্ষাও এখন অনিয়মিত হয়ে গেছে। এখন এমন কিছু রোগ এবং জীবাণু ফসলকে নষ্ট করছে যা আগে ছিল না।

আপ্পিকো আন্দোলনের কর্মীরা চেয়েছিলেন যে, ঠিকাদার এবং বন দপ্তরের আধিকারিকরা কিছু নিয়মবিধি অনুসরণ করুক। উদাহরণস্বরূপ, তারা চেয়েছিলেন যে, কাটার আগে গাছগুলোকে চিহ্নিত করতে স্থানীয় জনগণের পরামর্শ নেওয়া হোক এবং কোনো জলের উৎসের 100 মিটার পরিসীমায় এবং 30 ডিগ্রি বা তার উপর পাহাড়ি ঢালের গাছগুলোকে যাতে কাটা না হয়।

তুমি কি জান যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকার বনভূমি বরাদ্দ করে, যাতে বনজ সম্পদগুলোকে তারা শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করতে পারে? যদি একটি কাগজের মিল 10,000 কর্মী নিযুক্ত করে বা একটি প্লাইউড কারখানা 800 কর্মী নিযুক্ত করে তথাপি এর ফলে 10 লক্ষ লোকের দৈনন্দিন প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত হয় - এরপরও কী এটা মেনে নেওয়া যায়। তুমি কি মনে কর?

উৎস : *State of India's Environment, The Second Citigens Report 1984-85, Centre for Science and Environment, 1996, New Delhi.*

ব্যবস্থা গ্রহণ না করা (vii) অনুপযুক্ত ফসল চক্র (viii) কৃষি রাসায়নিকের অনুচিত ব্যবহার যথা-রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক (ix) জলসেচ ব্যবস্থার অনুপযোগী পরিকল্পনা এবং পরিচালনা (x) ভূগর্ভস্থ জলের মাত্রাতিরিক্ত নিষ্কাশন (xi) সম্পদের অবাধ উপলব্ধতা (xii) কৃষি নির্ভর লোকের দরিদ্রতা।

পৃথিবীর মোট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে 2.5 শতাংশ অঞ্চল রয়েছে ভারতের ভূ-সীমানায়। কিন্তু পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 17 শতাংশ বসবাস করে ভারতে এবং মোট প্রাণী সম্পদের 20 শতাংশই রয়েছে ভারতে। জনসংখ্যা এবং প্রাণী সম্পদের অধিক ঘনত্ব তথা বনায়ন, কৃষি, মানব বসতি এবং শিল্পের জন্য জমির প্রতিযোগিতামূলক ব্যবহার, দেশের সীমাবদ্ধ জমি সম্পদের উপর একটি বিশাল চাপ সৃষ্টি করে।

দেশের মানুষের মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ 0.08 হেক্টর, যেখানে প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণের জন্য দরকার 0.08 হেক্টর বনভূমি। যার ফলে, বনধ্বংস স্বাভাবিক সীমা থেকে প্রায় 15 মিলিয়ন প্রতি ঘনমিটার থেকেও বেশি হয়ে গেছে।

ভূমি হিসাবগুলো থেকে দেখা যায় যে, সারা দেশে ভূমিক্ষয়ের ব্যবসায়িক হার হল 5.3 বিলিয়ন টন। এর ফলে দেশের 0.8 মিলিয়ন নাইট্রোজেন, 1.8 মিলিয়ন টন ফসফরাস এবং 26.3 মিলিয়ন টন পটাশিয়াম নষ্ট হচ্ছে। ভারত সরকারের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর ভূমিক্ষয়ের ফলে 5.8 মিলিয়ন টন থেকে 8.4 মিলিয়ন টন পুষ্টি উপাদান নষ্ট হচ্ছে।

কাজগুলো করো

➢ অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবেশের অবদানকে উপলব্ধ করাতে নিম্নের খেলাটি করানো যেতে পারে। একজন শিক্ষার্থী একটি দ্রব্যের নাম নিতে পারে যা কোনো উদ্দেশে ব্যবহৃত হয় এবং অপর শিক্ষার্থী প্রকৃতি এবং পৃথিবীতে দ্রব্যটির মূল উৎস খোঁজে বের করবে।

ট্রাক ← স্টীল এবং রাবার

স্টিল ← লৌহা ← খনিজ ← পৃথিবী

রাবার ← গাছ ← বন ← পৃথিবী

বই ← কাগজ ← গাছ ← বন ← পৃথিবী

বস্ত্র ← সুতা ← বৃক্ষ ← প্রকৃতি

মেশিন ← লৌহা ← খনিজ ← পৃথিবী

➢ এক ট্রাক ড্রাইভারকে গাড়ি থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হওয়ার জন্য 1000 টাকা জরিমানা চালান কেটে দিতে হল। কেন তুমি মনে কর তাকে দণ্ডিত করা হয়েছে? এটা কি যুক্তিসম্মত? আলোচনা করো।

ভারতের শহুরে এলাকার বায়ুদূষণ প্রচণ্ডভাবে হয় যেখানে যানবাহনের সর্বাধিক অবদান আছে এবং কিছু অন্য এলাকায় শিল্প এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্যও ইহা হচ্ছে। যানবাহনের গ্যাসীয় নিষ্কাশন খুব চিন্তার বিষয় কারণ এগুলো বায়ু দূষণের নীচু স্তরের উৎস এবং

বাক্স 9.4 : দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (PCB)

ভারতের প্রধান পরিবেশগত সমস্যাগুলো যেমন বায়ুদূষণ ও জলদূষণ, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভারত সরকার 1974 সালে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ গঠন করে। একই লক্ষ্যে রাজ্য স্তরে সকল পরিবেশগত বিষয়কে মোকাবিলার জন্য রাজ্যগুলোতে নিজ নিজ পর্ষদ বানিয়েছে। পর্ষদ জল, বায়ু এবং ভূমি দূষণ সম্পর্কিত তথ্যগুলো সংগ্রহ তদন্ত এবং প্রচার করে। এই পর্ষদগুলো ছোটো নদী এবং কুয়োর জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং পরিচ্ছন্নতার জন্য সরকারকে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান করে থাকে এবং দেশে বায়ুদূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং উপশম করে তথা বায়ুর গুণগত মান উন্নত করতে ভূমিকা রাখে।

এই পর্ষদগুলো জল দূষণ এবং বায়ু দূষণ সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর তদন্ত অনুসন্ধান এবং গবেষণা করে থাকে তথা এই গুলোর নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ করার জন্য ভূমিকা নিয়ে থাকে। এর জন্য পর্ষদগুলো গণমাধ্যমের সাহায্যে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমও করে থাকে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ নিকাশি বর্জ্য ও বাণিজ্যিক বজ্যের ব্যবস্থাপনা তথা নিষ্পত্তি সম্পর্কিত নিয়মাবলি, সংক্ষিপ্ত দিশানির্দেশ এবং নির্দেশিকা প্রস্তুত করে।

শিল্পগুলোকে নিয়ন্ত্রণের দ্বারা তারা বায়ুর গুণগতমান মূল্যায়ন করে। জেলাস্তরের আধিকারিকদের দিয়ে রাজ্য পর্ষদগুলো তাদের এলাকাধীন প্রতিটি শিল্প নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে শিল্পগুলো উৎপাদিত কঠিন ও গ্যাসীয় বর্জ্যের শোধনে যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে কিনা তা দেখে। তারা উদ্যোগ স্থাপন এবং নগর পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় বায়ুর গুণগতমান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ জলদূষণ সম্পর্কীয় প্রযুক্তিগত এবং পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহ তাদের পরস্পরকে মিলিয়ে দেখা এবং প্রচার করার মতো কাজগুলো করে। এই পরিষদ 125টি নদী (উপনদীও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) কুয়ো, হ্রদ, খাত, পুকুর, দিঘি, ড্রেন এবং খাল-এর জলের গুণগতমান পরীক্ষা করে।

- নিকটবর্তী একটি কারখানা বা জলসেচ বিভাগে যাও এবং জল তথা বায়ু দূষণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের দ্বারা গৃহিত ব্যবস্থা সংগ্রহ করো।
- খবরের কাগজ, রেডিয়ো ও টেলিভিশন বা স্থানীয় বিলবোর্ডগুলো তুমি হয়তো জল তথা বায়ুদূষণ সম্পর্কীয় সচেতনতামূলক কর্মসূচিগুলোর বিজ্ঞাপন নিশ্চয়ই দেখছ। কিছু খবরের ক্লিনিং, প্রচারপত্র এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করো এবং শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো।

এইগুলোর প্রভাব সাধারণ মানুষের উপর পরে। 1951 সালে 3 লক্ষ মোটর বাহন থেকে 2003 সালে বেড়ে এই সংখ্যা 67 কোটি হয়েছে। 2003 সালে মোট রেজিস্টার করা বাহনের প্রায় 80 শতাংশ ছিল ব্যক্তিগত পরিবহণ বাহন (শুধু দু-চাকার বাহন এবং গাড়ি)। এইভাবে, যানবাহন মোট বায়ু দূষণের বোঝায় একটি উল্লেখযোগ্য যোগদান করে।

ভারত বিশ্বের দশটি শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে একটি। কিন্তু এই মর্যাদা তার সঙ্গে কিছু অনাবশ্যক এবং অপ্রত্যাশিত পরিণাম বহন করে আনে যেমন — পরিকল্পনাহীন শহরীকরণ, দূষণ এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ 17 ধরনের শিল্পকে (ভারী এবং মাঝারি স্তরের) উল্লেখযোগ্য দূষণকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো ভারতের পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ গুলোকে উল্লেখ করছে। পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ দ্বারা গৃহিত বিভিন্ন পরিমাপগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকরী হবে না যতক্ষণ

পর্যন্ত না আমরা সুচিন্তিতভাবে স্থিতিশীল উন্নয়নের পথ গ্রহণ না করি। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য উন্নয়নই হল চিরস্থায়ী উন্নয়ন। সমৃদ্ধির কথা চিন্তা না করে শুধু আমাদের

কাজগুলো করো

➢ যে-কোন জাতীয় খবরের কাগজে বায়ু দূষণের পরিমাপের স্তম্ভ তুমি দেখতে পাও। দীপাবলির এক সপ্তাহ আগের, দীপাবলির দিনের এবং দীপাবলির দুই দিন পরের দূষণ বিষয়ক খবরের অংশটুকু কেঁটে রাখ। তুমি কি এই মানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখছ? শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো।

জীবনের মান উন্নয়নের জন্য করা উন্নয়ন কার্যগুলো সম্পদ তথা পরিবেশের অবক্ষয় করবে। এই অবক্ষয় পরিবেশ ও অর্থনীতির সংকট সৃষ্টি করবে।

9.4 স্থিতিশীল উন্নয়ন

পরিবেশ এবং অর্থনীতি পরস্পর নির্ভর এবং একে অপরের জন্য প্রয়োজনীয়। তাই পরিবেশের উপর এর প্রভাবকে অবহেলা করে যে উন্নয়ন তা পরিবেশকে ধ্বংস করে দেয়, যে পরিবেশই জীব জগৎকে লালনপালন করে। তাই যেটা দরকার, সেটা হল পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা সহায়ক উন্নয়ন বা স্থিতিশীল উন্নয়ন। স্থিতিশীল উন্নয়ন হল এমন এক উন্নয়ন, যেখানে বর্তমান প্রজন্মের ভোগের প্রয়োজন মিটানোর সাথে সাথে ভবিষ্যত প্রজন্মের ভোগের প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষিত থাকবে। ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন এনভিরনমেন্ট অ্যান্ড ডেভলাপমেন্ট-এ স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং স্থিতিশীল উন্নয়নকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল — 'এমন উন্নয়ন যেখানে বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজনগুলো পূরণের হারটি এমন হবে যাতে ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণ বিঘ্নিত না হয়।

সংজ্ঞাটি আবার পড়ো। তুমি লক্ষ করবে যে, 'প্রয়োজন' শব্দটি এবং শব্দগুচ্ছ 'ভবিষ্যত প্রজন্ম' এই দুইটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে 'সম্পদের বণ্টনের সাথে যোগসূত্র টেনে 'প্রয়োজন' বিষয়টি ব্যবহার করা হয়েছে। সম্মেলনের রিপোর্টে — 'আমাদের সর্বজনীন ভবিষ্যত' নামক অংশে স্থিতিশীল উন্নয়নের উপরে উল্লেখিত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে যে, সকলের প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণ করা এবং একটা ভালো জীবন ধারণের আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে সকলকে সমান সুযোগ প্রদান করা হল স্থিতিশীল উন্নয়ন। সকলের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য সম্পদের পুনঃবণ্টন করার প্রয়োজন রয়েছে। এই অর্থে স্থিতিশীল উন্নয়ন একটি নৈতিক বিষয়। এডওয়ার্ড বারবিয়ার (Edward Barbier) স্থিতিশীল উন্নয়নের সংজ্ঞায় বলেছেন, এই উন্নয়ন প্রাথমিক স্তরে গরিব লোকদের ভৌতিক জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির সঙ্গে সরাসরি জড়িত। এটা বর্ধিত আয়, প্রকৃত আয়, শিক্ষা পরিষেবা, স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পয়ঃপ্রণালী, জলসরবরাহ ইত্যাদির সাহায্যে পরিমাণগত পরিমাপ করা যায়। আরও স্পষ্ট ভাষায় বলা যায়, স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্য হলো গরিব লোকদের পরম দারিদ্র্যের হার কখনো যা তাদের চিরস্থায়ী এবং সুরক্ষিত জীবিকাকে সুনিশ্চিত করে এবং সম্পদের নিষ্কাশন, পরিবেশগত অবক্ষয়, সংস্কৃতিক বাধা এবং সামাজিক অস্থিরতা হ্রাস করে। এই অর্থে স্থিতিশীল উন্নয়ন হলো একটি উন্নয়ন যা সকলের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করে। বিশেষ করে বহুসংখ্যক গরিবদের। এই মৌলিক প্রয়োজনগুলো হল রোজগার, খাদ্য, বিদ্যুৎ, জল, এবং ঘরবাড়ি প্রয়োজনগুলো পরিপূর্ণ করার জন্য কৃষি, শিল্পপণ্য উৎপাদন, শক্তি এবং পরিষেবা ক্ষেত্রের বিকাশ নিশ্চয়তা করা জরুরি।

ব্রান্ডল্যান্ড কমিশন ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুরক্ষিত করার উপর জোর দিয়েছিল। এটা পরিবেশবিদদের ঐ যুক্তির সমর্থন করে যেখানে বলা হয়েছে যে এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব যে আমরা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এক সুন্দর পৃথিবী রেখে যাই। অন্যভাবে বলতে পারি, ভবিষ্যত প্রজন্মকে বর্তমান প্রজন্ম দ্বারা এক শ্রেষ্ঠতর পৃথিবী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রদান করা উচিত। কর্মকরেও আমাদের আগামী প্রজন্ম-এর জীবনের জন্য ভালো গুণাবলি সম্পন্ন সম্পদের ভাণ্ডার দিয়ে যাওয়া উচিত, যা আমরা উত্তরাধিকারী হিসাবে পেয়েছি।

বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ব হল, এমন উন্নয়ন সংগঠিত করা যা প্রাকৃতিক উপকরণগুলোর বিকাশ ঘটায় এবং পরিবেশকে এমনভাবে নির্মাণ করে যার ফলে নিম্নের বিষয়গুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(i) প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ (ii) প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের পুনরুৎপাদন (iii) ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বাড়তি খরচ বা ঝুঁকি চাপনো থেকে বিরত থাকা।

বিখ্যাত পরিবেশবাদী অর্থনীতিবিদ হরমন ভেলির মতে স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্নের বিষয়গুলোর দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

(i) জনসংখ্যাকে পরিবেশের ধারণ ক্ষমতার স্তর পর্যন্ত সীমিত রাখতে হবে। পরিবেশের ধারণক্ষমতা জাহাজের 'ভারবহনকারী খোলের' মতো যা জাহাজের ভারসীমার নির্দেশক। অর্থ ব্যবস্থায় এইরকম ভারবহনকারী খোলের অভাব হলে মানুষের সংখ্যা পৃথিবীর ধারণক্ষমতার অধিক হয়ে থাকে এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন থেকে আমাদের দূরে নিয়ে যাবে।

(ii) প্রযুক্তিগত উন্নয়ন উপকরণ ভোগ না হয়ে উপকরণ দক্ষতামুখী হওয়া উচিত।

(iii) নবীকরণযোগ্য সম্পদের নিষ্কাশন স্থিতিশীল হওয়া উচিত যাতে নিষ্কাশনের হার পুনরুৎপাদনের হারের তুলনায় বেশি না হয়।

(iv) অনবীকরণযোগ্য সম্পদের অবক্ষয় হার নবীকরণযোগ্য বিকল্প সৃষ্টির হারের তুলনায় বেশি হওয়া উচিত হবে না।

(v) দূষণের ফলে সৃষ্ট অসামর্থ্যগুলোকে সংশোধন করা অতি প্রয়োজনীয়।

9.5 স্থিতিশীল উন্নয়নের কৌশলসমূহ

অপ্রথাগত শক্তির উৎসের ব্যবহার :

তুমি তো জান, ভারত তার বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য তাপবিদ্যুৎ এবং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর উপর খুব বেশি নির্ভরশীল। উভয় ক্ষেত্রেই অধিক মাত্রায় পরিবেশ জনিত বিরূপ প্রভাব রয়েছে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো অধিক মাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ করে, যা একটি গ্রিন হাউস গ্যাস। যদি সঠিকভাবে ব্যবহার না করা হয় তবে এগুলো থেকে ধোঁয়ার সাথে ছাই নির্গমন হয়। ফলস্বরূপ, জল, জমি এবং পরিবেশের অন্যান্য উপাদান দূষিত হয়। জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনাগুলো অরণ্যকে প্লাবিত করে এবং নদীর জল ধারা তথা নদী অববাহিকার প্রাকৃতিক জল প্রবাহকে কমিয়ে দেয়। বায়ুশক্তি এবং সৌররশ্মি অ-প্রথাগত শক্তির ভালো উদাহরণ। কিন্তু প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে এখনও এই ক্ষেত্রগুলোতে বড়ো মাত্রায় সাফল্য কুড়ানো যায়নি।

গ্রামীণ অঞ্চলে/এলাকায় এল পি জি এবং গোবর গ্যাস :

গ্রামীণ এলাকার পরিবারগুলো সাধারণত কাঠ, গোবরের খোটা অথবা অন্যান্য জৈব বস্তুগুলোকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে। এই প্রথার অনেক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে যেমন অরণ্যনিধন, সবুজায়ন হ্রাস, গোবরের অপচয় এবং বায়ুদূষণ। এই পরিস্থিতির সংশোধন করার জন্য ভরতুকিতে এল পি জি সরবরাহ করা হচ্ছে। এর সাথে যোগ করা হয়েছে গোবর গ্যাস প্রকল্প স্থাপনের জন্য সহজ ঋণ এবং ভরতুকি প্রদান। তরলকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (LPG) হল একটি পরিষ্কার তরল।

যা পারিবারিক ক্ষেত্রে দূষণের পরিমাণকে কমায়। তাছাড়া এক্ষেত্রে শক্তির অপচয়ও ন্যূনতম হয়। গোবর গ্যাস প্রকল্প পরিচালনার জন্য গোবর প্ল্যান্টের মধ্যে ফেলা হয় এবং তা থেকেই গ্যাস উৎপাদিত হয়। এই গ্যাস জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আবার পড়ে থাকা অবশিষ্টাংশটি খুব ভালো জৈব সার এবং মাটির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি সহায়ক।

শহরাঞ্চলের সি এন জি :

দিল্লিতে সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থায় জ্বালানি হিসাবে কমপ্রেসড ন্যাচারেল গ্যাস (CNG) ব্যবহারে বায়ুদূষণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এবং গত কয়েক বছরে বায়ু অনেক পরিষ্কার হয়েছে।

বায়ুশক্তি : যে সব অঞ্চলে বাতাসের গতি সাধারণত বেশি থাকে, সেখানে বায়ু কতগুলো পরিবেশে কোন প্রতিকূল প্রভাব ছাড়াই বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে। বাতাসের সাথেই বায়ুকলের টারবাইনগুলো ঘুরে এবং বিদ্যুৎ তৈরি হয়। নিঃসন্দেহে প্রাথমিকভাবে ব্যয় বেশি হয়। কিন্তু এর সুফল এমন যে সহজেই বড়সর খরচকে পুষিয়ে দিতে পারে।

কাজগুলো করো

➢ দিল্লিতে বাস এবং অন্যান্য সরকারি পরিবহণ সংস্থার গাড়িগুলো জ্বালানি হিসাবে পেট্রোল বা ডিজেলের পরিবর্তে CNG ব্যবহার করে। কিছু গাড়িতে পরিবর্তনীয় ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয় এবং সৌরশক্তি ব্যবহার করে রাস্তা আলোকিত করা হয়। এই ধরনের পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে তোমার কী মনে হয়? ভারতে স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাসম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে একটি বিতর্ক সভা করো।

ফোটোভোলটেইক সেলের দ্বারা সৌরশক্তি :

প্রাকৃতিক ভাবেই ভারতে সূর্যের আলো থেকে প্রচুর পরিমাণে সৌরশক্তির আগমন হয়। আমরা বিভিন্ন ভাবে এর ব্যবহার করি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা কাপড়, শস্য, অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য শুষ্ক করা হয় এবং এর ব্যবহারের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যও তৈরি করা হয়। শীতকালে শরীর গরম করার জন্যও আমরা

চিত্র 9.4 : *গোবর গ্যাস প্রকল্পে গোবর ব্যবহারের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন।*

সূর্যালোক ব্যবহার করি। উদ্ভিদরা ফোটোসিন্থেসিস্ পরিচালনা করার জন্য সৌরশক্তি ব্যবহার করে ফোটোভোলটেইক কোষের সাহায্যে সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎ-এ রূপান্তরিত করতে পারি। এই কোশগুলোতে সৌরশক্তিকে আবদ্ধ করে রাখার জন্য বিশেষ ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয় এবং তারপর সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎ-এ রূপান্তর করে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্য এই প্রযুক্তিটি খুবই কার্যকরী। যে সমস্ত অঞ্চলে বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা অসম্ভব বা খুব ব্যয় সাপেক্ষ যেখানে, এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়। এই প্রযুক্তিটি সম্পূর্ণ দূষণ মুক্ত।

ছোটো জলবিদ্যুৎ প্রকল্প : পাহাড়ি অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই ছোটো নদী দেখতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত নদীর অধিকাংশই বারমাস খরস্রোতা থাকে। ছোটো জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে নদীর জলস্রোতের শক্তিকে ব্যবহার করে টারবাইনকে ঘুরানো হয় এবং এই ঘূর্ণায়মান টারবাইন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। স্থানীয়ভাবে এই বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো কম বেশি পরিবেশ বান্ধব কারণ যেখানে এই কেন্দ্রগুলো গড়ে উঠে সেখানে জমির ব্যবহারের প্রকৃতিতে কোনো রকম পরিবর্তন সাধিত হয় না। স্থানীয় চাহিদা পূরণের মতো যথেষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এই সমস্ত কেন্দ্রে। এর অর্থ হল এই সমস্ত প্রকল্পের ফলে বড়ো আকারের সরবরাহ স্তম্ভ এবং পরিবাহী তারের প্রয়োজন দূর হতে পারে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত লোকসানও বন্ধ হতে পারে।

প্রথাগত জ্ঞান এবং আচরণবিধি :

চিরাচরিতভাবে ভারতবর্ষের মানুষ প্রকৃতির খুব নিকটে রয়েছে। তারা পরিবেশের নিয়ন্ত্রক হিসেবে নয়, বরং পরিবেশের একটি উপকরণ হিসাবেই বেঁচেবর্তে রয়েছে। যদি আমরা আমাদের কৃষিব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, বাসস্থান এবং পরিবহণ ব্যবস্থার দিকে ফিরে তাকাই তবে আমরা বুঝতে পারব যে এই সমস্ত অনুশীলন হল পরিবেশ বান্ধব। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে আমরা আমাদের চিরাচরিত অনুশীলগুলো থেকে সরে যাচ্ছি। যার ফলে আমাদের পরিবেশ এবং এমনকি গ্রামীণ ঐতিহ্যেরও প্রবল ক্ষতি হচ্ছে। এমন সময় এসেছে আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরে যাওয়ার। এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে স্বাস্থ্যসেবায়। ভারত খুবই সৌভাগ্যবান যে এখানে ঔষধিগুণ সম্পন্ন প্রায় 15,000 এর বেশি প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় 8,000 এর মত প্রজাতির ব্যবহার নিয়মিত ভাবেই আমাদের লোক সংস্কৃতিতে বিভিন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থায় হয়ে আসছে। পশ্চিমি চিকিৎসা ব্যবস্থার আগ্রাসী অগ্রগমনের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে আমরা আয়ুর্বেদ, উনানি, তিব্বতীয় এবং লোকায়ত চিকিৎসার মত প্রাচীন চিরাচরিত ব্যবস্থাগুলোকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেছি। দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর উপশমের জন্য এই সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রভূত চাহিদা আবার সৃষ্টি হয়েছে। আজকাল সব ধরনের প্রসাধনী দ্রব্য ভেজষ সংমিশ্রণে তৈরি হয়। যেমন, চুলের তেল, দাঁতের মাজন, শরীরের ব্যবহারের লোশন, মুখের ক্রিম ইত্যাদি। এই সমস্ত দ্রব্যগুলো পরিবেশ বান্ধব, এমনকি এসমস্ত দ্রব্যগুলো তুলনামূলকভাবে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন। এদের জন্য খুব বড়ো মাপের শিল্পস্থাপন এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা নেই।

জৈব কম্পোস্ট সার : গত পাঁচ দশকের বেশি সময়ে কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদে আমরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে জৈব সারের ব্যবহারকে উপেক্ষা করে গেছি এবং সার্বিকভাবেই রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। এর ফলস্বরূপ, উৎপাদনশীল জমির একটি বিশাল অংশের জমির মাটির স্বাস্থ্যহানি হয়েছে। এমনকি জলের ভাণ্ডার সহ ভূগর্ভস্থ জলপ্রণালী ও চরম রাসায়নিক দূষণের কবলে পড়েছে। এর সাথে আবার সেচের জন্য জলের চাহিদাও বছরের পর বছর বেড়েই চলছে।

এখন সারা দেশের বিশাল পরিমাণ কৃষক পুনরায় জৈব বর্জ্য থেকে উৎপাদিত জৈব সারের ব্যবহার শুরু করেছে। দেশের কিছু অংশে গবাদি পশু পালন করা হয় কেবলমাত্র এই কারণে যে তারা গোবর উৎপাদন করে।

'গোবর' সার হিসাবে খুবই উৎকৃষ্ট এবং মাটির উর্ব্বরতা রক্ষায় সহায়ক।

স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়ার তুলনায়, কেঁচো অধিক দ্রুততার সাথে জৈব বস্তুকে জৈব সারে পরিণত করতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি এখন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পরোক্ষভাবে, পুর সংস্থানগুলোও এর কারণে উপকৃত হয়েছে কারণ তাদের এখন কম পরিমাণে বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা করতে হয়।

ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গের নিয়ন্ত্রণে জৈব পদ্ধতি :

সবুজ বিপ্লবের অগ্রযাত্রার সাথে সারা দেশ ফসলের উচ্চফলনের জন্য আরও অধিকতর রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল। তবে শীঘ্রই এর ক্ষতিকর প্রভাব দেখা গিয়েছিল। খাদ্যদ্রব্যের দূষণ ছড়িয়ে পড়ল। মাটি, জলভাণ্ডারগুলো এমনকি ভূগর্ভস্থ জলও দূষিত হতে লাগল। এমনকি দুধ, মাংস এবং মাছের মধ্যেও দূষণ ধরা পড়ল।

এই পরিস্থিতি মোকাবেলায়, কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও উন্নত পদ্ধতি চালুর প্রচেষ্টা চলছে। এক্ষেত্রে একটি পদক্ষেপ হল উদ্ভিদের কীটনাশকের ব্যবহার। এর মধ্যে নিমগাছের ব্যবহার খুবই উপযোগী। নিমগাছ থেকে অনেকরকম কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রক রাসায়নিকের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে। মিশ্র চাষ এবং একই জমিতে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন ধরনের শস্য চাষ করার ফলে কৃষকরাও সহযোগিতা করছে।

এর সাথে বিভিন্ন পশু ও পাখি সম্পর্কেও সচেতনতা বেড়েছে। অনেক পশুপাখি কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। যেমন প্রাণীদের মধ্যে প্রধান হল সাপ, যা ইঁদুর এবং বিভিন্ন কীটপতঙ্গ শিকার করে। একই ভাবে পাখিদের অনেক প্রজাতি কীটমুষিকাদি এবং পতঙ্গের শিকার করে। যেমন পেঁচা এবং ময়ূর। যদি এই সমস্ত পশু ও পাখিদের কৃষিক্ষেত্রের আশেপাশে বসবাস করতে দেওয়া হয় তবে তারা পোকামাকড়দের সাথে অনেক ধরনের কীটপতঙ্গের বিনাশ করতে পারবে। এক্ষেত্রে টিকটিকিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে এবং তাদের রক্ষা করতে হবে।

আজকাল 'স্থিতিশীল উন্নয়ন' কথাটি খুব প্রচলিত শব্দ বন্ধ। এটি প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন বিষয়ক চিন্তাধারার একটি আমূল পরিবর্তন। যদিও এই ধারণাটিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে এই পথ অনুসরণ করলে সবার জন্য চিরস্থায়ী উন্নয়ন এবং অ-হ্রাসমান কল্যাণকে সুনিশ্চিত করা যাবে।

9.6 উপসংহার

অর্থনৈতিক উন্নয়ন যার লক্ষ্য ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন পূরণের জন্য দ্রব্য এবং সেবাকার্যাদির উৎপাদনের বৃদ্ধি যা পরিবেশের উপর অধিকতর চাপ সৃষ্টি করে। উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবেশজাত সম্পদের চাহিদা তার যোগানের চেয়ে কম ছিল। এখন পৃথিবী এমন এক অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে যেখানে পরিবেশজাত সম্পদের চাহিদা ক্রমবর্ধমান কিন্তু অত্যাধিক ব্যবহার এবং অপব্যবহারের করণে তাদের যোগান হল সীমিত। স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে এমন এক উন্নয়নের ধরনকে আয়ত্ত করা, যা পরিবেশগত সমস্যাগুলোকে কমিয়ে আনতে পারে এবং এই ধরনের উন্নয়নে ভবিষ্যত প্রজন্মের নিজস্ব চাহিদা মেটানোর সক্ষমতার সাথে কোন রূপ আপস না করেই বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর প্রক্রিয়া পরিচালনা করা যায়।

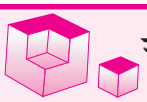

সংক্ষিপ্ত বৃত্তি

➢ পরিবেশ চারটি কার্য করে : সম্পদের যোগান দেয়, বর্জ্য শোষণ করে, জিনগত এবং জৈব বৈচিত্র্যের মাধ্যমে প্রাণের অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং সৌন্দর্য বিষয়ক সেবা প্রদান করে।

➢ জনবিস্ফোরণ, বৈভবশালী ভোগাচার ও উৎপাদন পরিবেশের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে।

➢ ভারতের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে তার পরিমিত সম্পদের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছে এবং সাথে সাথে তা মানুষের স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধির উপরও প্রভাব ফেলছে।

➢ ভারতে পরিবেশগত বিপদের দুইটি ধারা বর্তমান। এর একটি হল দারিদ্রের কারণ জনিত দূষণ ও অপরটি হল ধনবত্তা ও দ্রুত বিকাশমান শিল্পক্ষেত্রের কারণে দূষণ।

➢ বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে, সরকার, পরিবেশকে সুরক্ষা প্রদানের চেষ্টা করলেও এক্ষেত্রে স্থিতিশীল উন্নয়নের পথ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

➢ স্থিতিশীল উন্নয়ন হল এমন এক ধরনের উন্নয়ন যেখানে ভবিষ্যত প্রজন্মের নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতার সাথে কোনো রকম আপস না করেই বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণের প্রক্রিয়াকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

➢ প্রাকৃতিক সম্পদের পরিবর্ধন, সংরক্ষণ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুৎপাদনশীল ক্ষমতার সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পরিবেশগত ঝুঁকিগুলোকে দূর করার মাধ্যমেই স্থিতিশীল উন্নয়নের পথ প্রশস্থ হবে।

অনুশীলনী

1. পরিবেশ বলতে কী বোঝ?
2. যখন সম্পদের নিঃসরণের হার তার পুনরুৎপাদনের হার থেকে বেশি হয়, তখন কী হয়?
3. নীচেরগুলোকে পুনর্নবীকরণযোগ্য এবং অ-পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদের শ্রেণি বিন্যাস করো।
   (i) গাছ (ii) মাছ (iii) পেট্রোলিয়াম (iv) কয়লা (v) লোহ আকরিক (vi) জল
4. আজ বিশ্বের দুটি প্রধান পরিবেশগত সমস্যা হল ---------- এবং -------------।
5. নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ভারতে পরিবেশগত সমস্যায় কীভাবে প্রভাব ফেলছে? এগুলো সরকারের সামনে কী ধরনের সমস্যা তৈরি করোছে?
   (i) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা
   (ii) বায়ুদূষণ
   (iii) জলের কলুষিতকরণ

(iv) ধনবানদের ভোগের মান

(v) নিরক্ষরতা

(vi) শিল্পায়ন

(vii) শহরায়ন

(viii) অরণ্য আচ্ছাদিত এলাকার হ্রাস

(ix) চোরাশিকার

(x) ভূ-উষ্ণায়ন

6. পরিবেশের কাজগুলো কী কী?

7. ভারতে জমির উর্বরতা হ্রাসে ছয়টি কারণ চিহ্নিত করো।

8. পরিবেশের ঋণাত্মক বা ক্ষতিকরো প্রভাবের সুযোগ ব্যয় কীভাবে অধিক হয় ব্যাখ্যা করো।

9. ভারতে স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপগুলোর রূপরেখা তৈরি করো।

10. ভারতে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে বক্তব্যটি প্রমাণ করো।

11. পরিবেশগত সংকট কি একটি ইদানিংকালের ঘটনা? যদি হ্যাঁ হয় তবে কেন?

12. দুটি করে উদাহরণ দাও —

(ক) পরিবেশগত সম্পদের অত্যাধিক ব্যবহার।

(খ) পরিবেশগত সম্পদের অপব্যবহার।

13. ভারতের যেকোন চারটি পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো। পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্রে সুযোগ ব্যয় রয়েছে — ব্যাখ্যা করো।

14. পরিবেশগত সম্পদের চাহিদা যোগানের বৈপরিত্যের বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

15. বর্তমান পরিবেশগত সংকটের কারণগুলো বর্ণনা করো।

16. ভারতের উন্নয়নের যে-কোনো দুটি ক্ষতিকারক পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করো। ভারতের পরিবেশগত সমস্যাগুলোতে এক ধরনের বৈপরীত্য দেখা যায় — এগুলো একদিকে দারিদ্রের কারণ সৃষ্ট এবং অন্যদিকে উচ্চ বৈভবপূর্ণ জীবনমানের ফলে সৃষ্ট। এটা কি সত্য?

17. স্থিতিশীল উন্নয়ন কী?

18. তোমাদের স্থানীয় অবস্থানের উপর ভিত্তি করে স্থিতিশীল উন্নয়নের চারটি কৌশল বর্ণনা করো।

19. স্থিতিশীল উন্নয়নের সংজ্ঞাতে অন্তঃপ্রজন্মগত সাম্যতার ধারণার গুরুত্ব আলোচনা করো।

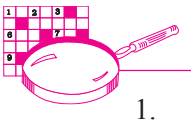

প্রস্তাবিক অতিরিক্ত কার্যকলাপসমূহ

1. মনে করো প্রতি বছর লক্ষ গাড়ি মেট্রোশহরগুলোর রাস্তায় আসছে। কোনো ধরনের সম্পদগুলো এই কারণে নিঃশেষিত হচ্ছে বলে তোমার মনে হয়? আলোচনা করো।

2. যে সমস্ত দ্রব্যগুলোকে পুনর্ব্যবহার করা যায় তাদের তালিকা তৈরি করো।

3. ভারতে ভূমিক্ষয়ের কারণ এবং এর প্রতিকার সমূহের উপর একটি চার্ট তৈরি করো।

4. পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টিতে জনবিস্ফোরণ কীভাবে অবদান রেখেছে? এপ্রসঙ্গে শ্রেণিকক্ষে একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করো।

5. পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতিগুলোকে পূরণের জন্য রাষ্ট্রকে প্রচুর মূল্য প্রদান করোতে হবে — ব্যাখ্যা করো।

6. তোমাদের গ্রামে একটি কাগজ তৈরির কারখানা স্থাপন করা হবে। সমাজকর্মী উদ্যোগপতি এবং গ্রামবাসীর ভূমিকা নিয়ে একটি নাটক উপস্থাপন করো।

REFERENCES

Books

AGARWAL, ANIL and SUNITA NARAIN. 1996. *Global Warming in an Unequal World.* Centre for Science and Environment, Reprint Edition, New Delhi.

BHARUCHA, E. 2005. *Textbook of Environmental Studies for Undergraduate Courses*, Universities Press (India) Pvt Ltd.

CENTRE FOR SCIENCE AND ENVIRONMENT. 1996. *State of India's Environment* 1: *The First Citizens' Report 1982.* Reprint Edition, New Delhi.

CENTRE FOR SCIENCE AND ENVIRONMENT. 1996. *State of India's Environment* 2: *The Second Citizens' Report 1985*, Reprint Edition, New Delhi.

KARPAGAM, M. 2001.*Environmental Economics: A Textbook.* Sterling Publishers, New Delhi.

RAJAGOPALAN, R. 2005. *Environmental Studies: From Crisis to Cure.* Oxford University Press, New Delhi.

SCHUMACHER, E.F. *Small is Beautiful*. Abacus Publishers, New York.

Reports

State of India's Environment (for various years), Centre for Science and Environment, New Delhi.

Journals

Scientific American, India, Special Issue, September 2005
Down to Earth, Centre for Science and Environment, New Delhi.

Websites

http://envfor.nic.in
http://cpcb.nic.in
http://www.cseindia.org

একক

৪

ভারতের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা : প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে একটি তুলনামুলক আলোচনা

আজকের বিশ্বায়নের পৃথিবীতে যেখানে ভৌগোলিক সীমাগুলো ধীরে ধীরে অর্থহীন হয়ে পড়েছে, সেখানে উন্নয়নশীল বিশ্বের কোনো একটি রাষ্ট্রের তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো বোঝা খুবই প্রয়োজনীয়। এর গুরুত্ব আরও বাড়ছে কারণ তারা বিশ্ববাজারে অপেক্ষাকৃত সীমিত অর্থনৈতিক স্থানই দখল করতে পেরেছে। এই এককে, আমরা ভারতের উন্নয়নের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী রাষ্ট্র চিন এবং পাকিস্তানের উন্নয়ন অভিজ্ঞতার তুলনামূলক আলোচনা করব।

10

ভারত এবং তার প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনামূলক উন্নয়নের অভিজ্ঞতা

এই অধ্যায় পাঠ করে তোমরা সক্ষম হবে —

- ভারত এবং তার প্রতিবেশী দেশ, চিন এবং পাকিস্তানের অর্থনৈতিক এবং মানব উন্নয়নের সূচকগুলোর গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করতে।
- উন্নয়নের বর্তমান অবস্থায় পৌঁছতে গিয়ে এই দেশগুলো যে রণকৌশল নিয়েছিল তা মূল্যায়ণ করতে।

ভূগোল আমাদের প্রতিবেশী বানিয়েছে, ইতিহাস আমাদের বন্ধু করেছে, অর্থনীতি আমাদের করেছে সহযোগী, প্রয়োজন করেছে সুহৃৎ। যাদের পরমেশ্বরই এভাবে মিলিয়েছে তাদের মানুষ কিভাবে পৃথক করবে।

— জন এফ্ কেনেডী

10.1 ভূমিকা

পূর্ববর্তী এককগুলোতে আমরা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভিজ্ঞতাগুলো বিস্তারিত পাঠ করেছি। আমরা এও পাঠ করেছি যে ভারত কোন্ কোন্ ধরনের নীতিমালা গ্রহণ করেছিল, যাদের ভিন্নতর প্রভাব অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে পড়েছিল। বিগত দুই দশক ধরে আংশিকভাবে বিশ্বায়নের প্রভাবে ভারতসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশে অর্থনৈতিক রূপান্তর এসেছে। এই রূপান্তরের কিছু স্বল্পকালীন এবং কিছু দীর্ঘকালীন প্রভাব আছে প্রতিটি দেশে এমনকি ভারতেও। প্রতিটি রাষ্ট্র তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য অনেক কৌশল গ্রহণ করেছে। এই উদ্দেশ্যে, তারা অনেক ধরনের আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক গোষ্ঠী তৈরি করেছিল — যথা সার্ক (SAARC), ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আসিয়ান (ASEAN), ব্রিকস (BRICS), G-8, G-20 ইত্যাদি। এছাড়াও, বিভিন্ন রাষ্ট্র তা জানতে উৎসুক যে তার প্রতিবেশী দেশগুলো কোন্ কোন্ ধরনের উন্নয়নমুখী পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এইভাবে তারা নিজেদের এবং তাদের প্রতিবেশী দেশের শক্তি এবং দুর্বলতার পার্থক্য ভালোভাবে বুঝতে পারে। বিশ্বায়নের ক্রমাগত উন্মোচনের ফলে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অবস্থা জ্ঞাত থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। কেননা এই উন্নয়শীল দেশগুলোকেই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয় শুধুমাত্র তাদের চাইতে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গেই নয়, তাদের মতো উন্নয়নশীল হয়ে উঠা অন্যান্য ছোটোখাটো রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে। এছাড়া প্রতিবেশী দেশগুলোর অর্থনৈতিক কার্যকলাপগুলো সম্পর্কেও আমাদের ধারণা থাকা দরকার কেননা একটি বৃহৎ অঞ্চলের সকল মুখ্য অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপরই নির্ভর করে সেই অঞ্চলের মানুষের সার্বিক উন্নতি।

এই অধ্যায়ে আমরা ভারত এবং তার দুই বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ও চিন দ্বারা গৃহীত উন্নয়নমুখী পরিকল্পনাগুলো তুলনা করব। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে, এই দেশগুলোর মধ্যে বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদজনিত সাদৃশ্য থাকলেও রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিকাঠামোগত দিক দিয়ে দেখতে গেলে, তাদের মধ্যে অল্পই সাদৃশ্য রয়েছে। ভারতবর্ষ — পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র এবং অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে ধর্মনিরপেক্ষ এবং অত্যন্ত উদার মনোভাবাপন্ন সংবিধানের অধিকারী দেশ হিসেবে পরিগণিত। এই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা, পাকিস্তানের প্রবল সামরিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক ক্ষমতা, চিনের নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। চিন শুধুমাত্র সাম্প্রতিককালে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং উদারবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে নিজেকে পরিবর্তিত করছে।

10.2 উন্নয়নমুখী দিশা : একটি ক্ষনচিত্র

তুমি কি জান, ভারত, পাকিস্তান এবং চিনের উন্নয়নমুখী পরিকল্পনাগুলোতে অনেক সাদৃশ্য আছে? তিনটি দেশ একই সময়ে উন্নয়নের পথে চলা শুরু করেছিল। ভারত এবং পাকিস্তান 1947 সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল এবং গণতান্ত্রিক চিন সরকারের স্থাপনা হয়েছিল 1949 সালে। ঐ সময় পণ্ডিত জওহলালাল নেহেরু তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন, "যদিও ভারত এবং চিনের বিষয়গতভাবে চিন্তা ও ভাবধারায় অনেক পার্থক্য আছে, তথাপিও দেশ দুইটির নতুন এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন

এশিয়ার নতুন ভাবনা এবং নতুন উদ্ভাবনী শক্তির প্রতীক স্বরূপ এশিয়ার দেশগুলোতে এক নতুন অভিব্যক্তি খুঁজে পাচ্ছে।

তিনটি দেশই একইভাবে তাদের উন্নয়নমুখী পরিকল্পনাগুলো শুরু করেছিল। ভারত 1951-56 সালে তার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। আর পাকিস্তান 1956 সালে তার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঘোষণা করে, যাকে এখন মধ্যকালীন উন্নয়ন পরিকল্পনা বলা হয়। চিন 1953 সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঘোষণা করে। 2013 সাল থেকে পাকিস্তান 11-তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (2013-18) উপর ভিত্তি করে কাজ করে যাচ্ছে অন্যদিকে চিন কাজ করছে 13-তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (2016-20) উপর। মার্চ 2017 পর্যন্ত, ভারত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভিত্তিক উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা চালিয়ে যাচ্ছিল। ভারত এবং পাকিস্তান একই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল — যেমন, অনেক সরকারি ক্ষেত্রের সৃষ্টি এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি। আশির দশক পর্যন্ত তিনটি দেশেরই বিকাশ হার এবং মাথাপিছু আয় এক ছিল। আজ তারা একে অপরের তুলনায় কোন্ অবস্থানে আছে? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আগে, আমরা চিন এবং পাকিস্তানের উন্নয়মুখী পরিকল্পনাগুলোর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের উপর দৃষ্টিপাত করি। পূর্ববর্তী তিনটি একক পাঠ করে আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি স্বাধীনতার পর থেকে ভারত কোন্ নীতিগুলো গ্রহণ করেছিল।

চিন : একদলীয় শাসন ব্যবস্থার অন্তর্গত গণ প্রজাতান্ত্রিক চিন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অর্থ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো, উদ্যোগ তথা জমি, যেগুলোর মালিকানা এবং পরিচালন ক্ষমতা ব্যক্তিগত — তা সবই সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। 1958 সালের 'সামনের দিকে বিরাট লাফ' নীতি (GLF) শুরু করা হয়েছিল যার উদ্দেশ্য ছিল দেশে ব্যাপক হারে শিল্পক্ষেত্র গড়ে তোলা। নিজের ঘরের পেছনে শিল্প উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য লোকদের উৎসাহিত করা হত। গ্রামীণ এলাকায় 'কমিউন' (যৌথ খামার) শুরু করা হয়েছিল। এই যৌথ খামারগুলোর তত্ত্বাবধানে লোকেরা সম্মিলিতভাবে জমি চাষ করত। 1958 সালে 26,000 যৌথখামারের মাধ্যমে প্রায় সকল কৃষকদের এই ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছিল।

GLF অভিযান অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। ভয়ঙ্কর খরায় চিনের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল এবং প্রায় 30 মিলিয়ন লোকের মৃত্যু হয়েছিল। যখন চিন এবং রাশিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে, তখন রাশিয়া তার নিজের বিশেষজ্ঞদের যারা চিনে শিল্পায়নে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন, তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। মহান সর্বহারার সাংস্কৃতিক বিপ্লব (Great Proletarion Cultural Revolution, 1966-76) শুরু করেছিলেন। যার অধীনে ছাত্র ও পেশাদারিদের গ্রামীণ এলাকায় কাজ করতে এবং অধ্যয়ন করতে পাঠানো হত।

বর্তমান সময়ে চিনে যে দ্রুত শিল্প ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটেছে এর উৎস 1978 সালে নেওয়া সংস্কার নীতিতে খুঁজে দেখা যেতে পারে। চিন ধাপে ধাপে সংস্কার শুরু করেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে, কৃষি, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ ক্ষেত্রে সংস্কার শুরু হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ, কৃষিক্ষেত্রে — কৃষি খামারের জমি ছোটো ছোটো খণ্ডে ভাগ করে সেগুলোকে আলাদা আলাদা পরিবারের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল (শুধু ব্যবহারের জন্য, মালিকানা দেওয়া হয়নি)। তারা নির্ধারিত কর দেওয়ার পরই জমি থেকে আসা বাকি আয় নিজের কাছে রাখতে পারত। পরবর্তী পর্যায়ে, সংস্কার শুরু হয়েছিল শিল্পক্ষেত্রে। বেসরকারি খাতের সংস্থা তথা গ্রামীণ ও শহুরে উদ্যোগগুলোর (অর্থাৎ যে উদ্যোগগুলোর মালিকানা ও পরিচালনা স্থানীয়ভাবে হয়) উপর দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল যাতে ঐ পর্যায়ে, সরকারের নিজস্ব সংস্থার (যা চিনে রাষ্ট্র অধিকৃত সংস্থা

চিত্র : 10.1 *: ওয়াঘা সীমান্ত শুধুমাত্র পর্যটন স্থলই নয় অধিকন্তু এটি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যস্থল হিসেবে পরিগণিত।*

এবং ভারতে সরকার অধিকৃত সংস্থা নামে পরিচিত) সাথে সরকারি উদ্যোগগুলোর প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। সংস্কার প্রক্রিয়ার সময় দ্বৈতমূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল। এর অর্থ হল দুভাবে মূল্য নির্ধারণ করা হত — কৃষক ও শিল্পগত এককগুলোর সরকার দ্বারা নির্ধারিত দামে নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত দ্রব্য

এবং উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করতে হত এবং বাকি অংশটুকু বাজার দামে ক্রয় বা বিক্রয় করা যেতো। পরবর্তী বছরগুলোতে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে লেনদেন হওয়া দ্রব্য বা উৎপাদনে ব্যবহৃত দ্রব্যের পরিমাণের অনুপাতেও বৃদ্ধি হয়েছিল। বিদেশি বিনিয়োগকে আকর্ষণ করতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হয়েছিল।

পাকিস্তান : পাকিস্তানের গৃহীত আর্থিক নীতিগুলোর দিকে তাকালে তুমি লক্ষ করবে ভারতীয় আর্থিক নীতিগুলোর সঙ্গে এদের অনেক সাদৃশ্য আছে। পাকিস্তানও সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্র সম্মিলিত মিশ্র অর্থনীতি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। পঞ্চাশ ও ষাট দশকের শেষের দিকে পাকিস্তান অনেক ধরনের পরিচালন গত নীতির পরিকাঠামো তৈরি করেছিল (আমদানি প্রতিস্থাপন ভিত্তিক শিল্পায়নের জন্য)। নীতিগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল ভোগ্য পণ্যের প্রস্তুতকরণের জন্য শুল্কে ছাড়ের মাধ্যমে সংরক্ষণ। এছাড়াও এই নীতির মাধ্যমে প্রতিযোগিতমূলক আমদানির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ আমদানি নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা ছিল। সবুজ বিপ্লবের ফলে যান্ত্রিকীকরণের যুগ শুরু হয়েছিল এবং কিছু নির্বাচিত ক্ষেত্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলস্বরূপ খাদ্যশস্যের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সমস্ত নীতি কৃষিজ কাঠামোতে নাটকীয় পরিবর্তন এনেছিল। সত্তরের দশকে মূলধনী পণ্য শিল্পের জাতীয়করণ হয়েছিল। এরপর, পাকিস্তান সত্তর ও আশির দশকের শেষের দিকে তাদের নীতি পাল্টিয়ে দেয় এবং তখন বিজাতীয়করণের দিকে জোর দেওয়া হয়েছিল এবং বেসরকারি ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করা হয়েছিল। এই সময়ে পাকিস্তান পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলো

থেকেও আর্থিক সাহায্য পেয়েছিল। তথা মধ্য-পূর্ব দেশগুলোতে যাওয়া প্রবাসীদের কাছ থেকেও নিরন্তর অর্থ পাওয়া যেত। এরফলে দেশের অর্থনীতি বিকাশে উৎসাহ পাওয়া যায়। তাছাড়া, তখনকার সরকারগুলোও বেসরকারি ক্ষেত্রগুলোকে উৎসাহ দিত। এইসব কারণে দেশে নতুন বিনিয়োগের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। 1988 সালে দেশে সংস্কার চালু হয়েছিল।

চিন এবং পাকিস্তানের উন্নয়নমুখী পরিকল্পনাগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা পাঠ করার পর, চলো আমরা এখন ভারত, চিন এবং পাকিস্তানের কিছু উন্নয়নমূলক সূচকের তুলনামূলক আলোচনা করি।

10.3 জনসংখ্যা বিষয়ক সূচক

যদি আমরা বিশ্বের জনসংখ্যার দিকে তাকাই আমরা এটা দেখতে পাব বিশ্বের প্রতি ছয় জন লোকের মধ্যে একজন ভারতীয় এবং অপরজন চিনদেশীয়। আমরা ভারত, চিন এবং পাকিস্তানের জনসংখ্যা বিষয়ক সূচকগুলোর তুলনা করব। পাকিস্তানের জনসংখ্যা খুব কম এবং চিন বা ভারতের প্রায় এক-দশমাংশ মাত্র।

যদিও চিন সবচেয়ে বড় দেশ এবং ভৌগোলিকভাবে তিনটি দেশের মধ্যে ভূখণ্ডের সবচেয়ে বেশি এলাকা দখল করে আছে, তবে এর ঘনত্ব সবচেয়ে কম। সারণি 10.1 দেখায় পাকিস্তানের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি, তারপরেই রয়েছে ভারত এবং চিন। বিশেষজ্ঞদের মতে সত্তর দশকের শেষের দিকে গৃহীত 'এক সন্তান' নীতি চিনের স্বল্প জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। তারা এটাও বলেন যে, এর ফলে লিঙ্গ অনুপাত (প্রতি 1000 পুরুষে নারীর সংখ্যা) হ্রাস পায়। যাই হোক, সারণি থেকে তুমি এটা দেখতে পাবে যে, তিনটি দেশেই লিঙ্গ অনুপাতে নারীর অবস্থান নীচে ও একপেশে হয়ে আছে। বিশেষজ্ঞদের মতে পুত্রসন্তানের প্রতি মোহ-ই এর কারণ। সম্প্রতি, তিনটি দেশই এই অবস্থার উন্নতির জন্য অনেকগুলো উপায় গ্রহণ করেছে। এক সন্তান নীতি এবং এর প্রয়োগের পরিণাম স্বরূপ জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের কিছু অন্য প্রভাবও ছিল। উদাহরণস্বরূপ, কিছু দশকের পর চিনে যুবকের তুলনায় বৃদ্ধ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এই কারণে চিনের প্রত্যেক দম্পতিকে দুই সন্তান গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

চিনে প্রজনন হারও কম, অপরদিকে পাকিস্তানে এই হার খুব বেশি। চিনে শহরীকরণের হারও বেশি। আর ভারতের ক্ষেত্রে 33 শতাংশ মানুষ শহরাঞ্চলে বসবাস করেন।

সারণি 10.1

কিছু নির্বাচিত জনসংখ্যা বিষয়ক সূচক, 2015

দেশ	আনুমানিক জনসংখ্যা (মিলিয়নে)	জনসংখ্যার বার্ষিক বিকাশের হার	ঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমি)	লিঙ্গ অনুপাত	প্রজনন হার	শহরীকরণ
ভারত	1311	1.2	441	929	2.3	33
চিন	1371	0.5	146	941	1.6	56
পাকিস্তান	188	2.1	245	947	3.7	39

উৎস : *বিশ্ব উন্নয়নমূলক সূচক, 2017, www.worldbank.org*

10.4 মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং ক্ষেত্রসমূহ

চিনের সম্পর্কে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি চর্চিত বিষয় হল ওই দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বিকাশ। চিনের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) $19.8 ট্রিলিয়ন যা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থানে রয়েছে। যেখানে ভারতের GDP হল $ 8.07 ট্রিলিয়ন এবং পাকিস্তানের GDP হল $ 0.94 ট্রিলিয়ন, যা ভারতীয় GDP -এর প্রায় 12%। আর ভারতের GDP, চিনের GDP-র প্রায় 40%।

চিত্র 10.2 : *ভারত, চিন এবং পাকিস্তানের ভূমির ব্যবহার ও কৃষি।*

যেখানে অনেক উন্নত দেশের 5% বিকাশের হার ধরে রাখতে কষ্ট হয়, সেখানে চিন প্রায় এক দশক ধরে দুই অঙ্কের বেশি বিকাশের হার ধরে রেখেছে। যা সারণি 10.2 থেকে দেখা যায়।

এটাও দেখা যায়, আশির দশকে পাকিস্তানের বিকাশের হার ভারত থেকেও বেশি ছিল। চিনের বিকাশের হার ছিল দুই অঙ্কে এবং ভারত ছিল সবচেয়ে নীচে। 2011-15 সালগুলোতে ভারত ও চিনের বিকাশের হারে

সারণি **10.2**

মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বার্ষিক বিকাশের হার (%) - 1980-2015

দেশ	*1980–90*	*2011–2015*
ভারত	5.7	6.7
চিন	10.3	7.9
পাকিস্তান	6.3	4.0

উৎস : *এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, বিশ্ব উন্নয়নসূচক 2016, এশিয়া এবং পেসিফিক 2016এর মুখ্যসূচক।*

কাজগুলো করো

- ভারত কি জনসংখ্যা স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কোনো ব্যবস্থা অনুসরণ করে? যদি তা করে থাকে, তবে এর বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করো এবং তা শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো। এরজন্য তোমরা সর্বশেষ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের ওয়েবসাইটটি পর্যবেক্ষণ করতে পারো।
- বিশেষজ্ঞরা লক্ষ করেছেন, ভারত, চিন এবং পাকিস্তান-এর মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পুত্র সন্তানকে অধিক প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। তোমরা কি তোমাদের পরিবার বা পার্শ্ববর্তী এলাকাতে এই ধরনের ঘটনা লক্ষ করেছ? মানুষ পুত্র সন্তান এবং কন্যা সন্তানের মধ্যে কেন বৈষম্য করে? এই ব্যাপারে তুমি কী মনে কর? শ্রেণিকক্ষে তোমরা এই বিষয়গুলো আলোচনা করো।

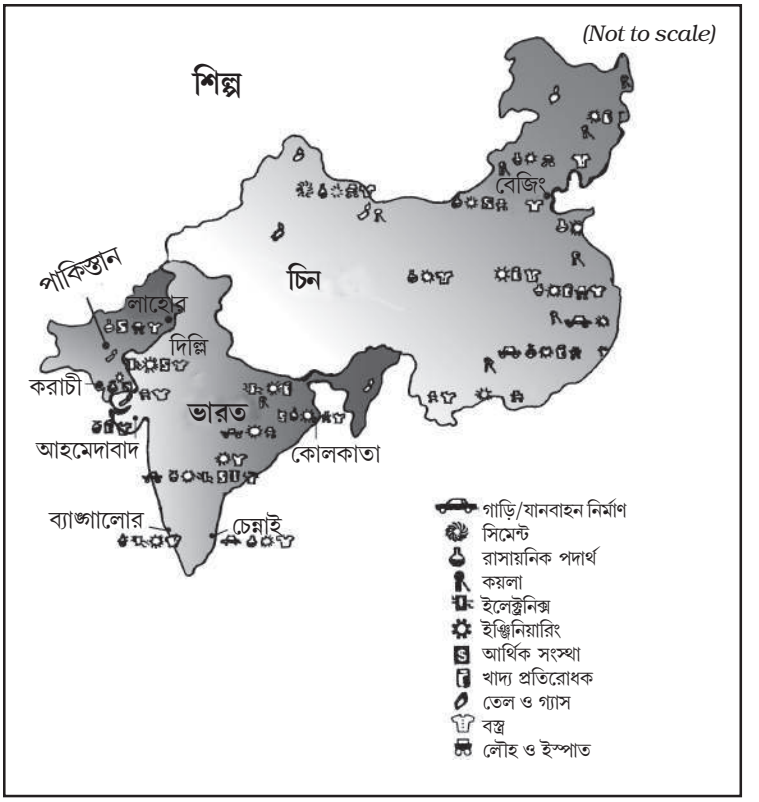

চিত্র 10.3 : *ভারত, চিন এবং পাকিস্তানের শিল্পক্ষেত্র*

সামান্য পতন আসে। কিন্তু অন্যদিকে, পাকিস্তানের বিকাশের হারে বিশাল পতন সংঘটিত হয়। এসময় পাকিস্তানের বিকাশের হার মাত্র 4% -এ নেমে দাঁড়ায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, পাকিস্তান দ্বারা 1988 সালে গৃহীত আর্থিক সংস্কার এবং অনেক দিন ধরে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা পাকিস্তানের এই পতন প্রবণতার কারণ। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা অধ্যয়ন করব, কোন্ ক্ষেত্রটি দেশগুলোর এই দিশায় বেশি ভূমিকা গ্রহণ করে।

প্রথমে এটা দেখো যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত লোকের GDP-তে কীরূপ অবদান রাখে। পূর্ববর্তী খণ্ডে এটা বলা হয়েছে যে, ভারতের তুলনায় চিন ও পাকিস্তানে শহুরে জনগণের অনুপাত বেশি। ভূসংস্থান এবং জলবায়ু সংক্রান্ত পরিবেশের কারণে চিনের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম — দেশের মোট জমির প্রায় 10 শতাংশ মাত্র। চিনের মোট চাষযোগ্য জমি ভারতের চাষযোগ্য জমির 40 শতাংশ। আশির দশক পর্যন্ত, চিনের 80 শতাংশেরও বেশি জনগণের জীবিকা নির্বাহের মূল সাধন ছিল কৃষি। তখন থেকে চিন সরকার দেশের জনগণকে তাদের জমি ত্যাগ করে হস্তশিল্প, বাণিজ্য তথা পরিবহণ-এর মতো কাজগুলোকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করত।

2014-15 অর্থ বছরে চিনের শ্রমশক্তির 28% কৃষিতে নিযুক্ত ছিল এবং তাদের GDP-তে যোগদান ছিল 9%। সারণি 10.3 দেখো, ভারত এবং পাকিস্তানের GDP-তে কৃষির অবদান ছিল যথাক্রমে 17% এবং 25%। কিন্তু আনুপাতিক হারে শ্রমশক্তির কৃষিতে নিযুক্তিকরণ পাকিস্তানের তুলনায় ভারতে বেশি ছিল। পাকিস্তানে দেশের প্রায় 43% শ্রমশক্তি কৃষিতে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু ভারতে এই নিযুক্তি 50%। উৎপাদন তথা রোজগারের ক্ষেত্রগত অবদান থেকে এটাও বোঝা যায় যে, এই তিন অর্থ ব্যবস্থাতেই শিল্প এবং সেবাক্ষেত্রে শ্রমশক্তির নিযুক্তি আনুপাতিক হারে কম। কিন্তু উৎপাদনের বিচারে তাদের অবদান বেশি। চিনের GDP-তে নির্মাণজাত এবং

সারণি 10.3

2014-15 সালের রোজগার এবং GDP-র ক্ষেত্রগত অংশীদারিত্ব

ক্ষেত্র	*GDP*-তে অবদান			শ্রমশক্তির বণ্টন		
	ভারত	চিন	পাকিস্তান	ভারত	চিন	পাকিস্তান
কৃষি	17	9	25	50	28	43
শিল্প	30	43	21	21	29	23
সেবা	53	48	54	29	43	34
মোট	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

উৎস : *বিশ্ব উন্নয়ন নির্দেশক 2016; এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের মুখ্য নির্দেশক 2016।*

সেবাক্ষেত্রের অবদান সবচেয়ে বেশি, যথাক্রমে 43% এবং 48%। সেখানে ভারত ও পাকিস্তানে GDP-তে সেবাক্ষেত্রের অবদান সবচেয়ে বেশি এবং শতকরা হারে তা 50 শতাংশেরও বেশি।

বিকাশ প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক নীতি অনুসারে দেশগুলো তাদের উৎপাদন এবং রোজগারের জন্য প্রথম দিকে কৃষিনির্ভর হলেও পরবর্তী পর্যায়ে শিল্পক্ষেত্র এবং তারপর সেবাক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। চিনের ক্ষেত্রেও এইরকমই হয়েছিল যা আমরা সারণি 10.4 থেকে দেখতে পাই। ভারত এবং পাকিস্তানে শিল্পক্ষেত্রে শ্রমশক্তির নিযুক্তির অনুপাত কম, যা যথাক্রমে 21% এবং 23% ছিল। আর, ভারত এবং পাকিস্তানের GDP-তে শিল্পক্ষেত্রের অবদান ছিল যথাক্রমে 30% এবং 21%। এই দেশগুলোতে GDP-র অবদান তাই সরাসরি সেবাক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

এইভাবে, ভারত এবং পাকিস্তান উভয়দেশে সেবাক্ষেত্র উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে উঠে এসেছিল। এই সেবাক্ষেত্র GDP-তে বেশি যোগদান করছে এবং একই সঙ্গে এটা সম্ভাব্য নিয়োগকর্তা হিসাবেও উঠে এসেছিল। যদি আমরা আশির দশকের শ্রমশক্তির অনুপাতের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখি যে, পাকিস্তান সেবাক্ষেত্রে তার শ্রমশক্তির স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ভারত এবং চিন থেকে দ্রুততর। আশির দশকে ভারত, চিন এবং পাকিস্তানের সেবাক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমশক্তির আনুপাতিক মাত্রা ছিল যথাক্রমে 17%, 12% এবং 27%। আর 2014 সালে এটা যথাক্রমে 29%, 43% এবং 34 শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছে।

গত তিনদশক ধরে এই তিনটি দেশেই কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন কমে গেছে। অথচ বলাবাহুল্য এই তিনটি দেশেই কৃষিক্ষেত্রে শ্রমশক্তির নিয়োগের পরিমাণ ছিল সবচাইতে বেশি। অন্যদিকে, শিল্পক্ষেত্রে চিন প্রায় দুই অঙ্কের বিকাশের হার ধরে রাখছে, সেখানে ভারত ও পাকিস্তানের

কাজগুলো করো :

➢ তুমি কি এটা প্রয়োজনীয় মনে কর যে চিনের ন্যায় ভারত ও পাকিস্তানকেও শিল্প ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করা দরকার? কেন?

➢ বিশেষজ্ঞদের মতে, সেবাক্ষেত্রকে বিকাশের ইঞ্জিন হিসাবে মানা ঠিক নয়, কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানের উৎপাদনের উন্নতি মূলত এই সেবাক্ষেত্রেই হয়েছে। তোমার অভিমত কী?

সারণি 10.4

বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির গতি প্রকৃতি বার্ষিক শতকরা হারে, 1980-2015

দেশ	*1980–90*			*2011–15*		
	কৃষি	শিল্প	সেবা	কৃষি	শিল্প	সেবা
ভারত	3.1	7.4	6.9	2.3	5	8.4
চিন	5.9	10.8	13.5	4.1	8.1	8.4
পাকিস্তান	4	7.7	6.8	2.7	3.4	4.4

শিল্পে বিকাশ হার কমেছে। আবার 1980-2015, এই সময়কালে চিন সেবাক্ষেত্রে বিকাশ হার বাড়াতে সক্ষম হয়েছে, যেখানে ভারত ও পাকিস্তানের সেবাক্ষেত্রে বিকাশ হার প্রায় স্থির হয়ে আছে। সুতরাং বলা যায় চিনের বিকাশে শিল্প ও সেবা, উভয়ক্ষেত্রেরই অবদান বেশি। সেখানে ভারত মূলত সেবাক্ষেত্রের উপরই নির্ভর করছে। তবে এই সময়কালে পাকিস্তানে এই তিনটি ক্ষেত্রেরই অর্থাৎ কৃষি, শিল্প এবং সেবামূলক এই তিনটি দিকেই তার উৎপাদন ক্ষমতা অনেকটা কমে গিয়েছিল।

10.5 মানব উন্নয়নের সূচকসমূহ

তোমরা নীচের ক্লাসে মানব উন্নয়নের সূচক এবং অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবস্থান সম্বন্ধে পড়েছ। চলো আমরা দেখি, কিছু নির্বাচিত সূচকগুলোতে ভারত, চিন, পাকিস্তান কীরকম প্রদর্শন করছে।

সারণি 10.5 দেখায় যে চিন, ভারত এবং পাকিস্তান থেকে কিছু নির্বাচিত মানব উন্নয়ন সূচক এগিয়ে যাচ্ছে। যেমন, আয় নির্দেশক — মাথাপিছু GDP বা দারিদ্র্য

সারণি 10.5

কিছু নির্বাচিত মানব উন্নয়সূচক, 2016

বিষয়	ভারত	চিন	পাকিস্তান
মানব উন্নয়নসূচক (মান)	0.624	0.738	0.550
র‍্যাংক (HDI ভিত্তিক)	131	91	148
জন্মের সময় প্রত্যাশিত আয়ু (বছরে)	68.3	76	66.4
বিদ্যালয় আঙিনায় গড় বছর (15 বছর এবং তার বেশি শতাংশে)	6.3	7.6	5.1
মাথা পিছু GDP	6092	14,400	4866
দারিদ্র্য রেখার নীচে জনসংখ্যা ($ 3.10 প্রতিদিন PPP)	37	32	44
শিশুমৃত্যু হার (প্রতি 1000 জন্মে)	38	9	66
মাতৃত্বকালীন মৃত্যু হার (প্রতি 1লক্ষ জন্মে)	174	27	178
উন্নত শৌচালয়ের ব্যবহার	40	77	64
উন্নত পানীয় জলের উৎস স্থায়ীভাবে ব্যবহারকারী	94	96	91
অপুষ্টির শিকার শিশু (%)	39	9	45

উৎস : *মানব উন্নয়ন সূচক এবং বিশ্ব উন্নয়নসূচক, 2016 www.worldbank.org*

রেখার নীচে জনসংখ্যার অনুপাত; স্বাস্থ্য নির্দেশক যথা মৃত্যু হার, শৌচালয়ের ব্যবহার, স্বাক্ষরতা, প্রত্যাশিত জীবনকাল বা অপুষ্ঠি। দারিদ্র্যরেখার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা কমাতে এবং শৌচালয়ের ব্যবহার বাড়াতে পাকিস্তান ভারত থেকে এগিয়ে আছে। কিন্তু এই দুই দেশই তাদের নারীদের মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার থেকে রক্ষা করতে পারেনি। চিনে প্রতি একলক্ষ নবজাতকের জন্মের সময় শুধু 27 জন নারীর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, ভারত এবং পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এই মৃত্যুর হার যথাক্রমে 178 জন এবং 174 জন। আশ্চর্যজনকভাবে এটা দেখা যায় যে তিন দেশই তাদের বেশিরভাগ নাগরিকদের উন্নত পানীয় জলের উৎস সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে। তুমি দেখবে যে, আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যরেখা ($ 3.10 প্রতিদিন) এর নীচে বসবাসকারী মানুষের অনুপাত হিসাবে এই তিনটি দেশের মধ্যে ভারতে সবচেয়ে বেশি দরিদ্র লোক বসবাস করে। তুমি খুঁজতে চেষ্টা করো, কেন এই পার্থক্যগুলো হচ্ছে।

যাই হোক এই রকম প্রশ্নগুলি নিয়ে চর্চা করা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আমাদের মানব উন্নয়ন সূচকগুলোর দৃঢ়তাপূর্ণ প্রয়োগ সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলোর উপরও নজর রাখতে হবে। এটা এজন্য হয়, কারণ এরা প্রত্যেকটিই খুবই গুরুত্বপূর্ণ সূচক; কিন্তু এইগুলোও পর্যাপ্ত নয়। এদের সঙ্গে আমাদের স্বাধিকার সূচকের ব্যাপারেও জানা প্রয়োজন। 'সামাজিক এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক অংশীদারিত্ব' এর মানকে এরকমই একটি সূচক হিসাবে যোগ করা যায়। কিন্তু এটাকে মানব উন্নয়নসূচক হিসাবে অতিরিক্ত কোনো গুরত্ব দেওয়া হয়নি। কিছু কিছু নিশ্চিত স্বাধিকার সূচককে (যেমন— 'নাগরিক অধিকারগুলোর সাংবিধানিক সুরক্ষার সীমা' বা 'ন্যায় পালিকার স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সাংবিধানিক সুরক্ষার সীমা') এখনও পর্যন্ত প্রবর্তন করা হয়নি। এইগুলোর অন্তর্ভুক্তি ছাড়া এবং সম্ভবত আরও কিছু সূচকের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া, তাদের গুরুত্ব প্রদান ছাড়া, মানব উন্নয়ন সূচকের নির্মাণ অসম্পূর্ণ থাকবে এবং এর উপযোগিতাও সীমিত হবে।

10.6 উন্নয়নের বিভিন্ন কৌশল — এর মূল্যায়ন

সাধারণত কোনো একটি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে আদর্শ হিসাবে অন্যান্য দেশ তাদের নিজের উন্নয়নের পাঠ ও নির্দেশিকা হিসাবে গ্রহণ করে। বিশ্বের বিভিন্নভাগে সংস্কার কার্যক্রমগুলি চালু হওয়ার পর এই ধরনের প্রবণতা বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে শিক্ষা গ্রহণের আগে তাদের সফলতার এবং দুর্বলতার মূল কারণগুলো বোঝা প্রয়োজন। তাছাড়া এও প্রয়োজনীয় যে আমরা তাদের পরিকল্পনাগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য এবং তুলনা করি। যদিও বিভিন্ন দেশ তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আলাদা আলাদাভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো, এসো আমরা সংস্কার কার্যক্রমের প্রারম্ভকে প্রসঙ্গ হিসাবে ধরি। আমরা জানি, 1978 সালে চিনে সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তথা পাকিস্তানে 1988 সালে এরং ভারতে 1991 সালে। চলো আমরা সংস্কার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়কালে এই দেশ তিনটির সাফল্য এবং ব্যর্থতা সংক্ষেপে পরিমাপ করি।

কেন 1978 সালে চিন পরিকাঠামোগত সংস্কার সূচনা করেছিল? ভারত এবং পাকিস্তানকে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার থেকে সংস্কার প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য নির্দেশ করা হলেও চিনের উপর এরূপ কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। ওই সময়ের চিনের নতুন নেতৃত্ব দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের ধীর গতি তথা মাওবাদী শাসনের অধীনে আধুনিকীকরণের অভাব নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল

না। তারা অনুভব করেছিল মাওবাদীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দর্শন — বিকেন্দ্রীকরণ, স্বয়ংভরতা তথা বিদেশি প্রযুক্তি, দ্রব্য এবং মূলধন পরিহার, দেশের অর্থনীতিকে সঠিক দিশা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যাপক ভূমিসংস্কার, সঙ্ঘীকরণ, সামনের দিকে বিরাট লাফনীতি এবং অন্যান্য উদ্যোগগুলো সত্ত্বেও 1978 সালের মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদন পঞ্চাশ দশকের মধ্যবর্তী সময়ের মতোই ছিল।

এটা দেখা গেছে যে, সংস্কার পরবর্তী সময়ের সামাজিক এবং অর্থিক সূচকগুলোর উন্নতি মূলত শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য, ভূমি সংস্কার, বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার দীর্ঘমেয়াদী অস্তিত্ব এবং ছোটো উদ্যোগগুলোর উপস্থিতির জন্য পরিকাঠামো নির্মাণে অত্যন্ত সাহায্য করেছিল। চিনে সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্বেই, গ্রামীণ এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। যৌথ খামার উদ্যোগের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের ন্যায় সঙ্গতভাবে বণ্টন হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা এটাও বলেন যে, প্রতিটি সংস্কার ব্যবস্থা প্রথমে ছোটো পরিসরে প্রয়োগ করা হয়েছিল, তারপর ব্যাপক মাত্রায় প্রসার হয়েছিল। বিকেন্দ্রীভূত সরকারের প্রয়োগের মাধ্যমে সফলতা ও ব্যর্থতার আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক মূল্যের পরিমাপ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, যখন ছোটো ছোটো ভূমিখণ্ড কৃষির জন্য কৃষকদের দেওয়া হল তখন এটা অনেক সংখ্যক গরিব লোককে সমৃদ্ধ করেছিল। এরফলস্বরূপ, গ্রামীণ শিল্প অভূতপূর্ব বিকাশের সহায়ক পরিস্থিতি প্রস্তুত হয়েছিল এবং আরও অধিক সংস্কারের জন্য একটি সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরি করেছিল। বিশেষজ্ঞরা এমন অনেক উদাহরণ তুলে ধরেছেন যা প্রমাণ করে অর্থনৈতিক সংস্কার কীভাবে চিনের দ্রুত বিকাশ ঘটিয়েছিল।

বিশেষজ্ঞরা যুক্তি দেন যে, সংস্কার প্রক্রিয়া পাকিস্তানে সব অর্থনৈতিক সূচকগুলোকে পিছিয়ে দিয়েছে। আমরা পূর্ববর্তী অংশে দেখেছি যে, আশির দশকের তুলনায় নব্বই-এর দশকে GDP-র বৃদ্ধির হার এবং তার ক্ষেত্রগত অবদান অনেক বেশি হারে হ্রাস পেয়েছে।

যদিও পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক দরিদ্ররেখা সংক্রান্ত তথ্য খুব ভালো, কিন্তু পাকিস্তানের সরকারি তথ্য ব্যবহারকারী বিশেষজ্ঞদের মতে পাকিস্তানে ক্রমবর্ধমান দারিদ্রতা নির্দেশ করে। ষাটের দশকে দরিদ্র লোকের সংখ্যা আনুপাতিক মানে 40 শতাংশের বেশি ছিল, যা আশির দশকে হ্রাস পেয়ে 25% হয়েছিল। কিন্তু নব্বই-এর দশকে এই সংখ্যা আবার বাড়তে থাকে। বিশেষজ্ঞরা পাকিস্তানের অর্থব্যবস্থার বিকাশের হারে হ্রাস এবং দরিদ্রতার পুনরায় আবির্ভাবের কারণ নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, কৃষিজ বিকাশ এবং খাদ্যের যোগানের পরিমাণ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নগত প্রযুক্তির পরিবর্তনের উপর নির্ভর না করে ভালো ফসল ফলনের উপর নির্ভর করে। যখন ফসলের ভালো ফলন হয় তখন অর্থনীতি ভালো অবস্থায় থাকে এবং যখন তা হয় না, তখন অর্থনৈতিক সূচকগুলোও স্থির বা নেতিবাচক দিক নির্দেশ করে।

তোমার হয়তো মনে আছে, লেনদেন হিসাবের সংকট দূর করতে ভারতকে বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে ঋণ নিতে হয়েছিল। যে-কোনো দেশের জন্য বিদেশি মুদ্রা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তা কীভাবে অর্জন করতে হয় এটা জানা আরও গুরুত্বপূর্ণ। যদি একটি দেশ কারখানাজাত দ্রব্যের স্থায়ী রপ্তানি থেকে বিদেশি মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম থাকে, তবে তার চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। পাকিস্তানের অধিকাংশ বিদেশি মুদ্রা মধ্য-পূর্ব এশিয়ায় কর্মরত পাকিস্তানি শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থ এবং অতি নিয়ত পরিবর্তনশীল কৃষিজ দ্রব্যের রপ্তানি থেকে অর্জিত হয়। পাকিস্তানের একদিকে যেমন বিদেশি ঋণের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা বেড়ে যাচ্ছে অন্যদিকে এই ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রেও বাড়তি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

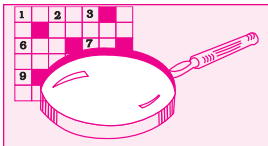

কাজগুলো করো

➢ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর (এরমধ্যে এশিয় প্রতিবেশীরাও আছে) তুলনায় ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ অধিক কিন্তু ভারতের মানব উন্নয়ন সূচকগুলো বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর ন্যায় নিম্নমুখী। ভারত কোথায় ভুল করছে? কেন আমরা আমাদের মানব সম্পদের প্রতি ততটা যত্নবান নই? শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো।

➢ কিছু সময় ধরে এটা দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে সস্তা চিনা দ্রব্যের যোগান হঠাৎ বেড়ে যাচ্ছে যার প্রভাব ভারতের নির্মাণ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এবং একই সঙ্গে আমরা আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গেও বাণিজ্যে লিপ্ত হচ্ছি না। নীচের সারণিটির দিকে তাকাও, যেখানে ভারত দ্বারা চিন ও পাকিস্তানে রপ্তানি এবং চিন ও পাকিস্তান থেকে ভারতের আমদানি তথ্য দেওয়া আছে। ফলাফলগুলো ব্যাখ্যা করো এবং শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো। খবরের কাগজ পড়ে, ওয়েবসাইট খুঁজে এবং খবর শুনে, নিজের প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যযুক্ত দ্রব্যও সেবাগুলোর বিবরণ সংগ্রহ করো। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তুমি এই ওয়েবসাইটও দেখতে পারো। http:/dgft.gov.in

দেশ	ভারত থেকে রপ্তানি (কোটি টাকায়)			ভারত দ্বারা আমদানি (কোটি টাকায়)		
	2004-2005	*2015-2016*	বার্ষিক বিকাশ হার (%)	*2004-2005*	*2015-2016*	বার্ষিক বিকাশ হার (%)
পাকিস্তান	2,341	14,286	46	427	2884	52
চিন	25,232	58,932	12	31,892	4,04,043	107

যাই হোক, গত কিছু বছর ধরে পাকিস্তান তার আর্থিক বিকাশ পুনরুদ্ধার করতে এবং বিকাশের গতিকে ধরে রাখতে পেরেছে।2016-2017-এর বার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিবেদন অনুযায়ী, 2015-2016 আর্থিক বছরে GDP-র বৃদ্ধির হার 4.7% নিবদ্ধ করা হয়েছে, যা গত আট বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ছিল। যদিও কৃষিক্ষেত্রে বিকাশের হার সন্তোষজনক স্তর থেকে অনেক দূরে, তবে শিল্প এবং সেবাক্ষেত্রে বিকাশ হার যথাক্রমে 6.8% এবং 5.7%-এ দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়া অনেক সমষ্টিগত অর্থনীতির সূচক স্থির এবং ইতিবাচক প্রবণতার দিকটিকেই সূচিত করছে।

10.7 উপসংহার

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর উন্নতির অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কী শিখেছি? পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারত, চিন এবং পাকিস্তান তাদের উন্নয়ন যাত্রা নিরন্তর চালিয়ে যাচ্ছে এবং তার ভিন্নতর ফলাফল এবং অভিজ্ঞতায়ও সম্মুখীন হচ্ছে। সত্তর দশকের শেষ পর্যন্ত তিন দেশেরই উন্নয়নস্তর নীচে ছিল। কিন্তু বিগত তিন দশক ধরে এই তিনটি দেশ ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থান করছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে ভারতের মাঝারি বা পরিমিত বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু দেশের একটি বড়ো অংশের জনগণ এখনও কৃষিনির্ভর। দেশে অনেক ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত দিক দিয়েও পিছিয়ে আছে। এক চতুর্থাংশেরও বেশি লোক যারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা এখনও রয়ে গেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থের ওপর অধিক নির্ভরশীলতা এবং বিদেশী ঋণের বোঝার সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে অতিদ্রুত পরিবর্তনশীল ফলন পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মন্দার কারণ। যদিও বিগত তিন দশকের সমষ্টিগত অর্থনৈতিক সূচকগুলোতে ইতিবাচক এবং উচ্চবৃদ্ধির হার শুরু হয়েছে যা দেশের অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের নিদর্শন বহন করছে।

চিনে রাজনৈতিক স্বাধীনতা তথা মানব অধিকার রক্ষায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভাব চিন্তার মূল বিষয়। তথাপি, গত তিন দশক ধরে তাদের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার কথা না ভুলে বাজার ব্যবস্থার প্রয়োগ করে এবং দারিদ্রতা দূরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধির হার উন্নত করতে সফল হয়েছে। তুমি এটাও লক্ষ করবে যে, যখন ভারত এবং পাকিস্তান তাদের সরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলোকে বেসরকারিকরণের ব্যবস্থা নিয়েছে তখন চিন বাজার ব্যবস্থার প্রয়োগ করে অতিরিক্ত সামাজিক এবং আর্থিক সুযোগ সৃষ্টির উপর দৃষ্টিপাত করেছে। জমির সমষ্টিগত মালিকানা বজায় রেখে এবং জমিতে ব্যক্তিগত চাষবাসের অনুমতি প্রদান করে চিন তার গ্রামীণ এলাকাগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছে। সংস্কারের পূর্ববর্তী সময় থেকেই সামাজিক পরিকাঠামো গঠনে সরকারি প্রচেষ্টা দ্বারা চিনের পরিকাঠামো গঠনে সরকারি প্রচেষ্টা দ্বারা চিনের মানব উন্নয়ন সূচকগুলোর উন্নয়নে ইতিবাচক ফলাফল পরিলক্ষিত হয়।

সংক্ষিপ্ত বৃত্তি

- বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং নীতিগুলো বুঝতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল কারণ এই দেশগুলোকে উন্নত দেশগুলোর পাশাপাশি তাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর থেকেও প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।
- ভারত, পাকিস্তান ও চিনের প্রাকৃতিক সম্পদ একই ধরনের হলেও তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।
- তিনটি দেশই তাদের উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ধারণাটিকে অনুসরণ করেছিল। যদিও এই উন্নয়নমূলক নীতিগুলো প্রয়োগের জন্য দেশগুলোর কাঠামোগত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক তফাত ছিল।
- আশির দশকের শুরুর দিকে তিনটি দেশেরই উন্নয়নমূলক সূচকগুলো যেমন — বৃদ্ধির হার এবং জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত অবদান একই ছিল।
- চিনে 1978 সালে, পাকিস্তানে 1988 সালে এবং ভারতে 1991 সালে সংস্কার প্রক্রিয়া প্রবর্তিত হয়েছিল।
- যেখানে চিন নিজস্ব প্রচেষ্টায় কাঠামোগত সংস্কারগুলো শুরু করেছিল সেখানে ভারত এবং পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর দ্বারা বাধ্য হয়ে সংস্কার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছিল।
- এই তিন দেশের গৃহীত নীতিগুলোর প্রভাবও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। উদাহরণস্বরূপ, চিনের এক সন্তান নীতি তাদের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারকে আটকে দিয়েছিল, পাকিস্তান ও ভারতে এখনো এমন কোনো ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেনি।
- পঞ্চাশ বছরের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার পরেও তিনটি দেশের শ্রমশক্তির বৃহৎ অংশই কৃষির উপর নির্ভরশীল। ভারতের ক্ষেত্রে এই নির্ভরশীলতা আরও অধিক।
- যদিও চিন ধ্রুপদী বিকাশনীতি অনুসরণ করে আস্তে আস্তে কৃষিজ ক্ষেত্র থেকে নির্মাণ ক্ষেত্রে এবং তারপর সেবা ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়েছিল, কিন্তু ভারত এবং পাকিস্তান সরাসরি কৃষিক্ষেত্র থেকে সেবাক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
- চিনের শিল্প ক্ষেত্র বরাবরই একটি উচ্চবৃদ্ধির হার বজায় রেখেছে কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের ক্ষেত্রে তা হয়নি।
- অনেক মানব উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রেও ভারত ও পাকিস্তান থেকে চিন এগিয়ে আছে। যদিও এই উন্নতির জন্য সংস্কার প্রক্রিয়ার কোনো অবদান ছিল না, চিন দ্বারা গৃহীত সংস্কার পূর্ববর্তী কৌশলগুলোরই অবদান রয়েছে।
- উন্নয়নের সূচকগুলো মূল্যায়নের সময় স্বাধিকার সূচকগুলোও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

অনুশীলনী

1. আঞ্চলিক এবং অর্থনৈতিক গোষ্ঠীগুলো কেন তৈরি হয়েছে?
2. নিজস্ব দেশীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে দেশগুলো দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমগুলো কী কী?
3. ভারত এবং পাকিস্তান তাদের উন্নয়নের পথকে প্রশস্ত করতে যে একই উন্নয়নমূলক নীতিগুলি অনুসরণ করেছিল সেগুলো কী কী?
4. 1958 সালে শুরু হওয়া চিনের 'সামনের দিকে বিরাট লাফ' অভিযানটি ব্যাখ্যা করো।
5. 1978 সালের সংস্কার নীতির ওপর ভিত্তি করে চিনের দ্রুত শিল্পগত বিকাশ ঘটেছিল। তুমি কি একমত? ব্যাখ্যা করো।
6. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পাকিস্তান দ্বারা গৃহীত উন্নয়মূলক প্রচেষ্টাগুলো বর্ণনা করো।
7. চিনের 'একসন্তান' নীতির গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য কী?
8. চিন, পাকিস্তান এবং ভারতের মুখ্য জনসংখ্যা বিষয়ক সূচকগুলোর উল্লেখ করো।
9. 2003 সালের ভারত ও চিনের GDP-তে ক্ষেত্রগত অবদানের তুলনামূলক আলোচনা করো। এটা কী নির্দেশ করে?
10. মানব উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকগুলোর উল্লেখ করো।
11. 'স্বাধিকার সূচক' বলতে কী বোঝ? কিছু স্বাধিকার সূচকের উদাহরণ দাও।
12. চিনের দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ পরিচালনকারী বিভিন্ন উপাদানগুলোর মূল্যায়ন করো।
13. নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে ভারত, চিন এবং পাকিস্তানের অর্থব্যবস্থা অনুযায়ী তিনটি ভাগে বিভক্ত করো।
    - এক সন্তান নীতি
    - নিম্ন প্রজননের হার
    - উচ্চমাত্রায় শহরীকরণ
    - মিশ্র অর্থনীতি
    - উচ্চমাত্রায় প্রজনন হার
    - বিশাল জনসংখ্যা
    - জনসংখ্যার অত্যধিক ঘনত্ব
    - নির্মাণকারী ক্ষেত্রের জন্য প্রবৃদ্ধি
    - সেবাক্ষেত্রের জন্য প্রবৃদ্ধি

14. পাকিস্তানের ধীর প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্রতার পুনঃ আবির্ভাবের কারণগুলো দেখাও।
15. কিছু মুখ্য মানব উন্নয়ন সূচকের প্রেক্ষিতে ভারত, চিন এবং পাকিস্তানের উন্নয়নের তুলনা করো।
16. গত দুই দশকে ভারত এবং চিনের বিকাশ হারে পরিলক্ষিত গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করো।
17. শূন্যস্থান পূরণ করো ঃ

    ক) 1956 সালে ..... এ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল। (পাকিস্তান / চিন)

    খ) মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার ..... এ অধিক। (চিন / পাকিস্তান)

    গ) দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী লোকের পরিমাণগত অনুপাত ..... এ বেশি। (ভারত/ পাকিস্তান)

    ঘ) 1978 সালে ..... এ সংস্কারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। (চিন / পাকিস্তান)।

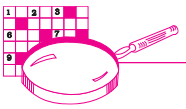

প্রস্তাবিত অতিরিক্ত কার্যাবলি

1. ভারত ও চিন এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য বিষয়ের ওপর একটি বিতর্কসভার আয়োজন করো।

2. তুমি অবগত যে আমাদের বাজারগুলোতে সস্তা চিনা দ্রব্য যেমন — খেলনা, বৈদ্যুতিক সামগ্রী, জামাকাপড়, ব্যাটারি ইত্যাদি সহজলভ্য। তুমি কি মনে কর যে গুণগতমান এবং দামের বিচারে এই দ্রব্যগুলো ভারতে উৎপাদিত দ্রব্যের সঙ্গে তুলনাযোগ্য? এই দ্রব্যগুলো কি আমাদের দেশীয় উৎপাদকদের জন্য একটি হুমকি স্বরূপ? আলোচনা করো।

3. তুমি কি মনে কর চিনের ন্যায় ভারত ও তার জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে 'এক সন্তান' নীতি গ্রহণ করতে পারে? জনসংখ্যার বৃদ্ধি কমাতে ভারত যে নীতিগুলো অনুসরণ করতে পারে তার উপর একটি বিতর্কসভার আয়োজন করো।

4. চিনের বিকাশে মুখ্য অবদান নির্মাণক্ষেত্রের এবং ভারতের বিকাশে মুখ্য অবদান সেবাক্ষেত্রের — বিগত দশকে এই দেশগুলোতে কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এই বিবৃতির প্রাসঙ্গিক একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

5. চিন কীভাবে সফল মানব উন্নয়নসূচকগুলোতে এগিয়ে থাকতে সমর্থ হয়েছে? শ্রেণি কক্ষে আলোচনা করো। (সর্বশেষ মানব উন্নয়ন রিপোর্টটি ব্যবহার করো)।

REFERENCES

Books

Dreze, Jean and Amartya Sen. 1996. *India: Economic Development and Social Opportunity.* Oxford University Press, New Delhi.

Articles

Ray, Alok. 2002. 'The Chinese Economic Miracle: Lessons to be Learnt.' *Economic and Political Weekly,* September 14, pp. 3835-3848.

Zaidi, S. Akbar. 1999. 'Is Poverty now a Permanent Phenomenon in Pakistan?' *Economic and Political Weekly,* October 9, pp. 2943-2951.

Government Reports

Annual Plan 2016-17, Ministry of Planning, Development & Reform, Government of Pakistan accessed from http:/pc.gov.pk on 02 January 2017.

Economic Survey, Ministry of Finance, Government of India (for various years).

Human Development Report 2005, United Nations Development Programme, Oxford University Press, Oxford.

Labour Market Indicators, 3rd Edition, International Labour Organisation, Geneva.

Pakistan: National Human Development Report 2003, United Nations Development Programme, Second Impression 2004.

World Development Report 2005, The World Bank, Oxford University Press, New York.

World Development Indicators (for various years), Washington; Human Development Report 2015, United Nations World Bank Development Programme Geneva; Key Indicators of Asia and Pacific 2016, Asian Development Bank, Philippines.

Websites

www.stats.gov.cn
www.statpak.gov.pk
www.un.org
www.ilo.org
www.planningcommission.nic.in
www.dgft.delhi.nic.in

পরিভাষা কোষ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় দেশগুলোর সংগঠন (ASEAN) : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। এর সদস্য দেশগুলো হল — থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়শিয়া, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইনস, ব্রুনেই, দারুসালাম, কম্বোডিয়া, লাওস, মায়েনমার এবং ভিয়েতনাম।

লেনদেন উদ্বৃত্ত বা হিসাব (Balance of Payments) : লেনদেন উদ্বৃত্ত হল একটি পরিসংখ্যানগত বিবৃতি, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা বছরে একটি দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের চলতি ও মূলধনি হিসাবে সমস্ত আর্থিক লেনদেন (দেনা ও পাওনা) সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করে। যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সময়কালের লেনদেন উদ্বৃত্ত মোট সম্পত্তি ও বাধ্যবাধকতা প্রকাশ করে বলে লেনদেন উদ্বৃত্ত সর্বদাই সমতা বজায় রাখে।

প্রবেশ বাধা (Barriers to Entry) : এটা সেই নিষেধাজ্ঞাকে নির্দেশ করে যা কোন শিল্পে প্রবেশ করার জন্য ইচ্ছুক নতুন ফার্মকে আসতে বাধা দেয়। যদিও এই অবরোধ বা বাধা ঐ শিল্পে নিযুক্ত পুরানো ফার্মকে প্রভাবিত করে না।

উত্তম সম্মতি (Better compliance) : এটা সাধারণত সরকারি কর ও দেনা সংক্রান্ত নিয়মকানুন পালনকে নির্দেশ করে। এটা সাধারণত সরকারকে কর ও বকেয়া প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত হয়।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তি (Bilateral Trade Agreements) : দুটি দেশের মধ্যে দ্রব্য অথবা সেবার আদান-প্রদান সম্পর্কিত ব্যবসায়িক চুক্তি।

ব্র্যান্ডল্যান্ড কমিশন (Brundland Commission) : পরিবেশ এবং উন্নয়নের আন্তসম্পর্ক বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য 1983 সালে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে গঠিত কমিশন। কমিশন একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে স্থিতিশীল উন্নয়নের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল তা খুব জনপ্রিয় হয়েছে এবং সারা পৃথিবীতে তা ব্যাপকভাবে উল্লিখিত হচ্ছে।

বাজেটীয় ঘাটতি (Budgetary Deficit) : এমন একটি অবস্থা যখন সরকারি আয় ও কর প্রাপ্তি দ্বারা সরকারি ব্যয়ভার বহন করা যায় না।

শক্তি দক্ষতার ব্যুরো (Burean of Energy Efficiency) : এটি একটি সরকারি সংস্থা, যার উদ্দেশ্য হল স্বনিয়ন্ত্রণ ও বাজার নীতির জন্য নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করা। সংস্থাটি অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তি সংরক্ষণের জন্য উৎসাহিত করে এবং বিদ্যুতের অপচয়মূলক ব্যবহার রোধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ব্যবসা প্রক্রিয়ার আউটসোর্সিং (Business Prouse Outsourcing [BPO]) : ব্যবসা প্রক্রিয়ার আউট সোর্সিং; সাধারণত একটি কোম্পানির সাথে অন্য কোম্পানির হয়ে থাকে। এই শব্দটি ঘন ঘন উচ্চারিত হয় কিছু বিশেষ ধরনের কাজকর্মের আউট সোর্সিং-এর ক্ষেত্রে (যেমন কল সেন্টারের কাজে), যেখানে বিদেশের কোম্পানি থেকে আই টি সেক্টরের কাজেও ভারতের কোম্পানিগুলো আউট সোর্সিং করে থাকে।

ধারণ ক্ষমতা (Carrying Capacity) : একটি নির্দিষ্ট এলাকা সর্বাধিক যতজন ব্যক্তিকে প্রতিপালিত করতে পারে সেই সংখ্যাকে ঐ এলাকার ধারণ ক্ষমতা বলে। আরও বেশি যান্ত্রিকভাবে সংজ্ঞায়িত করলে বলা যায়, ধারণ ক্ষমতা হল ঘনত্ব-নির্ভরশীল জনসংখ্যার সর্বাধিক সংখ্যা যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য।

ক্যাসকেডিং প্রভাব (Cascading Effect) : কর আরোপের ফলে দামের অসমানুপাতিক বৃদ্ধি অর্থাৎ দামবৃদ্ধিকে ছাপিয়ে গেলে তাকে ক্যাসকেডিং প্রভাব বলে।

নগদ জমার অনুপাত (Cash Reserve ratio) : বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া) নিকট তাহাদের মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিকাংশ জমা রাখে। নগদ জমার অনুপাতের দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

অনিয়মিত মজুরি প্রাপ্ত শ্রমিক (Casual wage Labourer) : একজন ব্যক্তি যিনি অন্যের কোন কৃষিজ বা অকৃষিজ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে অনিয়মিতভাবে কাজ করে এবং বিনিময়ে দৈনিক হাজিরা হিসাবে যে মজুরি পায়।

ঔপনিবেশিকতাবাদ (Colonialism) : যুদ্ধজয় বা অন্যকোন উপায়ে ঔপনিবেশিক শাসনকে সম্প্রসারণ করা। অন্য দেশকে উপনিবেশ হিসেবে রেখে তাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা হল ঔপনিবেশিকতাবাদের মূল উদ্দেশ্য। আর এর মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শোষণ।

কৃষির বাণিজ্যিকরণ (Commercialisation of Agriculture) : এর অর্থ হল, শস্যের উৎপাদন কেবলমাত্র পারিবারিক ভোগ নিবৃত্তির জন্য না হয়ে উৎপাদন হবে বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য। ব্রিটিশ শাসনকালে কৃষির বাণিজ্যিকরণ শব্দগুচ্ছটি ভিন্ন অর্থ বহন করত। ব্রিটিশরা নগদশস্য উৎপাদনের জন্য কৃষকদের বেশি দাম দিতে শুরু করেছিল। কিন্তু খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী কৃষকরা তুলনামূলকভাবে কম দাম পেত। ব্রিটিশরা এই সকল নগদ শস্যকে বৃটেনের শিল্পগুলোর কাঁচামাল রূপে ব্যবহার করত।

কমিউন (Communes) : (কমিউন যা জনগণের কমিউন হিসেবে পরিচিত) পূর্বে 1958 থেকে 1982-85 অবধি গ্রামাঞ্চলের তিনটি প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বোচ্চ বা শীর্ষে ছিল কমিউন যা চিনে পরিচিত পিপলস কমিউন হিসেবে। পরবর্তী সময়ে কমিউনের স্থলাভিষিক্ত হয় টাউনশিপ বা নগর। তখন সর্বোচ্চ যৌথ ইউনিটগুলো দুভাগে বিভক্ত করা হয় — উৎপাদন বিগ্রেড এবং উৎপাদন দল বা টিম, কমিউনগুলোর প্রশাসনিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাজ থাকত।

ভোগ ঝুড়ি (Consumption Basket) : একটি পরিবার যে সমস্ত দ্রব্য ও সেবা ভোগ করে তাকেই ভোগ ঝুড়ি বলে। মানুষের ভোগের প্রকৃতি হিসেব করতে পরিসংখ্যান সংস্থা ঐ সকল দ্রব্যকে শনাক্ত করে। NSSO, ভোগ ঝুড়িতে 19 প্রকার দ্রব্যসমূহকে শনাক্ত করেছে। এদের মধ্যে কিছু — i) খাদ্য শস্য ii) ডাল iii) দুধ ও দুধ জাতীয় দ্রব্য iv) সব্জি v) ভোজ্য তেল vi) জ্বালানী ও আলো এবং vii) কাপড় চোপড়।

অক্ষমতা (Default) : নির্দিষ্ট সময়ে ঋণের উপর সুদ ও আমানত পরিশোধ করতে না পারা। এই ঋণ কোন আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা থেকে সরকার দ্বারা নেওয়া ঋণও হতে পারে। ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে ঋণ গ্রহীতা বিশ্বাস যোগ্যতা হারায়।

ঘাতটি ব্যায় (Deficit financing) : সরকারি ব্যয়, সরকারি আয় হতে বেশি হলে তাকে ঘাটতি ব্যয় বলে।

জনবিন্যাসগত পরিবর্তন (Demographic Transition) : জনবিন্যাসগত পরিবর্তনের ধারণাটি জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ ফ্রাঙ্ক নোটেসিয়ান 1945 সালে প্রবর্তন করেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের কালে উন্নত জীবনযাত্রার মানের পরিপ্রেক্ষিতে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়েই হ্রাস পাওয়াকে ব্যাখ্যা করার জন্য এই ধারনাটি ব্যবহৃত হয়। নোটেসিয়াল জনবিন্যাস পরিবর্তনের তিনটি পর্বকে চিহ্নিত করেন — প্রাক্ শিল্প বিপ্লব, উন্নয়নশীল এবং আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজ। পরবর্তী সময়ে শিল্পোত্তর পর্ব অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

বি-নিয়ন্ত্রন (Dereservation) : পূর্বে শুধুমাত্র কোন একক বা একাধিক উদ্যোগের জন্য সংরক্ষিত ক্ষেত্রে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের অনুমতি দেওয়া হত। ভারতে বি-নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝানো হয়, বৃহৎ শিল্প সমূহকে শুধুমাত্র ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য সংরক্ষিত সেবা ও দ্রব্য উৎপাদনের অনুমতি বা সুযোগ দেওয়া।

অবমূল্যায়ন (Devaluation) : বিনিময় হারের পতনের কারণে বৈদেশিক মুদ্রার তুলনায় দেশীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস পায়।

বিলগ্নিকরণ (Dis-investment) : কোন কোম্পানির মূলধনী সম্পদের একটি অংশ স্বেচ্ছায় বিক্রি করে দেওয়া। এভাবে কোম্পানি সম্পদ বাড়ায় এবং ইকুইটির পরিবর্তন হয় বা পরিচালন ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন হয়।

নিয়োগকারী (Employers) : নিয়োগকারী হল সেই ব্যক্তি যিনি সাধারণত ভাড়াটে শ্রমিক দ্বারা উদ্যোগ পরিচালনা করে।

উদ্যোগ (Enterprises) : ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর মালিকানাধীন ও পরিচালনাধীন উদ্যোগ যা দ্রব্য উৎপাদন করে বা দ্রব্য সামগ্রী বণ্টন করে বা সেবা উৎপাদন করে অথবা দ্রব্য ও সেবা বিক্রি করে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে।

ইকুইটিস (Equities) : কোন কোম্পানিকে দেওয়া পুঁজির সমমূল্যের অংশ। এখানে অংশিদাররা কোম্পানির মালিক হিসেবে বিবেচিত হয়। তারা কোম্পানিকে ভোট দিতে পারে এবং লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকারী হয়।

সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান (Establishment) : এমন একটি উদ্যোগ যেখানে বৎসরের অধিকাংশ কাজ কর্মের সময়ই অন্তত একজন ভাড়াটে শ্রমিক কাজ করে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (European Union) : ইউরোপ মহাদেশের 25টি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে গঠিত সংস্থা। এর সদস্য দেশগুলো হল — অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, সাইপ্রাস, চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, ইসটোনিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রীস, হাঙ্গেরী, আয়ারল্যান্ড, ইটালি, লাতভিয়া, লাক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, পর্তুগাল, স্পেইন, সুইডেন, ইউনাইটেড কিংডম, মালতা, পোলান্ড, স্লোভাকিয়া এবং স্লোভেনিয়া।

রপ্তানি শুল্ক (Export Duties) : রপ্তানি পণ্যের উপর যে শুল্ক আরোপ করা হয় তাই রপ্তানি শুল্ক।

রপ্তানি বর্ধক (Export Promotion) : একগুচ্ছ কর্মসূচি (যার মধ্যে রয়েছে ফিসক্যাল ও বাণিজ্যিক সহায়তা এবং বাণিজ্য-বাধা দূর করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ) যা সরকারি দ্রব্য সামগ্রীর রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রহণ করে। আর রপ্তানি বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যাতে আর্থিক বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়ে সেটাও সুনিশ্চিত করা হয় রপ্তানি বর্ধকের সাহায্যে।

আমদানি-রপ্তানি নীতি (Export-Import Policy) : সরকারের সেই সকল আর্থিকনীতি যা আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে।

পারিবারিক শ্রমিক (Family Labour / worker) : পরিবারের সেই সদস্য যে বিনামজুরিতে পরিবার পরিচালিত কোন ফার্মে, শিল্পে বা পরিবারের কোন সদস্য দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Financial Institution) : সঞ্চয় সংগ্রহ ও সংগৃহীত সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বাণিজ্যিক ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, উন্নয়ন ব্যাংক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলো এর অন্তর্ভুক্ত।

রাজকোষ ব্যবস্থাপনা (Fiscal Management) : কর আরোপন এবং সরকারি ব্যয় নিয়ন্ত্রণকারী অর্থনৈতিক কাজকর্ম।

ফিসক্যাল নীতি (Fiscal Policy) : ফিসক্যাল নীতি হল কর ও সরকারি ব্যয়ের সেই রূপদানকে বুঝায় যা দেশের অর্থব্যবস্থাকে সম্প্রসারণশীল করে।

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment) : কোন দেশের অভ্যন্তরীণ কাঠামো, সরঞ্জাম, সংস্থাতে বৈদেশিক সম্পদের বিনিয়োগকে বুঝায়। এখানে শেয়ার বাজারে নিয়োজিত বৈদেশিক বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত হয় না। শেয়ার বাজারের মাধ্যমে দেশিয় কোম্পানিতে বিনিয়োগের থেকে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বেশি উপকারী বলে মনে করা হয়। কারণ শেয়ার বাজারে নিয়োজিত পুঁজি অস্থির প্রকৃতির হয় যা ক্ষণিক সময়ের জন্য নিয়োজিত হয় এবং যে কোন সময় বিনিয়োগকারীরা তাদের পুঁজি তুলে নিতে পারে। অপরদিকে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ভাল বা খারাপ যে কোন পরিস্থিতিতেই স্থিতিশীল হয়।

বৈদেশিক বিনিময় (Foreign Exchange) : অন্য দেশের মুদ্রা বা বন্ড ক্রয়-বিক্রয়।

বৈদেশিক বিনিময় বাজার (Foreign Exchange Market) : যে বাজারে স্থির বিনিময় হারে বৈদেশিক মুদ্রার কেনা-বেচা হয় তাকে বৈদেশিক বিনিময় বাজার বলে। মুদ্রার বিনিময় হার কতটা পরিবর্তনশীল হবে তার হিসাবের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের কোন নির্দিষ্ট তারিখের জন্যও কেনা-বেচা করা যায়।

বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ (FII) : বৈদেশিক বিনিয়োগ যা আসে স্টক, বন্ড বা অন্য আর্থিক সম্পদের মাধ্যমে। এই ধরনের বিনিয়োগ ফার্ম বা বিনিয়োগকারীর উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ জারি করে না।

বৈদেশিক প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (FIIs) : বিদেশের ব্যাংকিং ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক, মিউচুয়াল ফান্ড, পেনশন ফান্ড বা এধরনের অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা, যাদের বিনিয়োগ দেশের শেয়ার বাজারে স্টক বা বন্ডে লাগানো হয়। এই ধরনের বিনিয়োগ শেয়ার বাজারের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে।

সংগঠিত ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান (Formal Sector Establishment) : সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেখানে 10 জন বা তার বেশি শ্রমিক নিয়োগ করা হয়।

জি-২০ (G-20) : 20টি দেশের একটি মঞ্চ যার উদ্দেশ্য হল বিশ্ব অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ও সহনশীল উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করা। এই মঞ্চ 19টি দেশের অর্থমন্ত্রীদের এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের এক জায়গায় নিয়ে এসে সিদ্ধান্ত নেয়। এই দেশগুলো হল — আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চিন, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইটালি, জাপান, কোরিয়া, মেক্সিকো, রাশিয়া, সৌদিআরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুর্কি, গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা। ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন ও G-20 এর সদস্য। ইউরোপিয়ান কাউন্সিল এর অধ্যক্ষ ও ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংকের প্রধান ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করেন।

জি-৮ (G-8) : কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, জাপান, গ্রেট ব্রিটেন, উত্তর আয়ারল্যান্ড, আমেরিকা ও রাশিয়ান ফেডারেশন এই দেশগুলোকে নিয়ে গঠিত গোষ্ঠীকে জি-৮ বলা হয়। জি-৮ এর মুখ্য কর্মসূচি হচ্ছে রাষ্ট্র প্রধানদের বার্ষিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শীর্ষ বৈঠক। এই বৈঠকে রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে আন্তর্জাতিক পদাধিকারীরা উপস্থিত থাকেন। শীর্ষ সামিটের অধিনস্থ অসংখ্য সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে নীতি গবেষণা কার্যক্রম থাকে। জি-৮ এর শীর্ষাধিকারী হিসেবে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র এক বছর করে থাকে। 2006 সালে রাশিয়া জি-৮ এর শীর্ষ পদে ছিল।

জি এস টি / দ্রব্য ও সেবা কর (Goods and Service Tax) : দ্রব্য ও সেবার যোগানের উপর আরোপিত একমাত্র পরোক্ষ কর হল জি এস টি যা 2017 সালের জুলাই মাসে চালু করা হয়। আগে ভারতে একাধিক ধরনের পরোক্ষ কর চালু ছিল, যেমন বিক্রয় কর এবং শুল্ক। সেগুলোকে তুলে দিয়ে জি এস টি চালু করা হয়। পণ্য ও সেবার

উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে মূল্য সংযোজনের উপর এর কর চাপানো হয়। এই করের বিভিন্ন হার রয়েছে। যথা 0 শতাংশ, 5 শতাংশ, 12 শতাংশ, 18 শতাংশ, এবং 28 শতাংশ। এই হারে প্রায় সব দ্রব্য ও সেবায় কর ধার্য করা হয়। এই কর হারগুলো সমস্ত অর্থনীতিতে একই থাকে।

সেবানুদান (Gratuity) : চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর কর্মচারীকে কিছু পরিমাণ টাকা দেন নিয়োগকর্তা। কর্মজীবনে সেবা প্রদানের জন্য নিয়োগকর্তা এই অর্থ দেন।

মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) : কোন দেশের অভ্যন্তরে এক বছরে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন হয় তার আর্থিক মূল্য। দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানের অনেকগুলো পরিমাপকের মধ্যে এটা হল মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রেও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

পরিবার (House hold) : সাধারণত একই সাথে বসবাসকারী ও একই রান্নাঘর ব্যবহারকারী ব্যক্তিসমূহ। 'সাধারণত' কথাটির অর্থ হল যে, অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী অতিথিরা পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য হবে না। কিন্তু পরিবারের কেউ অস্থায়ীভাবে বাইরে থাকলেও তিনি পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য হবে।

আমদানি লাইসেন্স (Import Licencing) : বিদেশ থেকে কোন একটি দেশে দ্রব্য আমদানি করতে প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমতি।

আমদানি বিকল্প (Import Substitution) : সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি নীতি যেখানে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যের অনুরূপ দ্রব্য দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন করা হয়। এই নীতিতে শুল্ক এবং অন্য বিধিনিষেধ চাপিয়ে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই নীতি দেশীয় শিল্পকে স্ব-নির্ভর হতে ও রোজগারের সুযোগ সৃষ্টিতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে।

শিশু মৃত্যু হার (Infant Mortality Rate) : একটি নির্দিষ্ট বছরে প্রতি এক হাজার জীবিত জন্মগ্রহণ করা শিশুর মধ্যে যতজন শিশু ১ বছর হওয়ার আগেই মারা যায় সেই সংখ্যা।

মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) : সাধারণ দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি।

অ-সংগঠিত ক্ষেত্রের উদ্যোগসমূহ (Informal Sector Enterprises) : বেসরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগ সমূহ যেখানে নিয়মিত ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা 10 এর কম।

দেশীয় অর্থনীতির সংযুক্তিকরণ (Integration of Domestic Economy) : দেশের অর্থনীতিকে অন্যান্য দেশের অর্থনীতির সাথে মুক্তবাণিজ্য ও বিনিয়োগ বান্ধব সরকারী নীতিসমূহ দ্বারা সুষ্ঠুভাবে ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে সংযুক্ত করাকে বলা হয় বহির্বিশ্বের সাথে দেশীয় অর্থনীতির সংযুক্তিকরণ।

অদৃশ্যরা (Invisibles) : লেনদেন উদবৃত্তের চলতি খাতে অনেকরকম দ্রব্যের মধ্যে কিছু অদৃশ্য দ্রব্য থাকে। অদৃশ্য দ্রব্যগুলো হল মূলত সেবামূলক যেমন — পর্যটন, জাহাজ ও বিমান পরিবহণ, অর্থনৈতিক সেবা যেমন বিমা এবং ব্যাংকিং। বিদেশে উপহার পাঠানো বা বিদেশ থেকে আসা উপহার গ্রহণ এবং বেসরকারি তহবিল স্থানান্তর, সরকারি অনুদান এবং সুদ, লাভ ও লভ্যাংশ ইত্যাদিও থাকে অদৃশ্যের তালিকায়।

শ্রম আইন (Labour Laws) : শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার্থে সরকার দ্বারা তৈরি সমস্ত নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ সমূহ।

ভূমি, রাজস্ব বন্দোবস্ত (Land / Revenue Settlement) : ভারতে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন এলাকা

অধিগ্রহণ করার পর ঐ সমস্ত অধিকৃত অঞ্চলের প্রশাসন নির্ধারিত হতো ঐ সমস্ত অঞ্চলের পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণের উপর। ব্রিটিশ সরকারের সুবিধার্থে এটা সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল যে, অধিকৃত প্রত্যেকটি অঞ্চল থেকে কর বা রাজস্ব সংগ্রহ করা হবে, হয় কৃষক কিংবা মহল অথবা জমিদারের মারফত বা মাধ্যমে। প্রদত্ত করের উপরই উক্ত জমির উপর অধিকার বা কৃষিকাজ করার অধিকার দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থাপনাকেই জমি রাজস্বনীতি বলা হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন রাজস্বনীতি গ্রহণ করা হয়। যেমন i) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যা জমিদারী ব্যবস্থাপনা হিসাবে পরিচিত, ii) রায়োটারী ব্যবস্থাপনা — (অর্থাৎ কৃষকের সঙ্গে সরকারের সরাসরি কর বা রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা) iii) মহলদারী বন্দোবস্ত (রাজস্ব সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সরকার এবং মহলের মধ্যে কর ধার্য করা হয়)

জন্মের সময় প্রত্যাশিত জীবনকাল (বছর) (Life expectancy at Birth (years)) : জন্মের সময় প্রত্যাশিত জীবন বলতে বুঝায় একটি নবজাতক কত বছর বাঁচবে যদি জন্মকালে বিদ্যমান বয়সভিত্তিক মৃত্যুহার নবজাতকের জীবনকালে একই থাকে।

মাতৃত্বকালীন মৃত্যুহার (Maternal Mortility Rate) : মাতৃত্বকালীন মৃত্যুহার বলতে বুঝায় মৃত সন্তান প্রসবের সংখ্যা ও জীবিত সন্তান প্রসবের সংখ্যার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অথবা কোন একটি নির্দিষ্ট বছরে মোট জীবিত সন্তান প্রসব ও প্রসবকালীন মৃত্যুর সংখ্যার মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক।

মার্চেন্ট ব্যাংকার (Marchent Bankers) : মার্চেন্ট ব্যাংকার হল এমন এক ধরনের ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা আবার বিনিয়োগ ব্যাংকার হিসাবে পরিচিত। মার্চেন্ট ব্যাংকারের কাজ হল কোম্পানিগুলোর ইকুহাট ব্যবস্থাপনা (ঋণ প্রয়োজনীয়তার যাকে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট বলে, পরামর্শদান) ও স্টক ও বন্ড-এর ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে, ঋণ প্রয়োজনীয়তা বা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরামর্শদান।

অসুস্থতার উপস্থিতি (Morbidity) : মর্বিডিটি বলতে বোঝায় অসুস্থতার উপস্থিতিকে। ব্যক্তির কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে অসুস্থতার উপস্থিতি। ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে অসমর্থ করে তোলা। দীর্ঘকালে মৃত্যুকে ডেকে আনতে পারে। মর্বিডিটি হার বোঝায় জনসংখ্যার মধ্যে অসুস্থতার হারকে।

মৃত্যুহার (Mortility Rate) : 'মর্টালিটি' শব্দটি এসেছে 'মর্টাল' থেকে। 'মর্টাল' হল ইংরেজি শব্দ। এর মূল ল্যাটিন শব্দ 'মরন' যার অর্থ মৃত্যু। মর্টালিটি রেইট বা মৃত্যু হার হচ্ছে প্রতি হাজার জনসংখ্যা পিছু বার্ষিক মৃত্যু হার। এ মৃত্যু কোন রোগ বা স্বাভাবিকভাবে হতে পারে।

এম আর টি পি আইন (MRTP Act.) : এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে একচেটিয়া কারবার প্রতিহত করতে এবং জনসাধারণের স্বার্থ সুরক্ষায় নজর দেয় না এমন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে।

বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তি (Mulitilateral Trade Aggrement) : দুই এর বেশি দেশের সাথে দ্রব্য এবং সেবার আদান প্রদানের বিষয়ে একটি দেশের বাণিজ্যিক চুক্তি।

জাতীয় উৎপাদন / আয় (National Product / Income) : কোন দেশে উৎপাদিত বস্তু ও সেবাকার্যের বাজার মূল্য ও বিদেশ থেকে প্রাপ্ত আয়ের যোগফল।

জাতীয়করণ (Nationalisation) : ব্যক্তিগত বা বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে সরকারি ক্ষেত্রে মালিকানার স্থানান্তরই হল জাতীয়করণ। ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর অধিনে থাকা উদ্যোগগুলোকে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা অধিগ্রহণ করাই হল কোন উদ্যোগের জাতীয়করণ। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মালিকানা স্থানান্তরকেও বুঝায়।

নয়া আর্থিক নীতি (New Economic Policy) : 1991 সালে গৃহীত আর্থিক নীতিগুলোই নয়া আর্থিক নীতি নামে পরিচিত।

অনবীকরণযোগ্য সম্পদ (Non Renewable Resources) : প্রাকৃতিক সম্পদ যা নবীকরণ করা যায় না। ঐ সমস্ত সম্পদের মজুত বৃহৎ হলেও সীমাবদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ, জীবাশ্ম জ্বালানী-তেল, কয়লা এবং খনিজ সম্পদ — লোহা, সীসা, অ্যালুমিনিয়াম, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি।

শুল্কবিহীন বাধা (Non Tariff Barriers) : কর বাদে সরকার দ্বারা আরোপিত আমদানি নিয়ন্ত্রণের সকল বাধাসমূহ। এই বাধাসমূহের মধ্যে প্রধানত রয়েছে পরিমাণগত বিধিনিষেধ এবং আমদানিকৃত দ্রব্যের গুণমান।

সুযোগ ব্যয় (Opportunity cost) : একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে গিয়ে বা একটি কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে যে পরিমাণ সর্বোচ্চ উৎপন্ন মূল্য বা উপকার ত্যাগ করতে হয় তা হল ঐ দ্রব্য উৎপাদনের এবং কার্য পরিচালনার সুযোগ ব্যয়।

পেনশন (Pension) : একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী মাসিক পরিতোষক হিসাবে যা পায়।

মাথাপিছু আয় (Per Capita Income) : একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের মোট আয়কে ঐ সময়ের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ।

পারমিট লাইসেন্স রাজ (Permit License Raj) : এই পরিভাষা দিয়ে বুঝায় যে, ভারতে দ্রব্য এবং সেবা উৎপাদনের জন্য কোন উদ্যোগ শুরু করতে, পরিচালন করতে ও চালিয়ে যাওয়ার জন্য সরকার নিধারিত নিয়মনীতিগুলো।

পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) : পরিকল্পনা কমিশন হল ভারত সরকারের একটি সংস্থা। দেশের মোট রাষ্ট্রীয় সম্পদের মূল্যায়ণ করা এবং সম্পদ বরাদ্দে স্বচ্ছতা রক্ষা করা এই সংস্থার মূল কর্তব্য। দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপরেখা রূপায়ণ করে পরিকল্পনা কমিশন।

দারিদ্র রেখা (Poverty line) : যে ব্যক্তি কোন মতে বেঁচে থাকার মতো প্রতিদিন প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য (গ্রামাঞ্চলের জন্য দৈনিক 2400 ক্যালোরি এবং শহরাঞ্চলের জন্য 2100 ক্যালরি) ক্রয় করতে বা ভোগ করতে পারে না তাকে দারিদ্র রেখার নীচের মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

ব্যক্তি মালিকানাধীন বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (Private sector establishment) : শিল্প বা ব্যবসায়ের মালিক যেখানে কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কিছু সংখ্যাক ব্যক্তির মিলিত গোষ্ঠী।

উৎপাদনশীলতা (Productivity) : উপকরণের একক প্রতি উৎপাদনকে উৎপাদনশীলতা বলা হয়। মূলধন নিয়োগের দক্ষতা বাড়লে বা শ্রমের দক্ষতা বাড়লে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এই শব্দটি সাধারণ শ্রমের উপকরণের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকে বোঝায়।

ভবিষ্যনিধি (Provident Fund) : ইহা একটি সঞ্চয়ের তহবিল যেখানে কর্মচারী এবং কর্মচারীর নিয়োগকর্তা নিয়মিতভাবে অর্থ জমা করে কর্মচারীর ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য এই জমাকৃত অর্থ সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং এই অর্থ অবসর গ্রহণের পর বা কাজ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর কর্মাচারীকে দেওয়া হয়।

সরকারি ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান (Public sector Establishment) : শিল্প ও ব্যবসার মালিক যেখানে সরকার। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিচালনাও করেন সরকার। এ সকল প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয়

সরকার দ্বারা এককভাবে পরিচালিত হয় অথবা যৌথভাবে পরিচালিত হয়।

পরিমাণগত প্রতিবন্ধকতা (Quantitative Restrictions) : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কতগুলো নির্দিষ্ট দ্রব্যের আমদানির উপর পরিমাণসীমা আরোপ করা হয়। এর উদ্দেশ্য আমদানির পরিমাণ সীমিত করে লেনদেন উদ্বৃত্তকে কমানো এবং দেশের শিল্পগুলোকে সংরক্ষণ করা।

নিয়মিত বেতনভোগী কর্মচারী (Regular Salaried / Wage Employee) : যে ব্যক্তি অন্যের ফার্মে বা অ-ফার্ম উদ্যোগে কাজ করে এবং বিনিময়ে বেতন বা মজুরি নিয়মিতভাবে পায় (এখানে মজুরি দৈনিকভিত্তিতে অথবা নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাজের নিরিখে নতুন চুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না)। নিয়মিত বেতনভোগী কর্মচারীদের মধ্যে কেবলমাত্র যারা সময় মজুরি পাচ্ছে তারাই নয় যারা বেতনও পায় তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নবীকরণ যোগ্য সম্পদ (Renewable Resources) : প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে কতগুলো প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ও ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করলে পুনর্নবীকরণ করা যায়। বন, পশু, জল, মৎস্য ইত্যাদি যদি খুব বেশি মাত্রায় ব্যবহার করা না হয় এদের পুনর্নবীকরণ করা সম্ভব। জলও এই ধরনের সম্পদ।

সার্ক (South Asian Association for Regional Cooparation) : দক্ষিণ এশিয়ার 8 টি দেশ (বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান) নিয়ে এই সংস্থা তৈরি হয়। বন্ধুত্ব, বিশ্বাসযোগ্যতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মনোভাব নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ এই সংগঠন প্রদান করে। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা এই সংস্থার মূল লক্ষ্য।

স্বরোজগারী (Self Employed) : যারা নিজের খামার বা ব্যবসায়ীক উদ্যোগ স্বতন্ত্রভাবে পরিচালনা করে অথবা যারা কোন পেশাগত বা ব্যবসায়ীক কাজে এককভাবে বা কয়েকজন অংশীদারসহ লিপ্ত থাকে। উদ্যোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে কিভাবে, কোথায় এবং কখন উৎপাদন করে এবং উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করা হবে সে বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের আয় মূলত উৎপাদিত বিক্রয় বা লাভের উপর নির্ভর করে।

সামাজিক সুরক্ষা (Social Security) : সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গৃহীত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যা বয়স্কদের, শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের, দুঃস্থদের, বিধবাদের এবং শিশুদের জন্য বস্তুগত সুরক্ষা সুনিশ্চিত করে। এরমধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পেনশন, গ্রাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, মাতৃত্বকালীন সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zone) : বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকা যেখানে অর্থনৈতিক আইন দেশের বাদবাকি অংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থনৈতিক আইনের চাইতে পৃথক। বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করাই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির ক্ষেত্রে প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। চিন, ভারত, জর্ডন, পোলান্ড, কাজকিস্তান, ফিলিপিনস ও রাশিয়াতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল রয়েছে।

স্থিতিশীল ব্যবস্থা (Stabilization measures) : উচ্চ মুদ্রাস্ফিতির হার ও লেনদেন উদ্‌বৃত্তের উঠানামা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গৃহীত রাজকোষ ও আর্থিক ব্যবস্থা।

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ (State Electricity Boards) : এগুলো রাজ্য প্রশাসকের এমন একটি অংশ যারা বিদ্যুৎ উৎপাদন, সরবরাহ ও বিতরণের কাজ করে।

বিধিবদ্ধ নগদ অনুপাত (Statutory Liquidity Ratio) : রিজার্ভ ব্যাংক আইন অনুসারে প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে তাদের মোট চাহিদা ও মেয়াদী আমানতের ন্যূনতম অংশ নগদে রাখতে হয়। নগদ সংরক্ষিত আনুপাতের

(CRR) ন্যায় বিধিবদ্ধ নগদ অনুপাতে (SLR) রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির একটি পদ্ধতি যা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে মেনে চলতে হয়।

স্টক এক্সচেইঞ্জ (Stock Exchange) : যে বাজারে সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানির শেয়ার কেনা বেচা হয়। এই বাজার শেয়ার দালালদের শেয়ার ও অন্যান্য সিকিউরিটিস কেনা বেচার জন্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করে।

শেয়ার বাজার (Stock Market) : এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে স্টক ও শেয়ার কেনা বেচা হয়।

কাঠামোগত সংস্কার নীতি (Structural Reform Policies) : অর্থনীতির সংস্কারসাধনে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাসমূহ, যেমন উদারিকরণ, বিনিয়ন্ত্রণ এবং বেসরকারিকরণ, যার মূল লক্ষ্য হল অর্থনীতির দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম হওয়া।

আমদানি শুল্ক (Tariff) : আমদানির উপর আরোপিত শুল্ক। এই শুল্ক দুই ধরনের হতে পারে — দ্রব্যের একক ভিত্তিক (যেমন প্রতি টন দ্রব্যে) ও দ্রব্যের দাম ভিত্তিক। সাধারণত দেশীয় শিল্পগুলোকে সুরক্ষা দেবার প্রয়োজনে তা আমদানির পরিমাপ কমাতে এই কর আরোপ করা হয়। এই শুল্ক দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

আমদানি শুল্কের বাধা (Tariff Barriers) : সরকার যে সকল বিধিনিষেধ আরোপ করে আমদানির উপর, যা মূলত কর চাপানোর মাধ্যমে হয়।

শ্রমিক ইউনিয়ন (Trade Union) : শ্রমিকদের সংস্থা যা শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষার কাজ করে। মজুরি, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা, কর্মক্ষেত্রের অবস্থা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দরকষাকষি করে শ্রমিক ইউনিয়ন।

বেকারত্ব (Unemployment) : যদি কেউ কাজ পেতে ইচ্ছুক এবং কাজের যোগ্যতা আছে, তা সত্ত্বেও কোন কাজ পাচ্ছেন না তাহলেই তাকে বেকার বলা হবে। তিনি কাজের বাজারে বিরাজমান পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করতে ইচ্ছুক।

নগরায়ন (Urbanisation) : নগরায়ন হল নগরের বিস্তার সমগ্র এলাকার জনসংখ্যার অনুপাতে নগর এলাকা ও নগরের জনসংখ্যার বিস্তার ও বৃদ্ধি। সামগ্রিক জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের চাইতে নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উচ্চ হয়। নগরায়নকে বৃদ্ধির বছরভিত্তিক শতকরা হার অথবা দশকভিত্তিক হারের অথবা দুইটি জনগণনার মধ্যবর্তী বৃদ্ধির হারে প্রকাশিত করা হয়ে তাকে।

শ্রমিক জনসংখ্যার অনুপাত (Worker Population Ratio) : মোট কর্মী সংখ্যা ও মোট জনসংখ্যার অনুপাত। ইহাকে শতাংশের হিসাবে প্রকাশ করা হয়।